ইভান তুর্গেনিভ

বনেদী ঘর

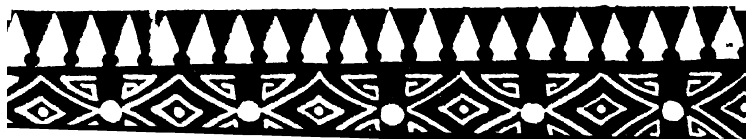
অনুবাদক : অশোক গুহ



ইভান তুর্গেনিভ

বনেদী ঘর

[illegible] ভারতী • ৫, [illegible] • [illegible]



প্রথম সংস্করণ
জুন—১৯৫৩

প্রকাশক :
সুনীল দাশ গুপ্ত
নব ভারতী
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :
গৌর চন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ ভূষণ :
মণি মিত্র

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ফ্যান্সি প্রিন্টিং কোং
৮৫।এ, বণ্ডেল রোড
বালিগঞ্জ

দাম : তিন টাকা চার আনা

ইভান সার্জিয়েভিচ্ তুর্গেনিভ

*

জন্ম—ওরীয়ল, মধ্য রাশিয়া—১৮১৮ খৃষ্টাব্দ।

মৃত্যু—প্যারী—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

একটি নাম। দেশ আর কাল তাকে ঘিরে রাখতে পারে নি। নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে, কালের গণ্ডি পেরিয়ে। এ নামের উত্তরাধিকার কোনও এক দেশের নয়, সারা পৃথিবীর। পরিচিতের আলোয় সে ঝলমলো। ক্লাসিকের সে সমগোত্র।

আজকের ধনবাদী পৃথিবীর উপন্যাস যখন ষ্টেথস্কোপ বুকে লাগিয়ে নিদান খোঁজে, যখন রোগের বিষে জর্জর হয়ে ওঠে, দিশেহারা হয়ে মন-গহনে ঘোরাফেরা করে, প্যাথলজির রাজ্যে গিয়ে প্রবেশ করে—আর তার ঝোড়ো হাওয়া মানুষকে অশান্ত করে তোলে, তখন এই নামটি নিয়ে আসে স্বস্তির একটি নিশ্বাস, শান্তির একটু প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। কুটিল পৃথিবীর গলি-ঘুঁজি থেকে সে যেন নিয়ে আসে পৃথিবীর এক কোণে—যেখানে ফাঁপা আর ফাঁকা মানুষের ভিড় নেই। সেখানে গোলাপগন্ধী পরিবেশে সাইপ্রেসের ঘন ছায়ায় মানুষ দুঃখে কাঁদে, সুখে ছলছল করে হেসে ওঠে, নিষ্ফল প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যায়। তবু তারা বুক বাঁধে, নীড় ভেঙে যেতে দেয় না। সে নিয়ে আসে চন্দ্রালোক গীতির সুর—এক মহা সঙ্গীত। কামনাও তাতে আছে; কিন্তু সে কামনা, মুগ্ধ করে, মত্ত করে না। আর সে আনে সমাজের ছবি—বাস্তব তাতে আছে, কিন্তু সে-বাস্তব আজকের দিনের মতো আবিল নয়। হাঁ, এই নামের পরিচয়, আর ইভান তুর্গেনিভ-এর সৃষ্টির পরিচয়।

এ নামের ইতিহাস আছে, আছে নামের আড়ালের মানুষটির ইতিহাস।

উনিশ শতকের রাশিয়া। নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযানের বন্যা

তার উপর দিয়ে চলে গেছে। বিরাট দেশকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। সে তখন এক-জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত, উদ্দীপ্ত তার সৃষ্টির চেতনা। সৃষ্টিধরেরও উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা যেন এক-এক জ্যোতিষ্ক। পুশকিন, গোগোল, নেক্রাসভ তাঁদের নাম। আর আছেন সাহিত্যের বিবেক বেলিনস্কী, হার্জেন প্রভৃতি। এমনি দিনে সাহিত্যের দরবারে হাজির হলেন এক যুবক। নাম তাঁর ইভান সার্জিয়েভিচ তুর্গেনিভ। টলস্টয় আর দস্তিয়েভ্স্কী তখন তরুণ। নামের তাঁর কৌলিক মর্যাদা ছিল, কিন্তু মৌলিক মর্যাদা কোথায়? তবু যুবক এগিয়ে এলেন। কবি পুশকিন তাঁর আদর্শ, তাঁর দেবতা।

মাতৃ-শাসিত বনেদী পরিবারে তাঁর জন্ম। নির্জন গ্রামের কোলে প্রকৃতির মায়ায় তার দিন কেটেছে; মুঝিক্‌দের প্রতি মন তাঁর সমবেদনায় ভরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাসও জুটেছে। তারপর জার্মাণীর শিল্পী-সমাজের ঘূর্ণাবর্তেও কেটেছে দিন। এরই মধ্যে হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। বিপ্লবী বাকুনিন তাঁর বন্ধু। কিন্তু স্বপ্ন ছিল ফিরে এসে দর্শনের অধ্যাপক হবেন, হয়েছেন সরকারী চাকুরে। দপ্তরে খাতার স্তূপের আড়ালে তবু তার কবিতার নিকুঞ্জ গড়ে উঠেছে। তাই নিয়েই মন্দ কবি-যশঃপ্রার্থী হয়ে এসেছেন সাহিত্যের দরবারে। এসেছেন বটে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস তাঁর নেই।

কবিতায় কাহিনী, নাম 'পারাশা"। তাই দিয়েই শুরু হোল। তরুণ কবি একদিন দেখলেন, সাহিত্যের বিবেক বেলিনস্কী উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করেছেন। এবার সাহিত্যের বৃত্তে আনা-গোনা চললো। পাঁচ মিশেলি ভিড়, রুচিও তাঁদের আলাদা, তবু তাঁরা ভূমিদাস-প্রথার বিরুদ্ধে এক হয়েছেন, মিলেছেন। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ তাঁদের একমাত্র ভাবনা। সামন্ত সমাজের এই যুবকটিকে তাঁদের ভাল লাগলো। বেলিনস্কী লক্ষ্য করলেন, ওঁর ভিতরে আছে ক্রোধ, ঘৃণা, তিক্ততা—একদিন তারই ফসল

ফলবে। সামন্ততন্ত্রের জঠরে যে জঞ্জাল জমে উঠেছে, তার কথা হয় তো ঝরে পড়বে ওর লেখায়। কিন্তু সে তো পদ্যে হবে না, গদ্য চাই।

একদিন সত্যিই যুবক কবিতা ছেড়ে গদ্য ধরলেন। কিন্তু এ তো তেমন কিছু নয়, ক'খানি আদ্‌রা—রেখাচিত্র মাত্র। চরিত্রগুলির নির্যাস তৈরী করে ছোট শিশিতে পুরে রাখা—আর কিছু তো নয়। এতে চাষী আর ভূস্বামীর কাহিনী আছে, কিন্তু শুধুই কাহিনী। এ যেন কয়েকটা যন্ত্রের টুংটাং, কিন্তু তারা মিলে ঐক্যতান তো সৃষ্টি হয় নি। তবু সম্ভাবনায় সে উজ্জ্বল।

কিন্তু সম্ভাবনা বুঝি সম্ভাবনাই রয়ে গেল। লেখক দীর্ঘদিন বিদেশ ঘুরে ফিরলেন। সঙ্গে তাঁর কথানি রেখাচিত্র আর একটি নাটক। এরই মধ্যে রাজনীতিক চেতনায় তার শান খেয়ে গেল। গোগলের মৃত্যুর উপর প্রবন্ধ লিখে ভূতপূর্ব রাজপুরুষ হলেন রাজবন্দী।

কিন্তু বিক্ষোভ তো সৃষ্টি নয়। সৃষ্টির সম্ভাবনা কি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল? তাকে কি তিনি এক গায়িকার দেহহীন প্রেমে নিঃশেষ করে দিলেন!

তুর্গেনিভের রেখাচিত্রের সংগ্রহ বেরুল। 'স্পোর্টস্‌ম্যান স্কেসেস্' (Sportsman sketches) তার নাম। কিন্তু মানবচরিত্রের নির্যাসকারের মনে হোল, 'না, এপথ নয়। অন্য পথে চলতে হবে, খুঁজে নিতে হবে। বড় কিছু করব।' তিনি অন্য পথে চললেন। 'রুডিন' বেরুল; 'হাউস অফ দি জেণ্টল ফোক্' (বনেদী ঘর) তাঁর নাম সাহিত্যে কায়েমি করে রাখলো। রুশ সাহিত্যের পথ-নির্দেশক হার্জেন লিখলো, 'তুমি আজকের রুশ শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার এই সৃষ্টি অভিজাত সমাজের দর্পণ।' তারপর 'অন দি ইভ' তাঁকে রাজনীতিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলে। 'ফাদার্স' য্যাণ্ড চিলড্রেন'-এ তাঁর নাম সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে গেল। বিরুদ্ধ সমালোচনাও উঠলো এবার। বন্ধুরা শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তুর্গেনিভ

বইখানা পুড়িয়ে ফেলবেন ভাবলেন। কিন্তু তাতো হোল না। তিনি নিজেই দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেলেন।

বিদেশে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন। তবু রাশিয়ার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। আবার বার্ধক্যের ছায়া দেখতে পান। মনে হয়, যা বলবার ছিল বলা হোল না। তবু তিনি এরই মধ্যে লিখে ফেললেন 'স্মোক'। প্রতিক্রিয়াশীল আর চরমপন্থীদের উপর ব্যঙ্গময় হয়ে উঠলেন। আবার নিন্দার ঝড় বয়ে গেল। সাহিত্য জগতে এমন ঝড় আর কখনো বয়ে যায় নি।

এবার প্যারীর শহরতলিতে শেষ জীবনের নিড় বাঁধলেন তিনি। যে গায়িকাকে তিনি ভালবাসতেন, তারই আশ্রয়ে তিনি ঠাঁই পেলেন। তাঁর বন্ধু তখন জোলা, দ্যঁদে, ফ্লবেয়র গোঁকুর। সাহিত্য-সৃষ্টি তখনো তিনি বাদ দেননি। রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে তাঁর শেষ উপন্যাস বেরুল। 'ভার্জিন সয়েল' তার নাম। শেষ দিনগুলি কেটে গেল 'পোয়েমস্ ইন প্রোজ' রচনায়।

বহুবার জীবনে তিনি কলম ছাড়তে চেয়েছেন। মনে ঘনিয়ে এসেছে নিজের শক্তির উপর অবিশ্বাস। কিন্তু তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কলম চলতে লাগলো অবিরাম গতিতে। তিনি লিখে চললেন। এরই মধ্যে রাশিয়া তাঁকে সচেতন স্রষ্টার আসনে বসালে, তাকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মাতামাতি শুরু হোল। তিনি কয়েকবার স্বদেশেও ঘুরে এলেন। কিন্তু সেখানে আর বসবাস করা হোল না। প্যারীর নিভৃত আশ্রয়ই তখন তাঁর প্রিয়। তারপর একদিন প্যারীর শহরতলিতে নিবে গেল তাঁর জীবনের দীপশিখা। যে কলম জীবনে বহুবার ছাড়তে চেয়েছেন, সেই কলম তাঁর হাত থেকে খসে পড়লো। কিন্তু তিনি রইলেন বেঁচে, আজও তাই আছেন —অনাগত যুগেও থাকবেন। সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসাবে মানুষ তাঁকে মনে রাখবে; মনে রাখবে কুশলী কাহিনীকার হিসাবে।

অশোক গুহ

এক

এক মনোরম বসন্তের দিন শেষ হয়ে এল। নির্মল আকাশে উর্ধে ছোট ছোট রক্ত মেঘের দল ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে, মনে হয়, তারা যেন নীল নিতলে তলিয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে।

গুবার্নায়ার ও—শহরের শহরতলীর এক সুন্দর বাড়ি, তারই খোলা জানালায় বসে আছেন দুটি মহিলা। (সাল ১৮৪২)। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, আর একজন বৃদ্ধা, বয়স হবে সত্তর বছর।

প্রথমার নাম মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না কালিতিন। তাঁর স্বামী গুবার্নায়ার ভূতপূর্ব সরকারী উকিল ছিলেন। এক সময়ে তাঁর ছিল বিরাট পসার। তিনি ছিলেন কর্মঠ, কৌশলী আর একগুঁয়ে, খিটখিটে মেজাজের মানুষ। দশ বছর হোল তিনি মারা গেছেন। তিনি উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নীচু ঘরে জন্ম বলে, ছেলেবেলা থেকেই সংসারে উন্নতির জন্য পকেট ভারি করা যে দরকার—একথা তিনি জানতেন। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার এটি ছিল প্রেমজ-বিবাহ। কারণ, বিয়ের সময় স্বামী ছিলেন সুশ্রী, সময় মতো তিনি সুচতুর আর বিনয়ী হতেও জানতেন। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না (কুমারী হিসেবে ছিলেন পেস্তোভা) ছেলেবেলায়ই তাঁর বাবা-মাকে হারিয়ে ছিলেন। ক'বছর মস্কোয়ে এক তিনি নারী শিক্ষাসদনে কাটান, তারপর ফিরে এসে পারিবারিক জমিদারী পোক্রোভাস্কয় গ্রামে বসবাস করেন। পিসী আর বড় ভাই 'ছলেন তাঁর সঙ্গে। তাদের গ্রামখানি বড় শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ ভের্স্ট দূরে

হবে। কিছুদিনের মধ্যেই ভাই সেন্ট পিটার্সবুর্গে সরকারী চাকুরী পেয়ে চলে গেলেন। বোন ও পিসীর সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহারই করতেন। হঠাৎ মৃত্যু এসে তার জীবনের ক্ষুদ্র পর্ব সাঙ্গ করে দিলো। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না এবার হলেন পোক্রোভাস্কয়ের মালিক, কিন্তু তিনিও বেশিদিন সেখানে রইলেন না। কালিতিন ক'দিনেই তার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তাই কালিতিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ের একবছর পরে পোক্রোভাস্কয় বেশি অর্থকরী এক জমিদারীর সঙ্গে বিনিময় করা হোলো, কিন্তু সেখানে কোনো বাড়ি-ঘর ছিল না। এই সময়ে কালিতিনও ও—শহরে একখানা বাড়ি নিলেন, স্বামী-স্ত্রী এবার স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধলেন। বড় বাগান-ঘেরা বাড়িখানি, সুমুখে বিস্তৃত প্রান্তর ছড়িয়ে আছে। কালিতিন পল্লী-প্রেমিক ছিলেন না, তাই তিনি ঠিক করলেন, যাহোক, আর গ্রামে ছুটতে হবে না! কিন্তু মনে মনে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না তাঁর প্রিয় পোক্রোভাস্কয়ের এই হস্তান্তরে ক্ষুব্ধই হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রোক্রোভাস্কয়—চঞ্চলা নদী সেখানে বয়ে যায়, অবারিত সেখানে প্রান্তর, শ্যামল কুঞ্জবন—কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি কখনো যান নি, তাঁর জ্ঞান ও সাংসারিক বুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। যাহোক, পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবন এমনি করেই কেটে গেল। স্বামী এক ছেলে আর দুই মেয়ে রেখে মারা গেলেন। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না তখন নাগরীক জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর শহর ছাড়বার তাঁর ইচ্ছে নেই।

যৌবনে মারিয়া ছিলেন স্বর্ণকেশী, সুন্দরী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল; আজ পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর অঙ্গ থেকে সে-শ্রী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। যদিও এখন একটু স্থূলতা আসায় তার কমণীয়তা মুছে গেছে। তিনি দয়াবতী, কিন্তু দয়ার চাইতে ভাবালুতা তাঁর বেশি। এখনো এই পরিণত বয়সে স্কুলে পড়বার সময়ের হাবভাব বজায় আছে;

তিনি নিজেকে পঙ্গু বলে ভাবেন, একটুতেই চটে যান, যদি কেউ তাঁর খেয়ালে বাধা দেয়, তিনি কেঁদেও ফেলেন। কিন্তু তিনি একটু প্রশংসা পেলে দয়াময়ী হয়ে ওঠেন, মানুষের মন জয় করে নেন; তখন কেউ তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারে না। তাঁর বাড়িখানিও শহরের মধ্যে সেরা আর দেখতেও সুন্দর। তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি, পিতৃদত্ত সম্পত্তি তেমন নয়, তবে স্বামীর মিতব্যয়িতা সে-অভাব পূরণ করেছে। দুই মেয়েই তাঁর সঙ্গে আছে, ছেলেটি পড়ছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের এক সেরা কলেজে।

যে বৃদ্ধাটি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না্র সঙ্গে বসে আছেন, তিনি তাঁর সেই পিসীমা, যার সঙ্গে তিনি পোক্রোভাস্কয়ের নিরালায় কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর নাম মারফা দিমোফিয়েভনা পেস্তোভা। স্বাধীনচেতা, খামখেয়ালি মানুষ বলে তিনি পরিচিত, যা সত্য তা সবার মুখের উপরই তিনি বলে দেন, তার টাকাকড়ি কম থাকলেও ধনের আড়ম্বর তিনি দেখাতে পারেন—সে কৌশলটুকু তাঁর জানা। কালিতিনকে তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর ভাইঝি তাকে বিয়ে করবার পর তিনি তাঁর ছোট গ্রামখানিতে ফিরে যান, আর সেখানে এক চাষীর ভাঙাচুরো ঘরে পুরো দশটি বছর কাটিয়ে দেন। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না তাকে একটু ভয়ও করেন। ক্ষুদে মানুষটি, চোখা নাক, কালো চুল, চোখের দৃষ্টি এই বুড়ো বয়সেও তীক্ষ্ণ। মারফা দিমোফিয়েভ্না এখনো স্বচ্ছন্দে সোজা হয়ে চলেন, ভারি গলায় জোরে দ্রুত আর স্পষ্ট কথা বলে যান। সব সময়েই তাঁর মাথায় থাকে সাদা লেস-দেওয়া টুপী আর গায়ে সাদা জ্যাকেট।

তিনি হঠাৎ মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিগো বাছা, অমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ কেন?

অপরা উত্তর দিলেন, কিছু না, কি সুন্দর মেঘ!

ওদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে নাকি গো?

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না নিরুত্তর।

মারফা দিমোফিয়েভনা কাঁটা দিয়ে, দ্রুত বুনতে বুনতে আবার মন্তব্য করিলেন, (তিনি একখানা বড় পশমের স্কার্ফ বুনছিলেন) ভাবছি, গিদোয়েনোভ্স্কী এখনো আসছে না কেন? সে তোমাকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে সাহায্য করবে—না হয় তো আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসবে।

তুমি ওঁর উপরে সব সময়েই চটা! সার্জি পেত্রোভিচ একজন মানুষের মত মানুষ।

ঘৃণাভরে বৃদ্ধা প্রতিধ্বনি করলেন, হুঁ—ও আবার মানুষ!

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলে চললেন, আমার স্বামীকে কত শ্রদ্ধাই না করতেন, আজো তাঁর কথা বলতে গেলে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন।

মারফা দিমোফিয়েভনা বিড়বিড় করে বললেন, তাঁর কাঁটা জোরে চলতে লাগলো—তা হবে বইকি বাছা। তোমার স্বামী তাকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে আনে নি?

শোন বলি, ও দেখতে অমনি মিনমিনে, মাথা ওর পাকা চুলে ভরতি, কিন্তু যখনি ও মুখ খোলে, অমনি মিথ্যে কথা, কি কারো নিন্দে ঝরে পড়ে! ও কিনা সরকারী চাকুরে, একেবারে দরের লোক! যাহোক-তাহোক, ওতো গাঁয়ের পাদ্রির ছেলে ছাড়া কিছুই নয়।

দেখো পিসী, সবারই কিছু না কিছু খুঁত থাকে। এটা যে ওর দুর্বলতা তা বলবই, সার্জি পেত্রোভিচ লেখাপড়া তেমন শেখেন নি। হাঁ! একথাও মানি—তিনি ফরাসীতে কথা বলতে পারেন না; কিন্তু যাই-ই বলো, লোকটি বেশ ভালো।

হাঁ! ভাল তো হবেই, সব সময়েই তো তোমার হাতের উপর চুমু খায়। ফরাসীতে কথা বলতে পারে না, তাতে এমন কিছু অঘটন ঘটে নি বাছা। এই তো, আমিও ফরাসী বলায় দোরস্ত নই। কিন্তু ও কোনো ভাষায় কথা বলতে না পারলেই ভাল হোত—তাহলে ডাহা মিথ্যে কথাগুলি বলতে হোত না।

মারফা দিমোফিয়েভনা পথের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—ঐ তো তোমার চমৎকার লোকটি গুটি গুটি এদিক পানেই আসছে। যেমন রোগা তেমনি ঢেঙ্গা লোকটা, ঠিক যেন স্টর্ক পাখী।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না চুল আঁচড়ে একটু ফিটফাট হয়ে নিলেন, মারফা দিমোফিয়েভনা বিদ্রূপের দৃষ্টি হানছেন।

কিগো বাছা, পাকা চুল নিশ্চয়ই নয়? তোমার ঐ পালাস্কাকে কিন্তু বলা উচিত, তার কি চোখ নেই নাকি?

তাঁর কথায় মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না আহত হয়ে চেয়ারের হাতলে আঙুল দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, দেখ পিসী, সব সময়েই তুমি শুধু…

এমন সময় ছোকরা চাকর দরজা দিয়ে উঁকি মেরে জানালো—সার্জি পেত্রোভিচ গিদোয়েনোভ্স্কী এসেছেন।

দুই

তিনি ঘরে ঢুকলেন—লম্বা মানুষটি, ছিমছাম ফ্রক কোট তার গায়ে, সরু ট্রাউসার পরণে—হাতে সোয়েডের দস্তানা, গলায় ডবল গলাবন্ধ—তার উপরেরটি কালো, আর নীচেরটি সাদা। তার চেহারায় ভদ্রতা আর আভিজাত্যের ছাপ—তার সুশ্রী মুখ, মসৃণ কপাল থেকে চ্যাপটা গোড়ালি-ওয়ালা জুতো পর্যন্ত চুইয়ে পড়ছে আভিজাত্য। প্রথমে তিনি বাড়ির কর্ত্রীকে অভিবাদন জানালেন, তারপরে মারফা দিমোফিয়েভনাকে। এবার আস্তে আস্তে দস্তানা খুলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার হাতের উপর ঝুঁকে পড়লেন। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি চুমু এঁকে দিয়ে একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আঙুলের ডগা ঘসতে ঘসতে হেসে বললেন,

এলিজাবেথা মিখাইলোভ্না ভাল আছেন তো?

মারিয়া জবাব দিলেন,

হাঁ! ও বাগানে আছে।

এলেনা?

লিনোচ্‌কাও বাগানে গেছে। কোনো নতুন খবর আছে নাকি?

তিনি চোখ বুজে ঠোঁট চেপে নিয়ে বললেন, হাঁ, আছে বইকি,

হুঁ…খবর তো আছেই, আর ভারি তাজ্জব খবর, লাভ্রেৎস্‌কী ফিওদর ইভানিচ এখানে এসেছেন।

মারফা দিমোফিয়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন, কে, ফিদিয়া! ওগো ভাল মানুষের বাছা, সত্যি বল, তৈরী করে তো বল নি?

নিশ্চয়ই নয়, আমি তাঁকে নিজে দেখেছি।

তাতে কি প্রমাণটা পেলাম!

গিদোয়েনোভ্‌স্কী যেন দিমোফিয়েভনার কথা শুনতে পান নি, এমনি ভাব দেখিয়ে বলে চললেন, বেশ ভালই আছেন, চেহারা ফিরে গেছে।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা আস্তে আস্তে বললেন, ভাল আছে! ও ভাল থাকতে পারে একথা কেউ বলবে না। গিদোয়েনোভ্‌স্কী কথার খেই ধরে বললেন,

হাঁ, ঠিকই বলেছেন, ওঁর মতো অবস্থায় অন্য কেউ হলে সমাজে মিশতেই পারতো না—অন্তত মেশবার আগে একবার ভাবতোও!

মারফা দিমেফিয়েভনা বাধা দিলেন এবার; কি বাজে বকছ! মানুষটা বাড়ি ফিরছে—ওকে তোমরা কোথায় পাঠাতে চাও বল তো? এখন বুঝতে পারছি, ওর কোনো দোষ নেই।

মাদাম, একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, স্ত্রী যদি দোষ করে তার জন্য স্বামীই সব সময়ে দায়ী।

হাঁ, তুমিই একথা বলতে পার, জীবনে তো বিয়ে করলে না।

গিদোয়েনোভ্‌স্কীর মুখে হাসি দেখা দিল…

তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আমার কৌতূহল মাপ করবেন, কিন্তু এমন সুন্দর স্কার্ফখানা কার জন্য বুনছেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

মারফা তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন,

গুজব রটিয়ে বেড়ায় না, ছল-চাতুরী করে না, মিছে কথা কয় না, এমন লোক যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে, তাকে দেব এই স্কার্ফখানা। আমি ফিদিয়াকে ভাল করে জানি ; তার একমাত্র দোষ ছিল সে স্ত্রীকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে তার মাথাটি খেয়েছিল। তার কারণ, প্রেম করে ওরা বিয়ে করেছিল ! প্রেম করে বিয়ে করে কারো ভাল হয় নি বাছা। বৃদ্ধা কথাটা বলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এবার বাছা, যাকে খুশি নিয়ে পড়, কুচি কুচি করে কাট-ছেঁড়···আমাকে যদি বাদ না দাও তাতেও আমার বয়ে গেল ! আমি চললাম, তোমাদের পথের কাঁটা হয়ে থাকব না। মারফা দিমোফিয়েভনা বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, পিসী চিরদিনই এমনি !

গিদোয়েনোভ্‌স্কী বললেন, আপনার পিসী বুড়ো হয়েছেন···এমনি তো হবেনই ! উনি ছল-চাতুরী কথা তুললেন···আজকের দিনে কে না ছল-চাতুরী করে বলুন তো ? জীবনই এমনি ছল-চাতুরী ভরা। আমার এক বন্ধু···বেশ কেউকেটা, সবদিক দিয়েই যোগ্য·· তিনি বলতেন, ছল-চাতুরী না করে আজকাল একটা মুরগী পর্যন্ত শস্যের কণা মুখে তুলে নেয় না···সে কখনো সোজা গিয়ে শস্যের কণা মুখে তুলে নেবে না, যাবে ঘোরা পথে। কিন্তু আপনার দিকে যখন তাকাই·· দেবদূতের আত্মা যেন আপনার ভিতরে দেখতে পাই, আপনার ঐ তুষার-শুভ্র ছোট হাত দুখানির উপর কি আমাকে আর একটিবার চুমু খেতে দেবেন ?

মারিয়ে দিমিত্রিয়েভ্‌নার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো, তিনি তার

হাতের খুদে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন। গিদোয়েনোভ্স্কী আঙুল তুলে নিয়ে ঠোটের ওপর চেপে ধরলেন। তাঁর কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে মারিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন,

তাহলে ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? ও কি সত্যি ভালো আছে···ওকে বেশ হাসিখুশি দেখলেন?

হাঁ, বেশ হাসিখুশি···গিদোয়েনোভ্স্কী উত্তর দিলেন।

ওর স্ত্রী কোথায় শোনেন নি?

এই সেদিনও প্যারাতে ছিল, এখন নাকি ইতালীতে আছে।

সত্যি ফিদিয়ার অবস্থা ভয়ঙ্কর; জানি না, সে কি করে এখনো সয়ে আছে! অবশ্য দুর্ভাগ্য যে-কারো জীবনেই আসতে পারে; কিন্তু ওর ব্যাপারটা সারা ইউরোপে রটে গেছে।

গিদোয়েনোভ্স্কী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন···

হাঁ, হাঁ, তা বটে। আপনি তো জানেন, ওর স্ত্রী যত শিল্পী আর পিয়ানো-বাজিয়ের সঙ্গে মিশেছিল···যত সব বাজে মানুষের সঙ্গে ছিল তার হৃদ্যতা, মেয়েটা একেবারে নির্লজ্জ!

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বললেন, আমার সত্যি দুঃখ হয়। ও তো আমাদের পরিবারেরই মানুষ—সার্জি পেত্রোভিচ আপনি তো জানেন, ও আমারই এক দূর-সম্পর্কের ভাই।

নিশ্চয়ই জানি! আপনার পরিবারের কিনা আমি জানি।

আপনার কি মনে হয়, ও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে?

আমার তো তাই মনে হয়। শুনলাম, তিনি নাকি জমিদারীতে চলে যাচ্ছেন।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না চোখ তুলে তাকালেন।

সার্জি পেত্রোভিচ, যখন এসব ভাবি তখন মনে হয়, আমাদের মেয়েদের কতখানি বুঝে শুনে চলতে হয়।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না, সব মেয়েই তো একরকম নয়। মানুষের দুর্ভাগ্য, তাই বহু চঞ্চল মেয়ে সংসারে দেখা দেয়···আর বয়সেরও দোষ বটে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা হয় না (সার্জি পেত্রোভিচ এবার পকেট থেকে নীল ডোরাকাটা রুমাল বার করে তার ভাঁজ খুলতে লাগলেন)।

হ্যাঁ, এমনি মেয়ে বহু আছে। (সার্জি পেত্রোভিচ রুমালের কোন দিয়ে সন্তর্পণে চোখ দুটি মুছে নিলেন) কিন্তু সাধারণত বলতে গেলে··· উঃ শহরের ধুলো কি ভয়ানক!—কথা তিনি এইভাবেই শেষ করলেন।

মা···মা···ভ্লাদিমির নিকোলাই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন! বলতে বলতে ঘরে ছুটে এলো একটি এগারো বছরের মেয়ে। সুশ্রী, লাবণ্যময়ী মেয়েটি।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না উঠে পড়লেন; সার্জি পেত্রোভিচ অভিবাদন জানালেন। তার পরে ঘরের এক কোণে গিয়ে নাক ঝাড়তে লাগলেন।

মেয়েটি বলতে লাগলো, ওঁর কি সুন্দর ঘোড়াটা মা! এই তো এইমাত্র উনি বাগানের বেড়ার ধারে এসে লিজা আর আমাকে বললেন, এখুনি তিনি বারান্দায় আসছেন।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটি কমণীয় কান্তি তরুণকে দেখা গেল সুন্দর এক ঘোড়ার পিঠে, সে খোলা জানালার কাছে এসে থামলো।

তিন

ঘোড় সওয়ার তরুণটি চীৎকার করে উঠলো, কেমন আছেন মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না? আমার নতুন কেনা জিনিসটি কেমন হয়েছে?

মারিয়া জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ওল্ডমার, তুমি কেমন আছ? বাঃ কি চমৎকার ঘোড়া! কোথায় কিনলে?

সেনাবিভাগের এক কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে···পাজিটার জন্যে বহু টাকা গুণে দিতে হয়েছে।

ওর নাম কি?

অরল্যাণ্ডো···বাজে নাম, বদলে দিতে চাই। কি অশান্ত ঘোড়া, দেখেছেন!

ঘোড়াটা ডাকছে, নাচছে, ফেনা-ওঠা মুখখানা নাড়ছে বারবার।

লিনোচ্‌কা, ওর গায়ে হাত দাওনা, ভয় নেই।

খুদে মেয়েটি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু অরল্যাণ্ডো হঠাৎ ডেকে উঠে সরে গেল।

ঘোড়-সওয়ার তার ঘাড়ে শপাং করে মারলো চাবুক, তারপর দুপাশে গুঁতা মেরে জানালার কাছে নিয়ে এল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তখনো বলছেন, বাঃ—চমৎকার!

যুবকটি বললো, কই,·· চাপড়ে দাও ওর গা। ওর মর্জি মতো আমি ওকে চলতে দেব না।

মেয়েটি আবার হাত বার করে ভয়ে ভয়ে অশান্ত ঘোড়ার নাকে হাত বুলিয়ে দিল। নাক ফুলে ফুলে উঠছে তার, নড়ছে।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে উঠলেন, সাবাস! এবার তুমি ঘোড়া থেকে নেমে ভিতরে এস।

ঘোড়সোওয়ার কৌশলে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে কাঁটা দিয়ে আঘাত করলো, ঘোড়া এবার কদমে ছুটে উঠানে এসে ঢুকলো। এক মুহূর্তের বিরতি। হাতে চাবুক দোলাতে দোলাতে হলের দরজা দিয়ে যুবকটি এবার বসবার ঘরে ছুটে এল। ঠিক এমনি সময়ে দীর্ঘদেহ, তন্বী, কৃষ্ণকেশী একটি তরুণী এসে দেখা দিল দরজায়, বয়স তার উনিশ। এটি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার বড় মেয়ে লিজা।

চার

ভ্লাদিমির নিকোলাই পানসীন নামে যে যুবকটিকে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, সে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিশেষ কাজের ভার তার উপরে···সবে সে ও—শহরে জরুরী সরকারী কাজে এসেছে। গভর্ণর জেনারেল জোনেনবার্গ-এর অধীনে কাজ করছে। তাঁর সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। পানসীনের বাবা ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন, তিনি বিখ্যাত জুয়াড়ি বলেও পরিচিত ছিলেন। তার চোখের দৃষ্টি ছিল কোমল, মুখখানা বলিরেখায় কলঙ্কিত, ঠোঁটের কাছে স্নায়ু-দৌর্বল্যের কম্পন দেখা দিত। তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়। তুটি রাজধানীর ইংরেজদের ক্লাবগুলিতে তিনি ঘোরাফেরা করতেন, তাঁকে লোকে চতুর বলে জানত, যদিও বিশ্বাস তাঁর উপরে তাদের কমই ছিল। কেউ তাকে পরম বন্ধু জ্ঞানে গ্রহণ করে নি। কিন্তু এত চতুর হলেও সব সময়েই তার ছিল অভাব, তাই মরবার সময়ে ছেলের জন্য সামান্য সম্পত্তিই রেখে যান···তাও আবার দেনার দায়ে বাঁধা। কিন্তু যাই হোক, তিনি ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভ্লাদিমির নিকোলাই ফরাসীভাষা চমৎকার বলে, ইংরেজী ভাষায়ও তার দখল ভাল, আর জার্মানভাষা বলে খুবই খারাপ। কিন্তু সুযোগ মতো তু-একটা জার্মান কথা চালানো পিটার্সবুর্গের বিলাসী সমাজের কেতা··· অন্তত তারা তো তাই বলে, আর তাতে সে বেশ তুরস্ত। পনেরো বছর বয়সেই ভ্লাদিমির নিকোলাই যে কোনো অভিজাত পরিবারের বৈঠকখানায় অপ্রতিভ না হয়ে ঢুকতে পারতো, সেখানে বসে মিষ্টি সুরে নানা কথা বলতে পারতো, তারপর সময় হলে বিদায় নিত। পানসীনের বাবা তাকে

বহু যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। দুটি রাবারের মাঝখানে বা 'গ্র্যাণ্ড স্লামের' পর তাস ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি কখনো কোনো হোমরাচোমরা-দের কাছে তাঁর 'ভোলোদকা'র সম্পর্কে দু-একটা কথা বলার সুযোগ ছাড়তেন না। হোমরা-চোমরা লোকটি তখন তার ক্রীড়ানৈপুণ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। যাহোক, ভ্লাদিমির নিকোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে লাগলো, বি-এ ডিগ্রী নিয়েও সে বেরলো। তার সঙ্গে বহু গুণসম্পন্ন যুবকের যথেষ্ট আলাপ হোলো, সেরা বাড়ীগুলিতে সে পেল অভ্যর্থনা। সব জায়গাতেই তার আদর। দেখতে সে অতি সুশ্রী, ভাবভঙ্গীতে বেপরোয়া, আমোদপ্রিয়, স্বাস্থ্যবান, আর সামাজিক; যখন প্রয়োজন হয় সে নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধায়, কখনো বা উদ্ধত হয়ে ওঠে···এক কথায় চমৎকার লোক। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন···পানসীন শীগ্‌গীরই অভিজাত সম্প্রদায়ের রহস্য আবিষ্কার করে ফেললো। তার আইন-কানুনের প্রতি সত্যিই সে শ্রদ্ধা দেখাতে লাগলো। যা তুচ্ছ তার প্রতি রইল তার কপট গাম্ভীর্য, আর যা সত্যিই গুরু, তার প্রতি সে দেখালো তার কপট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। নাচে সে প্রশংসা আদায় করে নিলে, পোশাকে সে ইংরেজীয়ানা অনুকরণ করলো। শীগ্‌গীরই সে অমায়িক আর সর্বগুণান্বিত যুবক বলে পিটার্সবুর্গ সমাজে খ্যাত হোল। পানসীন অতি চতুর, বাপের চেয়েও সে বেশি। কিন্তু গুণও তার কম নয়। যে কোনো ব্যাপারেই সে পটু। সে সুন্দর গান গায়, রেখাচিত্র আঁকায় সে দক্ষ, কবিতা লেখে, আবার অভিনয়েও একেবারে অক্ষম নয়। তার এখন আঠাশ বছর বয়েস, এর মধ্যে সে অভিজাত সম্প্রদায়ে নাম কিনেছে, এবং উচ্চ পদেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পানসীনের নিজের উপর আস্থা আছে, নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপর আছে পূর্ণ বিশ্বাস, তাই সে সাহসভরে স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলেছে জীবনের পথে। যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই সে প্রিয়। সে মনে করে, সে লোক চেনে—বিশেষ করে মেয়েদের। হাঁ, নিশ্চয়ই সে তাদের স্বাভাবিক দুর্বলতার খোঁজ রাখে!

শিল্পের প্রতি আসক্তি তার আছে। সে এক অন্তর্নিহিত অনুরাগ, কল্পনার আবেগ সে অনুভব করে, কখনো বা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। তারই ফলে জীবনে তার বিচ্যুতি এসেছে, কিছু বুনো জুঁই সে বুনেছে। ভদ্র-সমাজের গণ্ডির বাইরে যারা, তাদের সঙ্গে সে মিশেছে, নিজেকে সে ভাসিয়ে দিয়েছে অবাধ স্বচ্ছন্দ জীবনের আবর্তে। কিন্তু মনে মনে সে শীতল, উত্তেজনাহীন, কৌশলী। যখন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের প্রচণ্ড ঘুর্ণিতে সে ভেসে যায়, তখনো তার ধূর্ত, ধূসর চোখ দুটি থাকে সজাগ, তারা কি ঘটছে না ঘটেছে চেয়ে দেখে। এই সাহসী স্বাধীনচেতা মানুষটি কোনো আবেগেই নিজেকে পুরোপুরি ভাসিয়ে দিতে পারে না। আর তার ঠিক বিচার করতে গেলে বলতে হয়, নিজের কীর্তির গর্ব সে করে না। শহরে এসেই সে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার বাড়িতে ঢোকার পথ করে নিয়েছে, এখন তো সেখানে সে প্রতিষ্ঠিত। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তো তাকে খুবই ভালবেসে ফেলেছেন।

পানসীন ঘরের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে মারিয়া আর এলিজাবেথার সঙ্গে করমদন করলো, গিদোয়েনোভ্‌স্কীর পিঠ আলতো-ভাবে চাপড়ে দিলো, তারপর লিনোচ্‌কার মাথাটা নুইয়ে তার কপালে খেল চুমু।

মারিয়া দিমিত্রেয়েভ্‌না তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমন একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়তে তোমার ভয় করে না ?

ও ভারি ভদ্র। কিন্তু আমি সত্যই যা ভয় করি, সে হচ্ছে সার্জি পেত্রোভিচের সঙ্গে হুইষ্ট খেলা। কাল তো বেলেনসিনের ওখানে হুইস্টে উনি আমার যথাসর্বস্ব জিতে নিয়েছেন।

গিদোয়েনোভ্‌স্কী মৃদু হাসলেন, অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে আগত এই ছোকরা-অফিসারটিকে খুশি করতে চান। সে তো শুধু অফিসারই নয়, গভর্ণরের প্রিয়পাত্রও বটে।

তাই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার সঙ্গে আলাপে তিনি প্রায়ই পানসীনের গুণের বাখ্যান করেন।

তিনি বলেন, ওকে কে না প্রশংসা করে বলুন, বড় বড় মহলে ওর নাম, অফিসার হিসাবে আদর্শ, একটুও হামবড়া ভাব নেই। কথাটা সত্যি, সেণ্ট পিটার্সবুর্গেও পানসীনের দক্ষ অফিসার হিসাবে খ্যাতি আছে, কর্মক্ষমতা তার অসাধারণ। সে অবশ্য এ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যই দেখায়। নিজের কাজের প্রতি সাংসারিক মানুষের এমনি তাচ্ছিল্য করাই রীতি। তবু সে দক্ষ কর্মচারী হিসাবেই পরিচিত। উপরওয়ালারা এমনি কর্মচারীই চান; যদি তার ইচ্ছে হয়, কালে সে মন্ত্রীত্ব পাবে এ বিষয়ে তার নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

গিদোয়েনোভ্স্কী বললেন,

মশাই তো বলছেন, আমি সর্বস্ব জিতে নিয়েছি, কিন্তু সেদিন আমার কাছ থেকে বারো-বারোটা রুবল কে জিতে নিলো? তারপর আবার···

আপনি তো বড় খারাপ লোক, পানসীন বাধা দিলো। তার স্বরে সহৃদয়তার সঙ্গে মিশেছে অবজ্ঞাসূচক বেপরোয়া ভাব। তারপর তাঁর দিকে পিছনে ফিরে, সে লিজার কাছে চলে গেল!

সে বললো, এখানে ওবেরণ-এর মুখপাতের গৎখানা পেলাম না, বেলিন্সিনা তো শুধুই জাঁক করে, তার কাছে সবগুলো মার্গ সঙ্গীত রয়েচে—ওর কাছে কয়েকখানা হাল্কা পোল্কা আর ওয়ালৎস ছাড়া আর কিছুই নেই। তা যা হোক, আমি মস্কোতে লিখেছি, এক হপ্তার ভিতরেই তুমি তোমার গৎখানা পাবে। আর একটা কথা শোনো, আমি কাল একটা নতুন গান বেঁধেছি, বাণীও আমার···শুনবে নাকি? জানিনা, কেমন হয়েছে, বেলিন্সিনা তো বলে চমৎকার, কিন্তু ওর মতামতের তো তেমন দাম নেই। আমি জানতে চাই, তোমার কি মত। না, না, এখুনি না শুনলেও চলবে, আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি!

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বাধা দিয়ে বললেন, অপেক্ষা আর কেন, এখনই শোনা যাক না ?

মধুর হাসিতে মুখ তার প্রদীপ্ত, পানসীন উত্তর দিল, আপনাদের যা অভিরুচি, সে হাসি হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। হাঁটু দিয়ে টুলটা সরিয়ে নিয়ে পিয়ানোর সামনে বসে সে বাজনা শুরু করলো। এবার গান গাইছে, স্পষ্ট, বিশুদ্ধ বাণী…

চাঁদ উঠে এল…
উইলোময় প্রান্তরের শিয়রে
মেঘের ফাঁকে তারার ঝিকিমিকি !
উঁচু থেকে…
সে উত্তাল সাগরকে করছে শাসন
তার কিরণ-মহিমায়।
ওগো প্রিয়,
তুমিতো সেই চাঁদ, আমার আত্মায় জাগিয়েছ ঢেউ—
সে যে এক অসীম সাগর…
সেখানে দুঃখ আর আনন্দ জোয়ার ভাঁটা খেলে
বালুবেলায় তোমারই সুরে সুর মিলিয়ে। *

তোমার জন্যে আমার কামনা, তোমারি কাছে তার অভিযোগ
আমি ভালবেসে মূর্চ্ছা-বিবশ
কিন্তু তুমিতো শান্ত সমাহিত…
যেন ঐ সুন্দর চাঁদের মতো।

গানের দ্বিতীয় কলিতে পানসীন ছড়িয়ে দিল প্রবল দরদ, তারই সঙ্গে মিশে বাজনা যেন প্রচণ্ড এক ঢেউয়ের স্রোত বইয়ে দিল। যেখানে কথা এসে শেষ হোল…'আমি ভালবেসে বিবশ'…এই ছত্রে, সে মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস

ফেললো, চোখ নামিয়ে স্বরকে খাদে নামিয়ে নিলো। যখন গান শেষ হোলো, লিজা প্রশংসা করলো, মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে উঠলেন, চমৎকার! এমন কি গিদোয়েনোভস্কীও চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঃ, বাজনা আর গান দুই-ই সুন্দর! লিনোচ্‌কা গায়কের দিকে চোখ-ভরা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো। এক কথায় সবাই এই তরুণ বিলাসী যুবকের রচনা শুনে খুশি ·· হলের দরজায় সেই মুহূর্তে একজন বৃদ্ধ আনত মুখে দেখা দিলেন, তাঁর কাঁধ ঝাঁকুনি আর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হোল, পানসীনের গান যতই সুন্দর হোক, তাঁকে কিন্তু খুশি করতে পারে নি। একখানা বাজে কাপড়ের রুমাল দিয়ে জুতোর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হঠাৎ চোখ কোঁচকালেন, তারপর গম্ভীর ভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইলেন। এবার নুয়ে-পড়া শরীরখানা আরো নুইয়ে আস্তে আস্তে ঢুকলেন বসবার ঘরে।

ক্রিষ্টোফার ফিওদরিচ, আপনি! সুসন্ধ্যা! পানসীন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি যে এখানে আছেন, তা জানতাম না। তাহলে আপনার সুমুখে গান গাইবার মতো স্নায়ুর জোর আমার কখনো হোত না। আমি তো জানি, আপনি আবার হাল্‌কা গান পছন্দ করেন না। আগন্তুক সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে অতি ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় বললেন, আমি তো শুনি নি। তারপর ঘরের মাঝখানে এসে থেমে গেলেন। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বললেন, ম্যসিঁয়ে লেম্‌ বোধ হয় লিজাকে গান শেখাতে এসেছেন?

না, না, এলিজাবেথা মিখাইলোভনাকে নয়, এলেনাকে।

বেশ, বেশ, লিনোচ্‌কা, মিঃ লেমের সঙ্গে উপরে যাও।

বৃদ্ধ খুদে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পানসীন তাকে বাধা দিলো, ক্রিস্টোফার ফিওদরেভিচ যেন গান শেখাবার পর চলে যাবেন না, এলিজাবেথা আর আমি আপনাকে বেটোফেনের একটা সোনাটা বাজিয়ে শোনাব।

বৃদ্ধ কি যেন বিড়বিড় করে বললেন, পানসীন এবার অশুদ্ধ জার্মানে বললো, এলিজাবেথা মিখাইলোভ্না আমাকে আপনার উৎসর্গ-করা ধর্মসম্বন্ধীয় গৎখানা দেখিয়েছেন—সুন্দর হয়েছে গৎখানি! উঁচুদরের সুর বুঝি না, অনুগ্রহ করে এমন মনে করবেন না। অন্যদিকও অবশ্য এর আছে, মাঝে মাঝে একটু একঘেয়ে লাগে; কিন্তু সবটা মিলিয়ে বেশ।

বৃদ্ধ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, তারপর লিজার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা আবার গানখানা গাইতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু পানসীন সঙ্গীতজ্ঞ জার্মান ভদ্রলোকের কানে পীড়া জন্মাতে চায় না। সে লিজাকে তার বদলে বেটোফোনের সোনাটাখানা শুরু করতে বললে। মারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গিদোয়েনোভ্স্কীকে বাগানে বেড়াবার প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন, চলুন আমরা গিয়ে বেচারী ফিদিয়া সম্পর্কে যে কথা হচ্ছিল, তাই বলি। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শও করতে হবে। গিদোয়েনোভ্স্কী হাসিমুখে অভিবাদন জানালেন, তারপর আলতো ভাবে দু আঙুলে টুপিটা তুলে নিলেন। টুপির ধারে সযত্নে ভাঁজ করা দস্তানাদুটোও ছিল। এবার মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার পিছনে পিছনে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। পানসীন আর লিজা ঘরে একা। সে সোনাটাখানা বার করলো তারপর দুজনে গিয়ে নিঃশব্দে বসলো পিয়ানোর ধারে। উপর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট শব্দ, সুর বাজছে, স্খলিত আঙুলে থেমে থেমে বাজাচ্ছে খুদে লিনোচ্কা।

পাঁচ

ক্রিস্টোফার থিয়োডোর গটালিয়ের লেম জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৬ সালে সাক্সনি রাজ্যের চেমানিজ শহরে। তার বাবা-মা ছিলেন গরীব, সঙ্গীতই ছিল তাঁদের পেশা। বাবা ফরাসী হর্ন বাজতেন, মা হার্প। যখন সবে

তার পাঁচ বছর বয়স, তিনি তিনটি বাজনা বাজাতে শিখলেন। আট বছর বয়সে তিনি হলেন অনাথ, আর দশ বছর বয়স থেকে সঙ্গীতবিদ্যা দিয়েই জীবিকা অর্জনে লেগে গেলেন। বহুদিন তিনি ভ্রাম্যমান জীবন কাটিয়েছেন। যেখানে সম্ভব সেখানেই বাজাতেন—সে সরাইখানা, মেলা, চাষীদের বিয়ের সভা, বল নাচ—যেখানেই হোক। তারপরে তিনি ঢুকলেন এক অর্কেষ্ট্রায়, সেখানে উন্নতি করে করে তিনি হলেন পরিচালক। গায়ক হিসাবে তিনি খুবই নীচুদরের, তবে সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। আটাশ বছর বয়সে তিনি এলেন রাশিয়ায়। একজন মহামানী ভদ্রলোক তাকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ছিল না, কিন্তু আড়ম্বরের খাতিরেই তিনি এক অর্কেষ্ট্রা দল তৈরী করেছিলেন। লেম তাঁর ওখানে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে সাত বছর কাজ করেন, তারপরে সেখান থেকে বিদায় নেন। এখানে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এর মধ্যে মহামান্য ব্যক্তিটি দেউলে হয়ে পড়েন, তিনি লেমকে খৎ লিখে দিতে চাইলেন, শেষে আবার কি ভেবে নিরস্ত হলেন··· তার মানে, তিনি তাকে এক পয়সাও দিলেন না। লেমকে সবাই পরামর্শ দিলে, তিনি যাতে রাশিয়া ছেড়ে চলে যান। কিন্তু রাশিয়া, মহান রাশিয়া, শিল্পীর স্বর্ণভূমি ছেড়ে ভিখারীর বেশে দেশে ফিরতে তিনি রাজি নন; তার ইচ্ছে এখানে থেকেই তিনি ভাগ্য-পরীক্ষা করবেন। তারপর বিশ বছর ধরে চললো ভাগ্য-পরীক্ষা। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে রইলেন, মস্কো আর প্রাদেশিক শহরগুলিতে চেষ্টাও চললো; এর মধ্যে অনেক সইলেন, এল চরম দারিদ্র্য, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু গেলো। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশে ফেরার ভাবনা তাঁর যায়নি, এই একটি চিন্তাই তাঁকে সহনশক্তি যুগিয়ে ছিল। কিন্তু ভাগ্য তাকে তার প্রথম ও শেষ কামনা পূরণ করতে দেয়নি; তাই পঞ্চাশ বছর বয়সে, রোগগ্রস্থ ও অকালে পঙ্গু হয়ে তিনি ও—শহরে এসে পড়লেন, আর এখানেই রাশিয়া

ত্যাগের আশা ছেড়ে দিয়ে বসবাস করতে লাগলেন···অথচ রাশিয়া তার ভাল লাগে না। কিন্তু এই তো নিয়তি। তারপর বাজনা শিখিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা। লেম-এর চেহারা সুশ্রী নয়। তিনি বেঁটেখাটো মানুষটি, কুঁজিয়ে চলেন, কাঁধ দুখানা বাঁকা, পেটের দিকটা সরু, পা তার মস্ত বড় ধ্যাবড়া। লালচে হাতে নীল-শিরা, আঙুলগুলো মোটা, তাতে নীলচে-সাদা নখ, মুখখানা শীর্ণ, গাল ভেঙে গেছে, ঠোঁট দৃঢ়-সংবদ্ধ, বারবার তা কুঁচকে যায় আর কামড়েও থাকেন—এতে তার চিরাভ্যস্ত একগুয়েমিরই পরিচয় মেলে। তাঁর সবকিছু মিলিয়েই বিরক্তিকর অনুভূতি আনে। ভ্রূর উপরে সাদা চুল থোকায় থোকায় ছড়ানো, খুদে ভাবলেশহীন চোখে নিষ্প্রভ আগুনের ছায়া; কেমন জবুথবু হয়ে চলেন, তার দেহটা প্রতি পদক্ষেপে হেলতে-দুলতে থাকে। তার দেহ সঞ্চালনের ভঙ্গী মানুষকে খাঁচায়-পোরা পেঁচার ভাবভঙ্গীই মনে করিয়ে দেয়—কেউ লক্ষ্য করছে মনে হলে ঠিক অমনিই করে পেঁচা। তখন সে হতাশ হয়ে তার বড় বড় ভীরু আর হলদে দুটি চোখ তুলে মিটমিট করে অমনি তাকায়। কি এক গভীর দুঃখ এই দরিদ্র শিল্পীর মুখে ছাপ রেখে গেছে···সে ছাপ মোছা যায় না, যাবে না। তার চেহারা একে সুশ্রী নয়, তার উপরে এতে আরো খারাপ দেখায়। কিন্তু যারা প্রথম দর্শনে প্রভাবিত হতে চান না, তার চেহারার ভিতরে তারা ভালোমানুষের সততা দেখতে পান, যা এই চূর্ণ-বিচূর্ণ মানুষটির কাছ থেকে আশা করা যায় না। তিনি বাখ্ আর হাণ্ডেলের ভক্ত, তিনি তাঁর নিজের বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁর প্রখর মানসিক শক্তি জার্মান জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। যদি জীবনের ধারায় তার পরিবর্তন ঘটতো, কে জানে···লেম হয়তো তার দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে সমান আসন পেতেন, কিন্তু শুভলগ্নে তাঁর তো জন্ম হয়নি। তিনি জীবনে বহু সুর রচনা করেছেন, কিন্তু তার একখানাও প্রকাশিত হয়নি। তার মানে···তিনি কোন জিনিষ সুষ্ঠুভাবে করতে জানেন না।

উপযুক্ত জায়গায় অনুগ্রহ ভিক্ষা বা ঠিক সময়ে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বহুদিন আগে তার এক ভক্ত—সে তারই স্বগোত্র এবং গরীব বন্ধু—তার দু-একখানা সোনাটা নিজের খরচে ছাপিয়ে বার করে, কিন্তু সেই গোটা সংস্করণটাই দোকানের তাকে পড়ে আছে। বিস্মৃতির গর্ভে তারা তলিয়ে গেছে…কেউ যেন তাদের রাতারাতি নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দিয়েছে নদীতে। অবশেষে লেম সবকিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলেন; চললো দুর্দিন; তার মন হাত দুখানার মতোই অবশ হয়ে এলো। কালিতিনদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে একখানা ছোট বাড়ীতে এখন তিনি থাকেন। মুসাফিরখানা থেকে এক বুড়ী রাঁধুনি জুটিয়ে নিয়েছেন (তিনি বিয়ে করেননি)। তিনি খুব বেড়ান, বাইবেল পড়েন, আর পড়েন স্তোত্রমালা আর শ্লেগেল অনূদিত শেকস্‌পীয়ার। বহুদিন আর কোনো সুর রচনা করেন নি। কিন্তু লিজা তার সবচেয়ে ভাল ছাত্রী, সে তাঁকে অলসতা থেকে জাগিয়ে তুলেছে। পানসীন যে সুরটির কথা বলছিল, তিনি স্তোত্রমালা থেকে তার বাণী নিয়েছেন, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন নিজের কিছু রচনা। দুটি সমবেত সঙ্গীতে এটি গাওয়া হবে, একটি সুখী আর একটি দুঃখী মানুষের সঙ্গীত…সমাপ্তিতে দুটি সঙ্গীত এক সঙ্গে মিলে যাবে…সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠবে:

হে দয়াময় ভগবান, পাপীকে ক্ষমা কর, পাপ চিন্তা আর পার্থিব আকাঙ্খা থেকে আমাদের মুক্তি দাও।

স্বরলিপিটির সামনের পাতায় বহু যত্নে লেখা, তাতে কিছুটা কারু-কৌশলও আছে:

শুধু ন্যায়বানরাই সাধু। একটি ধর্মাত্মক সুর। আমার সর্বোত্তম ছাত্রী কুমারী এলিজাবেথা কালিতিনের জন্য এবং তাঁর নামে তার শিক্ষক সি, টি, জি, লেম দ্বারা উৎসর্গীকৃত হোলো। 'শুধু ন্যায়বানরাই সাধু' আর 'এলিজাবেথা কালিতিন' কথা দুটি আলোকমণ্ডলের ভিতরে রয়েছে। আর

তার নীচে আছে—শুধু তোমার জন্য। এইজন্যেই লেম লজ্জার লাল হয়ে উঠে লিজার দিকে ভৎর্সনা দৃষ্টি হেনেছেন, পানসীন স্বরটি সম্বন্ধে বলায় তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

ছয়

পানসীন জোরে দৃঢ়হাতে প্রথম তন্ত্রীতে ঘা মারলো। সে দ্বিতীয় স্তবক বাজাচ্ছে কিন্তু লিজা তখনো শুরু করেনি। সে একবার থেমে পড়ে তাকিয়ে দেখলে। লিজার চোখ তার উপরে দৃঢ়সংবদ্ধ, অসন্তোষ সেখানে ফুটে উঠেছে। ঠোঁটে হাসির লেশ মাত্র নেই, মুখখানা কঠোর, বুঝি বা বিষণ্ণ।

সে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি ?

লিজা উত্তর দিলে, আপনি কথা রাখলেন না কেন ? আমি এই শর্তেই আপনাকে ক্রিস্টোফার ফিওদরেভিচের স্বরটি দেখিয়েছিলাম যে, আপনি কাউকে বলবেন না।

এলিজাবেথা মিথাইলোভনা, আমি সত্যিই দুঃখিত, হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ওঁকে আপনি খানিকটা হক্‌চকিয়ে দিয়েছেন। উনি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না।

এলিজাবেথা, কি করব বল, আমার ছেলেবেলা থেকেই জার্মানদের আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। ওকে দেখলেই কি জানি কেন খোঁচা দিতে ইচ্ছে হয়।

ভ্লাদিমির নিকোলাই, আপনি কেমন করে একথা বললেন! এই জার্মান ভদ্রলোকটি গরীব, সঙ্গীহীন··· একেবারে ভাঙাচোরা মানুষ···ওর জন্যে আপনার কি দুঃখ হয় না ? ওঁকে খোঁচাতে আপনার ভাল লাগে ? পানসীন লজ্জিত হোলো।

তুমি ঠিকই বলেছ এলিজাবেথা, এ আমার এক চিরন্তন খেয়াল···একে বুদ্ধির ভুলও বলতে পার। না, না, ভৎর্সনা কোরো না, আমি নিজেকে জানি। আমার এই অপরিণামদর্শিতায় নিজের কম ক্ষতি হয় নি। লোকে যে বলে আমি আত্মসর্বস্ব মানুষ, এতে আমি তাদের ধন্যবাদই দিই।

পানসীন থামলো। যে কোনো বিষয় নিয়েই ও কথা বলুক না, নিজের কথা দিয়েই তা শেষ করবে—আর তা করবে অতি সুন্দরভাবে···একটুও ভান থাকবে না—থাকবে সহৃদয়তার আমেজ। এ যেন নিজের অজান্তেই সে বলে যায়।

সে বলতে লাগলো, তোমার নিজের বাড়ির কথাই ধর না। তোমার মা আমার উপর সদয়ই আছেন। তিনি লোকও চমৎকার, আর তুমি··· হাঁ, আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা জানি না আর তোমার দিদিমার কথা যদি ধর; তিনি তো আমাকে একেবারে সহ্য করতেই পারেন না। আজই হয় তো অনেক বাজে কথা বলে তাঁকে চটিয়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে একেবারে দেখতে পারেন না···তাই না?

লিজা একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বললে, না, আপনাকে উনি পছন্দ করেন না। পানসীন পিয়ানোর ঘাটের উপর আঙুল বুলিয়ে চলেছে। ঠোঁটে তার বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি।

সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ব্যাপার কি? তুমিও কি আমাকে আত্মসর্বস্ব বলে মনে কর?

লিজা উত্তর দিলে, আপনাকে আমি কতটুকুই বা চিনি। তবে একথা বলতে পারি, আপনাকে আমার আত্মসর্বস্ব মানুষ বলে মনে হয় না। বরং আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকাই তো উচিত ···

পানসীন ঘাটের উপর আঙুল বুলাতে বুলাতে বললে, তুমি কি বলবে তা আমি জানি। তোমাকে যেসব সুর বা বই আমি এনে দিয়েছি, তোমার ছবির য়্যালবাম যেসব বাজে রেখাচিত্রে ভর্তি করে দিয়েছি—এই

সবের জন্যে তো? ওসব করেও তো আমি আত্মসর্বস্ব হতে পারি। আশা করি, আমার সঙ্গ তোমার বিরক্তিকর লাগে না, তুমি আমাকে খারাপ বলেও মনে করনা, কিন্তু তবু তো তোমার মনে হয়, বাপ বা বন্ধু কাউকেই আমি বিদ্রূপ করতে ছাড়ি না।

লিজা মন্তব্য করলে, আর সব সামাজিক জীবের মতোই আপনি আত্মবিস্মৃত আর অমনোযোগী··· এর চেয়ে বেশি আর আমার বলবার নেই।

পানসীন ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকালে।

সে বললে, দেখ এ বিষয়ে আর কথা না বলাই ভাল, তার চেয়ে এস সুরটাই বাজানো যাক। তারপর ষ্ট্যাণ্ডের উপরে দাঁড়-করানো স্বরলিপির পাতাগুলি হাত দিয়ে ঠিক করে দিতে দিতে বললে, আমাকে তুমি যা খুশি বলো, আমি আত্মসর্বস্ব খেতাবও মেনে নিতে রাজি···কিন্তু আমাকে সমাজের জীব বলো না···ও খেতাব আমি ঘৃণা করি। আমিও একজন শিল্পী—অবশ্য নগণ্য হতে পারি—আর নগণ্যতার প্রমাণ তো আমি এখুনি তোমাকে দেব। এস, এবার শুরু করা যাক।

হ্যাঁ আসুন, লিজা বললে।

মুখপাতের বাজনাটুকু ভালই উত্‌রে গেল, তবু বারবার ভুল করলে পানসীন। তার নিজের রচনা আর জানা সুর সে ভালই বাজায়, কিন্তু দেখে বাজাতে গেলেই সব খারাপ হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তবকে দ্রুত লয়ের এলেগ্রোখানা খুব খারাপই হল, তারপর বিশ ঘাটে গিয়ে সে ছেড়ে দিলে। এবার সে হেসে উঠলো।

না, কিছুই হোলো না! আজ বাজনায় মনই বসছে না। ভাগ্য ভালো, লেম শুনতে পাননি, উনি তো তাহলে মূর্চ্ছাই যেতেন।

লিজা উঠে পিয়ানো বন্ধ করে পানসীনের দিকে ফিরে তাকালে। সে জিজ্ঞেস করলে, এবার কি করব?

ঠিক তোমার যোগ্য কথাই বটে, একমুহূর্ত তুমি কুঁড়ে হয়ে বসে থাকতে চাওনা। বেশ তো, ইচ্ছে হলে এস আলো থাকতে থাকতে ক'খানা রেখাচিত্র আঁকা যাক। হয় তো কলাদেবী···কি বল তোমরা তাঁকে? আমি তো মনে করতে পারছি না···হয় তো তিনি আমার উপরে খানিকটা প্রসন্নই হবেন। কোথায়, তোমার য়্যালবাম···কোথায়? আমার দৃশ্যচিত্রখানা বোধ হয় শেষ হয় নি···

লিজা পাশের ঘরে য়্যালবামখানা আনতে গেল। পানসীন তার পকেট থেকে একখানা ক্যাম্ব্রিকের রুমাল বার করে নখগুলি ঘসে ঘসে মুছলে, তারপর চোখ কুঁচকে ভাল করে নজর দিলে হাতখানার উপর। সাদা, সুন্দর হাত, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে একটি সোনার আঙটি, সোনার তার জড়িয়ে জড়িয়ে তৈরী। লিজা ফিরে এল। পানসীন জানালার ধারে গিয়ে য়্যালবামখানা খুলে বসলো।

ওঃ! তাহলে তুমি দৃশ্যচিত্রখানার নকল শুরু করে দিয়েছ! বাঃ চমৎকার হয়েছে! শুধু এইখানটায়···দেখি, পেনসিলটা দাও তো···ছায়া এখনো ঘন হয় নি। এই যে দেখ!

পানসীন কতগুলি দীর্ঘ রেখা টেনে গেল। এই একই দৃশ্য সে জীবন-ভোর আঁকছে···সামনে গাছের সার, পটভূমিতে একফালি প্রান্তর। আঁকা বাঁকা পাহাড়ের সার দিগন্তে মিশেছে। লিজা তার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো।

পানসীন একবার বাঁ দিকে, আর একবার ডান দিকে মাথা হেলিয়ে মন্তব্য করলে, দেখ ছবি আঁকায় আর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য আর সাহস।

এমন সময়ে লেম ঘরে ঢুকলেন, নুয়ে অভিবাদন করে তিনি চলে যাচ্ছিলেন; কিন্তু পানসীন য়্যালবাম আর পেনসিল ফেলে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

ক্রিস্টোফার ফিওদরেভিচ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? চা-পর্ব পর্যন্ত থাকবেন না?

লেম গম্ভীর স্বরে বললেন, বাড়ি যাচ্ছি, মাথা ধরেছে।

আরে, বসুন! বসুন…আসুন, শেকস্‌পীয়ার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বৃদ্ধ আবার বললেন, আমার মাথা ধরেছে।

আপনাকে ছাড়াই আমরা বেঠোফনের এক গীতিকা সুরু করেছিলাম। সে সস্নেহে লেমকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি হেসে বললে, কিন্তু এগোতেই পারছি না। আপনি বিশ্বাস করুন, পর পর দুটি স্তবক ঠিকমতো বাজাতে পারলাম না।

পানসীনের হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে লেম খোঁচা দিলেন, আপনার নিজের লেখা গানটা বাজালেই ভাল করতেন। এবার তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। লিজা তার পেছনে পেছনে ছুটলো। গাড়ি বারান্দায় এসে সে তাঁকে ধরলে।

সে উঠানের সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে ফটকের দিকে যেতে যেতে জার্মান ভাষায় বললে, ক্রিস্টোফার ফিওদরেভিচ, শুনুন, আপনি আমার উপর রাগ করেছেন…আমাকে ক্ষমা করুন।

লেম নীরব…

আমি ভ্লাদিমির নিকোলাইকে আপনার সুরটি দেখিয়েছিলাম। আমি জানতাম তিনি তারিফই করবেন—আর ওঁর তো খুবই ভাল লেগেছে।

লেম থামলেন…

তিনি রুশ ভাষায় বললেন, বেশ তো! তারপর নিজের ভাষায়, উনি তো কিছুই বোঝেন না…তা তুমি লক্ষ্য কর নি? চপল বিলাসী, …তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

লিজা উত্তর দিলে, আপনি ওঁর উপর অবিচার করছেন। উনি সব কিছু বোঝেন, আর নিজে সব কিছু করতে পারেন।

হাঁ! তা পারেন; তবে তা পয়লা নম্বরের নয়। হালকা গৎ—সস্তা সুরের দিকেই ওঁর ঝোঁক। লোকে এই সবই পছন্দ করে, আর ওঁকে ভালও বাসে। আর এতেই উনি খুশি···আমি রাগ করিনি; আমার ঐ সুর আর আমি···দুটিই পুরানো জিনিষ···আমি নিজেই তার জন্যে লজ্জিত। থাক ওসব কথা—

লিজা আবার অস্ফুট স্বরে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন ক্রিস্টোফার ফিওদরেভিচ। তিনি রুশ ভাষায় আবার বললেন, ঠিক আছে। তুমি বড় ভাল মেয়ে···ঐ কে যেন আসছে, আমি যাই। তুমি চমৎকার মেয়ে! লেম ফটকের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। এবার ফটক দিয়ে ঢুকলেন একজন অপরিচিত মানুষ—ধূসর কোট আর টুপী-পরা এক ভদ্রলোক। তিনি তাকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লেম অজানা অচেনা মানুষদের অভিবাদন জানান কিন্তু পরিচিতদের সঙ্গে পথে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। এই তাঁর রীতি। বেড়ার বাইরে আর তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। অপরিচিত মানুষটি তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন, তারপর লিজাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন।

সাত

টুপী খুলে তিনি বললেন, তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমি চিনেছি, আট বছর আগে দেখেছিলাম তবুও চিনতে কষ্ট হয় নি। তুমি তো তখন একফোঁটা মেয়ে। আমি লাভ্রেৎস্কী। তোমার মা বাড়ি আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি?

লিজা বললে: মা আপনাকে পেলে খুবই খুসি হবেন, আপনি যে এখানে এসেছেন, সেকথা তিনি জানেন।

বারান্দার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে লাভ্রেৎস্কী বললেন, তোমার নাম বোধ হয় এলিজাবেথা—তাই না ?

হাঁ।

তোমাকে আমার খুব মনে আছে। তখনো তোমার মুখখানা এমন ছিল যে, দেখলে সহজে ভোলা যেত না। আমি তোমাকে কত মেঠাই এনে দিতাম।

লিজা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কি অদ্ভুত মানুষ দেখ দেখি ! লাভ্রেৎস্কী হল ঘরে এসে এক মুহূর্ত থামলেন। লিজা চলে গেল বসবার ঘরে। সেখান থেকে ভেসে আসছে পানসীনের কথা আর হাসি। বাগান থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেছেন মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না আর গিদোয়েনোভ্স্কী। তাঁদের কাছে সে শহরের এক গুজবের কথা বলছিল, আর নিজের গল্পে নিজেই বারবার জোরে হেসে উঠছিল। লাভ্রেৎস্কীর নাম শুনে মারিয়া বিব্রত হয়ে পড়লেন, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি এগিয়ে গেলেন তাকে অভ্যর্থনা করতে।

কেমন আছ ভাই ? তার স্বর মৃদু, অশ্রুরুদ্ধ। তোমাকে দেখে কি যে খুশি হলাম।

লাভ্রেৎস্কী তাঁর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, তুমি কেমন আছ, ভগবান তোমাকে ভাল রেখেছেন তো ?

বোসো, বোসো আমি কি যে খুশি হয়েছি, কি বলব ! এস, প্রথমে আমার মেয়ে লিজার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই···

লাভ্রেৎস্কী বাধা দিয়ে বললেন, আগেই এলিজাবেথার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

ইনি মঁ্যসিয়ে পানসীন···ইনি সার্জি পেত্রভিচ গিদোয়েনোভ্স্কী··· আরে বোসো···বোসো···তাহলে এলে ! আমি তো আমার চোখদুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছি না ! তারপর···কেমন আছ ?

দেখছ, ভালই আছি। আর তুমিও ভালই আছ…হাঁ…একথা হলফ করে বলছি। আট বছরে একটুও বদলাওনি।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না'র স্বর বিষণ্ণ…হাঁ…বহু দিনপরে আবার দেখা হোল। তারপর কোথা থেকে আসছ? আমি বলি কি, কোথায় উঠলে? তুমি কি কিছুদিন এখানে আছ?

লাভ্রেৎস্কী উত্তর দিলে; এখন তো বার্লিন থেকে আসছি। কাল যাব জমিদারীতে…হয়তো বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।

নিশ্চয়ই লাভ্রেকীতেই থাকবে?

না, লাভ্রেকীতে নয়, এখান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে আমার একখানা ছোট্ট গ্রাম আছে, সেখানেই যাব ঠিক করেছি।

যেখানা গ্লাফিরা পেত্রভনার ওয়ারিশ হিসাবে পেয়েছ?

হাঁ, সেইখানেই।

কিন্তু ফিওদর ইভানিচ, তোমার লাভ্রেকীর বাড়িখানাও তো চমৎকার।

লাভ্রেৎস্কী ভ্রূ কোঁচকালেন।

হাঁ…তা বটে…কিন্তু ঐ গাঁয়ের বাড়িখানা ছোট্ট, আর তাতেই আমার চলে যাবে। এখন ওর চেয়ে বড় বাড়ির আমার দরকার নেই।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বিব্রত হয়ে পড়লেন। চেয়ারে যেন তিনি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন, হতাশ হয়েছেন তিনি। পানসীন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল, লাভ্রেৎস্কীর সঙ্গে আলাপ শুরু হোলো। মারিয়া ইতিমধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে, চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলছেন, দরদী-দৃষ্টি তাঁর অতিথির উপর, কখনো বা জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন, এমনভাবে মাথা নাড়ছেন যে অতিথির ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তার শরীর সুস্থ আছে তো?

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না উত্তর দিলেন : হাঁ…ভগবানের ইচ্ছায় ভালই আছি। ওকথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?

এমনিই…মনে হোল, তোমার শরীর বুঝি ভাল নেই।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না এমন ভাব দেখালেন, যেন তাঁর সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তারপর মনে মনে ভাবলেন, যদি খারাপই হয় তাতেই বা কি করব। না…আর উদ্বিগ্ন হব না বাপু, তোমার কাছে ব্যাপারটা হাঁসের পিঠে জলের মতোই সোজা ব্যাপার। অন্য কেউ হলে তো এতদিনে শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে যেত, আর তুমি কিনা স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ছ ! মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না এবার বেশ গম্ভীর মার্জিতভাবেই কথাটা ব্যক্ত করলেন।

লাভ্রেৎস্কীকে দেখে কেউ বলবে না তিনি ভাগ্যের শীকার। তার রক্তাভ রুশ-সুলভ মুখখানা…সাদা ঘন ভ্রূ…একটু মাংসল নাক…বিস্তৃত সুপষ্ট অধর আর ওষ্ঠ…যেন তা দিয়ে জীবনীশক্তি চুইয়ে পড়ছে। এ জীবনীশক্তি তার নিবাস স্তেপভূমিরই দান। তার দেহ দৃঢ়, সুন্দর চুল শিশুর মতোই গুচ্ছে গুচ্ছে মাথায় ছেয়ে আছে। তার চোখ দুটো শুধু নীল আর নিস্পন্দ…যেন এক বিষণ্ণতা সেখানে ছেয়ে আছে…না, তাকে ক্লান্তি বলব ? আর তার স্বর যেন একটু বেশি মসৃন। এরই মধ্যে ঝিমিয়ে-আসা আলাপের খেঁই ধরে রেখেছে পানসীন। চিনি বিশুদ্ধ করবার গুণ কি তাই নিয়ে সে বলছে। খাদ্য সম্বন্ধে সে সবে দুখানা ফরাসী পুস্তিকায় পড়েছে একথা, আর তাই নিতান্ত বিনয়ে সে বলে যাচ্ছে, পুস্তিকা দুখানির নামও উল্লেখ কর্চ্ছে না।

আধাভেজানো পাশের ঘরে যাওয়ায় দরজা দিয়ে ভেসে এল হঠাৎ মারফা দিমোফিয়েভ্নার স্বর…আরে, ফিদিয়া না ? হাঁ…সে না হয়েই যায় না ! বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকলেন। লাভ্রেৎস্কী ওঠবারও সময় পেলেন না, বৃদ্ধা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর এক পা পেছিয়ে গিয়ে

বললেন, তোমাকে একবার দেখি! তাইত, স্বাস্থ্য তো ঠিকই আছে। একটু বুড়োটে হয়েছো, তাতে এমন কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। না, না, হাতে নয়, এস, গালে চুমু খাও, অবশ্য যদি আমার তোবড়ান গাল তোমার পছন্দ হয়! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা একবারও বলনি···পিসী আছে কি নেই—সেকথা তোমার মনেই পড়ে নি! আরে পাজি, আমার কাছেই যে মানুষ হলি! যাক্‌গে বাছা, আর কি জন্যেই বা আমার কথা মনে পড়বে? কিন্তু এসে ভালই করেছ। এই···শুনছো, মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকে কিছু খেতে দাও নি?

লাভ্রেৎস্‌কী তাড়াতাড়ি বললেন: না, দরকার নেই।

বাছা, আর কিছু না খাও, এক পেয়ালা চা তো খাবে। হা ভগবান, কোন দেশ থেকে এল বাছা, এক পেয়ালা চাও তাকে দেওয়া হয় নি! লিজা, যাও তাড়াতাড়ি যাতে চা হয় তা দেখ। আমার মনে হচ্ছে, ছেলেবেলায় ও ছিল ভয়ানক পেটুক, এখনো যদি তেমনি থেকে থাকে তো অবাক হবো না বাছা।

পানসীন উত্তেজিত বৃদ্ধার কাছে গিয়ে অভিবাদন করে বললে, নমস্কার মারফা দিমোফিয়েভ্‌না।

মারফা জবাব দিলেন: মাপ করবেন মশাই, এত ব্যাপারের ভিতরে আপনাকে দেখতেই পাই নি। লাভ্রেৎস্‌কীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন, তোমাকে বাছা ঠিক তোমার মার মতো দেখাচ্ছে, তবে নাকটা তাঁর মত হয় নি, বাপের মতো নাক পেয়েছ আর একটুও তা বদলায় নি। তা বাছা, আছ তো কিছুদিন?

পিসী কালই চলে যাব।

কোথায়?

ভ্যাসিলিয়েভস্কয়ে—আমার জমিদারীতে···

কালই?

হাঁ, কালই।

বেশ তো, তাই-ই যেও বাছা। ভগবান তোমার ভাল করুন। যা ভাল বোঝ তাই কর। কিন্তু যাবার আগে একবার এসে দেখা করে যেও। বৃদ্ধা তার গাল আদর করে চাপড়ে দিলেন ; আর হয়তো দেখাই হবে না ; না···না···মরব না বাছা, আরো দশটি বছর টিকে থাকবো বলে তো মনে হয়। আমরা পেস্তোভরা দীর্ঘজীবীর বংশ। তোমার ঠাকুরর্দা বলতেন, আমাদের দু-দুটো জীবন আছে, কিন্তু কতদিন যে বিদেশে ঘুরঘুর করে কাটাবে কে জানে। তোমাকে দেখে বেশ খুশি হলাম। এখনো কি তুমি আগের মতো দশ পুড (ওজন—১৮ সের) ভারী জিনিস এক হাতে তুলতে পার। তোমার বাপ ছিল অদ্ভুত মানুষ···না বাপু আমার কথায় রাগ করো না। যাহোক সুইজারল্যাণ্ডের ঐ লোকটাকে তোমার শিক্ষার জন্য বহাল করে ভালই করেছিল। তোমার মনে আছে···সেই যে দুজনে ঘুষি লড়তে—ব্যায়াম না কি করতে ? দেখ দিকি, এখানে আমি বকবক করে মিঃ পানসীনের আলোচনায় বাধা দিচ্ছি (মারফা পানসীন বলে কখনো ডাকেন না, অথচ তাই তো ডাকা উচিত) এস···এস···চা খাও। তার চেয়ে চল বাছা, ছাদে গিয়ে চা খাওয়া যাক। লণ্ডন আর প্যারীতে যেমন খাও, তেমন সব নয়···এ ভারি চমৎকার জিনিস। এস··· এস···দাও তোমার হাতখানা দাও। উঃ ! কি মোটাসোটা হাড় !

সবাই উঠে ছাদে এল, গিদোয়েনোভস্কী শুধু সকলের অলক্ষ্যে চলে গেলেন। লাভ্রেৎস্‌কী যখন বাড়ীর কর্ত্রী, পানসীন আর মারফা দিমোফিয়েভনার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি তখন এক কোণে বসেছিলেন। বাল-সুলভ কৌতূহলে তার তখন মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চোখ মিটমিট করছে। এবার তিনি আগন্তুকের আসার খবর শহরে ছড়াতে ছুটলেন।

ঠিক সেইদিন রাত এগারোটায় মাদাম কালিতিনার বাড়ীতে আর এক ঘটনা ঘটে গেল। নীচে বসবার ঘরে ঢোকার মুখে ভ্লাদিমির

নিকোলাই সুযোগ বুঝে লিজার কাছে বিদায় নেবার সময় তার দুহাত ধরে বললে :

তুমি তো জানো লিজা, আমি কেন এখানে আসি···কেন আমাকে এখানে অহরহ দেখা যায় ; আর বলে কি হবে ; সব কিছুই তো জানা··· তাই না ? লিজা নীরব, তার মুখে হাসি নেই। তার ভ্রূ একটু উপরে তোলা, মুখে লজ্জার রক্তিমাভা, সে চেয়ে আছে মেঝের দিকে। হাত সে সরিয়ে নিলে না।

আর উপরের তলায় মারফা দিমোফিয়েভনার ঘরে আইকনের সুমুখের তেলের প্রদীপের ম্লান আলোয় চেয়ারে বসে ছিল লাভ্রেৎস্‌কী। হাঁটুর উপরে কনুই, মুখ হাতে ঢাকা। বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন তার সুমুখে, চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। একঘণ্টা হয়ে গেছে তারা গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছেন এই ঘরে। দরদী এই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা তার তেমন হয় নি, আর তিনিও তাকে প্রশ্ন করেন নি···কি আর আছেই বা বলবার, প্রশ্ন করবারই বা কি আছে! তিনি তো সবই জানেন, তাই তাকে সস্নেহ সহানুভূতিতে অভিষিক্ত করে দিচ্ছেন। লাভ্রেৎস্‌কী তার কানায় কানায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে এমন সহানুভূতির প্রয়োজন তো আগে বোঝে নি।

আট

ফিওদর ইভানিচ লাভ্রেৎস্‌কীর (আমরা পাঠকে কাছে আবদার ধরে গল্পের সূত্র কিছুক্ষণের জন্য ছিঁড়ে ফেলছি) সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। তাঁর পূর্ব পুরুষ এসেছিলেন প্রুসিয়া থেকে ভাসিলি তিয়োমির সময়ে, আর তিনি দুশো চেৎভের্স্ট জমি পেয়েছিলেন বিলেৎস ভার্ক এলাকায়। তাঁর বংশধরেরা সুদূর প্রদেশগুলিতে প্রিন্স আর অভিজাতদের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; কিন্তু কেউই খুব উঁচু পদ পান নি, সম্পদও তাদের

যথেষ্ট ছিল না। লাভ্রেৎস্কীদের মধ্যে ফিওদর ইভানিচের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ সবচেয়ে বেশি টাকা রোজগার করেছিলেন। আর খানিকটা নামডাকও তাঁর ছিল,—তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, উদ্ধত, কঠোর আর কৌশলী। আজ পর্যন্ত তাঁর নিষ্ঠুরতা আর অপযশের কাহিনী স্মরণীয় হয়ে আছে, আর আছে তার উচ্ছৃঙ্খলতা, অদ্ভুত আড়ম্বর আর অতৃপ্ত অর্থলিপ্সার কথা। তিনি যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি ছিলেন লম্বা, রং তাঁর তামাটে, মুখে দাড়ি ছিল না। বাচনভঙ্গীতে ছিল আড়ষ্টতা, আর মুখে কেমন এক ঘুমন্ত ভাব। তার স্বর যখন মৃদু হয়ে আসতো, আশে পাশের সবাই ভয়ে শিউরিয়ে উঠত। তিনি যাকে স্ত্রী হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তারই যোগ্যা। তার বড় বড় চোখ, খাড়া নাক, মুখখানা গোলগাল। বেদের জাতের মেয়ে তিনি, ভারি মুখরা আর জেদী, কখনো স্বামীর কাছে হার স্বীকার করেন নি। স্বামী ছিলেন তার জীবনের এক আপদ, কিন্তু তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি টিকে রইলেন না। কুকুর বেড়ালের জীবন তারা কাটাতেন। আন্দ্রেইর ছেলে পিতর—ফিওদরের পিতামহ। বাপের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। তিনি ছিলেন স্তেপ অঞ্চলের মামুলি এক জমিদার, একটু বা মাথা পাগলা আর হামবড়া তার স্বভাব। চরিত্র তার ছিল শিথিল, আর ব্যবহার অভদ্র, কিন্তু খারাপ লোক তিনি ছিলেন না। অতিথিবৎসল ছিলেন তিনি, আর শিকারী কুকুর নিয়ে শিকারে যেতেও থাকতেন। যখন তিরিশ বছর তার পার হয়ে গেছে, তখন তিনি এমন এক জমিদারির মালিকানা-স্বত্ব পেলেন, যেখানে দুহাজার দাস আছে--আর অটুট যার বিলি-ব্যবস্থা। কিন্তু শীগ্‌গীরই তিনি সব তছনছ করে দিলেন, জমিদারীর খানিকটা অংশ বিক্রি করলেন, দাসদের হারালেন। যত নীচুদরের লোক এসে আরশুলার মতোই জড়ো হল তার প্রশস্ত আরামের আশ্রয়ে—চেনা অচেনার সেখানে বালাই নেই। এরা যা পারলো খেল, পান করে মাতাল হল, চুরি করলো আর বদান্য গৃহস্বামীর প্রশংসায় আর আশীর্বাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

আর গৃহস্বামীর যখন অবসাদ আসতো, তিনি অতিথিদের বদমায়েস, সাপ ব্যাঙ-খেকো বলতেও কসুর করতেন না, কিন্তু তাদের সঙ্গ ছাড়া তার জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠতো। পিতর আন্দ্রেইয়ের স্ত্রী ছিলেন নম্র, ভদ্র। তার বাবার পছন্দে আর হুকুমে প্রতিবেশী এক পরিবারে তিনি বিয়ে করেন। নাম তার আনা পাবলোভ্‌না। তিনি কোনো কিছুতেই স্বামীকে বাধা দিতেন না। গৃহিনী হিসাবে তিনি ছিলেন হাস্যমুখী, নিজেও সামাজিক ভোজে যেতেন, কিন্তু অতিরিক্ত পাউডারে তার ছিল বিতৃষ্ণা। বৃদ্ধা তার যৌবন-কালের গল্প প্রায়ই করতেন—ওরা একটা ফেল্ট কাপড়ের টুপী পরিয়ে দিত মাথায়, চুল আঁচড়ে দিত, তাতে মাখাত তেল, তারপর চুলে ময়দা ছিটিয়ে দিত, সারা চুলে গুঁজতো লোহার কাঁটা—কিছুতেই আর চুলের সে কেয়ারি ভেঙে যাবে না। কিন্তু বাছা, মুখে পাউডার না মেখে কোথাও যাওয়া তো যেত না—সাহসই হোত না। আর লোকে সেটা নিজেদের অপমান বলেই ভাবতো। ভাবতো কি অত্যাচার! তিনি জোর কদমে-ছোটা প্রতিযোগিতার ঘোড়ার পিছনে নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ভালবাসতেন; দুপুর থেকে রাত অবধি তাস খেলতেও তিনি ছিলেন প্রস্তুত। তার স্বামী তাসের টেবিলে এসে হাজির হলেই তিনি তার জিতের পয়সা-কড়ি লুকিয়ে ফেলতেন; কিন্তু এদিকে তার পিতৃদত্ত যৌতুকের সমস্ত টাকা তিনি স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দুটি সন্তান তার হয়, একটি ছেলে, তিনি ফিওদরের বাবা ইভান, আর একটি মেয়ে, নাম তার গ্লাফিরা। ইভান বাড়িতে লালিতপালিত হন নি, তার বুড়ী পিসীমা রাজকুমারী কুবেন্সকায়া ছিলেন ধনী, তিনি তাকে নিজের ওয়ারিশ করে যান (তা ছাড়া তার বাবা তাকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতেন না)। পুতুলের মতো তিনি তাকে সাজাতেন, তার জন্যে সব বিষয়ের শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন। একজন ফরাসী শিক্ষকের উপর ছিল তার সব ভার—তিনি আগে ছিলেন এক মঠে। এই শিক্ষকটি জাঁ-জাঁকস্ রুশোর শিষ্য, নাম তাঁর কোর্তেঁ দ্য ভসেলে···অতি চতুর আর কৌশলী তিনি···

রাজকুমারীর ভাষায় বিদেশীদের ভিতরে সেরা। তাই তিনি এই সেরা লোকটিকে সত্তর বছর বয়সে বিয়ে করে ফেললেন, সমস্ত সম্পত্তি তার নামে লিখে দিলেন। কিছুদিন পরেই মুখে রং মেখে, আ-লা রিসলু সুগন্ধি সারা গায়ে ছড়িয়ে, নিগ্রো বালক-ভৃত্য, কুকুর ছানা আর মুখর ময়না পরিবৃত হয়ে তিনি পঞ্চদশ লুইর আমলের রেশমের গদি আঁটা ডিভানে শুয়ে মারা গেলেন, তখনো তার হাতে এনামেলের খুদে এক নস্যদানি। স্বামী পরিত্যক্ত হয়েই তার মৃত্যু হল—কারণ, বাক্‌পটু কোতে তখন তার টাকাকড়ি নিয়ে প্যারীতে উধাও হওয়াই সমীচীন মনে করেছেন। ইভানের যখন বিশ বছর বয়েস, তখন এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা (আমরা রাজকুমারীর মৃত্যুর কথা বলছি না, তার বিবাহের কথাই বলছি) ঘটলো তার জীবনে। পিসীর বাড়ীতে বসবাস করতে তার ঘৃণা হোল, সেখানে তার অবস্থারও তখন বৈষম্য ঘটেছে···ধনী উত্তরাধিকারী থেকে তিনি হঠাৎ পোষ্য-গোষ্ঠির ভিতরে গিয়ে পড়েছেন। তখন যে সমাজে তার জন্ম, সেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সমাজের দ্বার রুদ্ধ; সরকারী নগণ্য চাকুরীর প্রতি তার দারুণ বিতৃষ্ণা (তখন সম্রাট আলেকজান্দারের রাজত্বের প্রথম ভাগ চলছে); তিনি আর কি করবেন, গ্রামে নিজের পিতৃপুরুষের বাড়ীতে ফিরে এলেন। তার পুরানো দিনের বাড়ী তার কাছে তখন নোংরা, কুশ্রী, দারিদ্র্যে ছন্নছাড়া। বাগিচার দৈন্য আর ছন্নছাড়াভাব যেন প্রতি পদে তাকে আঘাত করতে লাগলো। তিনি তখন একঘেয়েমিতে হাঁফিয়ে উঠেছেন; আর এক দিকে তার মা ছাড়া সবাই তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। বাবা তার নাগরিক চাল-চলন পছন্দ করতে পারছেন না; তার ফ্রক-কোট, বই, বাঁশী, খুঁতখুঁতে স্বভাব—সব কিছু মিলিয়ে একটা অবজ্ঞা ফুটে উঠছে। তিনি ছেলের এই চালচলন দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ জানালেন। তিনি বলতে লাগলেন, ও এখানকার সবকিছু দেখেই নাক সেঁটকায়; এখানকার খাবার ওর মুখে রোচে না; মানুষের

গায়ের গন্ধে ও অতিষ্ঠ, বদ্ধ হাওয়া ওর ভাল লাগে না, মাতলামো করলে ওর স্নায়ুতে চোট লাগে। আর ওর সামনে একটা প্রজাকে কে শাস্তি দেবে বল! সরকারী চাকরীতে ঢোকবার ওর মর্জি নেই। স্বাস্থ্যও খারাপ—একেবারে মেয়েমানুষ যাকে বলে! আর এ সবের কারণ, ওর মাথা ভোলতেরের ভাবধারায় ঠাসা। বৃদ্ধের ভোলতের আর কাফের দ্যিদেরোর উপর ছিল বিশেষ বিদ্বেষ, যদিও তিনি তাঁদের রচনার একটি অক্ষরও কখনো পড়েন নি। পড়াশুনার বালাই তার ছিল না। পিতর আন্দ্রেই কিন্তু তবু ভুল ধারণা করেন নি। দ্যিদেরো, ভোলতেয়ার, রুশো, রেনাল, হেলভিসিয়াস আর ঐ গোষ্ঠির লোকদের ভাবধারায় তার ছেলের মাথা তখন ভর্তি; কিন্তু এসব ছিল শুধু মগজেই, বাইরে প্রকাশ দেখা যায় নি। ইভান পেত্রভিচের ভূতপূর্ব শিক্ষক সেই অবসরপ্রাপ্ত পাদ্রি আর জ্ঞানী ব্যক্তিটি তাঁর ছাত্রের মগজে আঠারো শতকের সমস্ত জ্ঞান পুরে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন নি, আর তিনি মগজে সেই বিদ্যে নিয়ে হাঁসফাঁস করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু সে জ্ঞান তার রক্ত-কণিকায় প্রবেশের অধিকার পায় নি, অধিকার পায় নি সত্তায় প্রবেশের, তাই দৃঢ় প্রত্যয়ে তার প্রকাশও হয় নি।···পঞ্চাশ বছর আগেকার যুবকদের কাছ থেকে কে দৃঢ় প্রত্যয় আশা করতে পারে! আজও তো সে প্রত্যয় আমাদের আসে নি। তার বাবার অতিথিরাও ইভান পেত্রভিচের সুমুখে বিব্রত হয়ে পড়তেন; তিনি তাদের এড়িয়ে চলতেন, আর তারা করতেন তাকে ভয়। তার বোন গ্লাফিরা তার চেয়ে বারো বছরের বড়, তার সঙ্গেও তার বনিবনা হল না। গ্লাফিরা এক অদ্ভুত জীব; কুৎসিত ··পিঠে তার কুঁজ, গাঁট্টাগোট্টা, ভয়ংকর আর টলটলে দুই চোখ, পাতলা চাপা ঠোঁট। চেহারায়, স্বরে একপেশে দেহের ভঙ্গিতে তার ঠাকুরমা সেই বেদেনীকেই মনে পড়িয়ে দেয়। যেমন সে বদমেজাজী, তেমন তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, বিয়ের কথা সে কখনো আমলই দেয় নি। ইভান পেত্রভিচের বাড়ী

আসাটাও তার পছন্দ হল না। রাজকুমারী কুবেন্সকায়া যতদিন তার ভার নিয়েছিলেন, গ্লাফিরার আশা ছিল, অন্তত সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবেই। সে তার ঠাকুরমার মতোই ছিল কৃপণ। তাছাড়া ভাইয়ের প্রতি টানও তার ছিল না, বরং ঈর্ষাই ছিল। সে সুশিক্ষিত, ভাল ফরাসী বলতে পারে খাঁটি প্যারীর উচ্চারণে ; আর সে 'বজুঁর' বা কাম ভু পোর্তেভু' ও ভাল করে বলতে পারে না। একথা সত্যি যে, তার বাবা মা একবারে ফরাসী ভাষায় অজ্ঞ কিন্তু তাতেও এ ক্ষোভ তার যাবার নয়।…ইভান পেত্রভিচের হাতে অফুরন্ত সময় আর যেন কাটে না। একঘেয়েমিতে তিনি হাঁফিয়ে উঠলেন। এক বছরেরও বেশি কেটে গেল গ্রামে, কিন্তু তার কাছে সে যেন দশ বছর বলেই মনে হোল। শুধু যার কাছেই তিনি তার মনের কথা বলতে পারতেন। তার নীচু ছাদওলা ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি শুনতেন তাঁর গল্প। সে গল্পে কলা-নৈপুণ্য নেই। তিনি গল্প শুনতেন আর মোরব্বা খেতেন। আনা পাভলোভনার দাসীদের ভিতরে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। নম্র তার দুটি চোখ ; সুকোমল তার দেহ। নাম তার মালানিয়া, চতুরা মেয়ে, কিন্তু চপলা নয়। তিনি তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন, ভালবেসেও ফেললেন। তার ভীরু হাবভাব তাঁর ভাল লাগলো, ভাল লাগলো তার সলজ্জ উত্তর, আর নম্র স্বর, বিনীত হাসি। দিনে দিনে তার ভালোবাসা গভীর হয়ে উঠলো, সেও ইভান পেত্রভিচের প্রতি আসক্ত হল। তার আত্মার শক্তি দিয়ে তাকে ভালবাসলো। এ ভালবাসা এক রুশ মেয়েতেই সম্ভব··সে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলে। গ্রাম্য জমিদারের পরিবারে একথা তো বেশিদিন গোপন থাকে না। শীগ্‌গিরই সবাই তরুণ প্রভুর মালানিয়ার সঙ্গে এই প্রেমের কথা জানতে পারলো। তারপর পিতর আন্দ্রেইয়ের কানে গিয়েও কথাটা পৌছলো। অন্য সময় হলে তিনি হয়তো তুচ্ছ ব্যাপারটা উড়িয়েই দিতেন কিন্তু ছেলের উপর তার আক্রোশ ছিল। তিনি এইবার

পিটার্স'বুর্গের এই সুশিক্ষিত বিলাসী ছেলেকে অপমান করবার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

সোরগোল পড়ে গেল। মালানিয়াকে পুরে রাখা হল ভাঙাচোরা জিনিস রাখার ঘরে। ইভান পেত্রভিচের ডাক পড়লো বাবার কাছে। আনা পাভলোভনাও এই সোরগোলে ছুটে এলেন। তিনি স্বামীকে শান্ত করতে গেলেন, কিন্তু পিতর আন্দ্রেইয়ের তখন যুক্তি শোনবার অবস্থা নেই। তিনি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাকে শিথিল নীতিবোধ, নাস্তিকতা, প্রতারণা—এমনি সব অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন, গালাগাল দিলেন, আর রাজকুমারী কুবেন্সকায়ার উপর যে রাগ এতদিন ধরে জমা ছিল, তাও উগরে দিলেন। অপমানের বর্ষাধারা নামলো। প্রথমে ইভান কিছুই বলেন নি, তিনি ছিলেন সংযত, কিন্তু বাবা যখন তাকে চরম অপমানকর শাস্তি দেবেন বলে শাসালেন, তিনি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি আপন মনে বললেন, আবার সেই কাফের ত্থিদেরোকে টেনে আনা হোল···বেশ তো, দেখি ত্থিদেরো কি করেন! আমি তোমাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়ব। তারপর শান্ত অবিচালিত স্বরে পেত্রভিচ তার বাবাকে জানালেন, তার দুর্নীতি অভিযোগ ঠিক নয়। তিনি নিজের অপরাধের সাফাই গাইতে চান না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি রাজী আছেন · তিনি সবরকম কুসংস্কারের ঊর্ধে বলেই নিজেকে মনে করেন·· সত্যই তিনি মালানিয়াকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। এই কথা ক'টা উচ্চারণে ইভান পেত্রভিচের স্বার্থসিদ্ধি হল। পিতর আন্দ্রেই এত চমকে গেলেন যে, তিনি একমুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে; পরমুহূর্তেই প্রকৃতিস্থ হলেন। তার গায়ে ছিল কাঠবেড়ালের চামড়ার কোট, পায়ে চটি জুতো, তিনি সেই পোষাকেই ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তারপর চড়-চাপড় চললো। বরাত ভালো যে, তার ছেলে সেদিন চুল কেটেছিল, গায়ে ছিল তার নতুন

ইংরেজী ধরণের ফ্রক কোট, পরণে হরিণের চামড়ার আঁটো ব্রিচেস আর উঁচু বুট জুতো। আনা পাভ্লোভনা জোরে চেঁচিয়ে উঠে হাতে মুখ ঢাকলেন। এদিকে তাঁর ছেলে বাড়ী থেকে ছুটে আঙিনায় বেরিয়ে এল, রান্নাঘরের পাশের বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে···পার্ক পেরিয়ে পথে এসে পড়লো। তারপর প্রাণপণে ছুটতে লাগলো। এবার আর বাপের ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল না পিছনে, শোনা গেল না তাঁর চীৎকার··· ওরে থাম্! থাম্! ওরে থাম্ বলছি···তোকে আমি বাপ হয়ে অভিশাপ দেব!

ইভান পেত্রভিচ প্রতিবেশী এক জমিদারের বাড়ীতে ঠাঁই পেলেন। এদিকে পিতর আন্দ্রেই ঘর্মাক্ত কলেবরে দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ফিরলেন বাড়ীতে। তখন তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তবুও হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি তখনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন, ছেলেকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। সে আর কিছুই পাবে না, তার বাক্সে বইগুলো পুড়িয়ে ফেলবার আর মালানিয়া মেয়েটাকে তখুনি দূরে এক গ্রামে পাঠিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। ভাল লোকের অভাব নেই। তারা গিয়ে ইভান পেত্রভিচকে সব কথা জানালে। তিনি তখন অপমানিত আর ক্রুদ্ধ, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। সেই রাতেই যে চাষীর গাড়ীতে মালানিয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেখানা আক্রমণ করে তাকে তিনি হরণ করলেন। আর তাকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন কাছের শহরে, সেখানে তাদের বিয়ে হল। একজন সহৃদয় প্রতিবেশী তাকে টাকা জোগালেন। তিনি নিজে অবসরপ্রাপ্ত নাবিক, দুঃসাহসিকতার প্রতি তার ছিল যথেষ্ট অনুরাগ। পরদিন ইভান পেত্রভিচ পিতর আন্দ্রেইকে একখানা কড়া অথচ ভদ্র চিঠি দিলেন, তারপর চলে গেলেন তার মাসতুতো ভাই দিমিত্রি পেস্তভের ওখানে, তিনি তার বোন মারফা দিমোফিয়েভ্নাকে নিয়ে সেখানে থাকতেন। আর তাকে তো আমাদের

পাঠক আগেই চেনেন। তিনি গিয়ে কি ঘটেছে তা বললেন, কাজের জন্য সেণ্ট পিটার্সবুর্গ যাবার ইচ্ছেও জানালেন। তারপর অনুনয় করে বললেন, অন্তত কিছু দিনের জন্য তাদের উপর তিনি তার স্ত্রীর দেখাশোনার ভার দিতে চান। 'স্ত্রী' এই কথাটা উচ্চারণ করে কেঁদে ফেললেন। নাগরিক শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, মতবাদও তার আছে, তবু তিনি নিম্নশ্রেণীর দাসের মতোই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন, মেঝেয় নিজের মাথা ঠুকলো। পেস্তভরা সহৃদয়, সহানুভূতিপ্রবণ, তার অনুরোধে তাঁরা স্বেচ্ছায় রাজি হলেন। তিন সপ্তাহ তাদের ওখানে রইল, তার তখনো গোপন আশা, বাবা একটা কিছু বলে পাঠাবেন। কিন্তু বাবার কাছ থেকে উত্তর এল না উত্তর আসাও সম্ভব ছিল না। ছেলের বিয়ের কথা শুনে পিতর আন্দ্রেই শয্যা নিয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করেও দিয়েছিলেন, কেউ যেন তাঁর কাছে ছেলের নামও·উচ্চারণ না করে। কিন্তু তার মা ধর্মযাজকের কাছ থেকে ধার করে পাঁচশো রুবল আর তার স্ত্রীর জন্যে একটি ছোট্ট আইকন উপহার পাঠালেন। চিঠি লেখার সাহস তাঁর ছিল না। তবু ইভান পেত্রভিচের কাছে একটি চাষীর মারফৎ খবর পাঠালেন যে, তার অতো আপসোস করবার দরকার নাই। চাষীটি দিনে ষাট ভের্স্ট হাঁটতে পারত, সে-ই খবর দিলে। তিনি এও জানালেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে, বাবা তাকে ক্ষমাও করবেন। তিনি নিজেও অন্য পুত্রবধূই চেয়েছিলেন, কিন্তু এই যখন স্পষ্টই ভগবানের ইচ্ছা, তিনি মালানিয়া সার্জিয়েভ্‌নাকে মাতৃহৃদয়ের ঐকান্তিক শুভ কামনা নিয়েই আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। এই খবর দেবার জন্যে সেই শীর্ণ চাষীটি পেল একটি রুবল বকশিশ। সে নতুন প্রভুপত্নীকে দেখতে চাইলে। এই চাষীটি মালানিয়ার ধর্মবাবা। সে তার হাতে চুমু খেয়ে চলে গেল।

এরই মধ্যে ইভান পেত্রভিচ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বেশ খুশি মনেই চলে গেলেন। ভবিষ্যৎ তখন অস্পষ্টতার অন্ধকারে ; হয় তো তার জন্যে অপেক্ষা

করছে দারিদ্র্য। কিন্তু বিরক্তিকর গ্রাম্য জীবনের এইখানেই শেষ হোল। তাছাড়া তিনি তার গুরুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন না। তিনি তাঁদের মতবাদ কাজে লাগালেন। রুশো, দিদেরোর মতবাদ জয়যুক্ত হল। কর্তব্য করা হয়েছে তারই সচেতনতায়, গর্ব আর আনন্দে তার বুক ভরে গেল। স্ত্রীর বিরহ তাকে খুব পীড়া দিলে না। বরং তার সঙ্গে এক ঘরে কাটাতে হলেই তিনি বিব্রত হয়ে পড়তেন। কর্তব্য তো করা হয়েছে, এখন অন্য দিকে মন দিতে হবে। তার সেণ্টপিটার্সবুর্গ সম্বন্ধে ভয় ছিল, তা স্বত্বেও ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন হল। প্রিন্স কুবেন্সকায়াকে তখন ম্যাসিয়ে কোর্তে ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি তখনো জীবিত। ভাইপোর প্রতি অবিচার করেছিলেন তারই ক্ষতিপূরণ তিনি করলেন। নিজের সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর দিলেন পাঁচ হাজার রুবল উপহার—বলতে গেলে এই ছিল তাঁর টাকার অবশিষ্ট অংশ—একটি লেপিক ঘড়ীও এর সঙ্গে উপহার দেওয়া হল, তাতে কিউপিডের নিশানের ভিতরে তার মনোগ্রাম খোদাই করা ছিল। তিন মাসও কাটেনি, এরই মধ্যে ইভান পেত্রভিচ লণ্ডনে রাশিয়ান মিশনে কাজ পেয়ে প্রথম জাহাজেই বন্দর ছেড়ে চললেন ইংলণ্ডে (তখন বাষ্পীয় জাহাজের কল্পনাও কেউ করে নি।) কয়েক মাস পরে তিনি পেস্তভের কাছ থেকে পেলেন এক চিঠি। তিনি ইভান পেত্রভিচকে অভিনন্দন জানিয়ে তার পুত্রসন্তানের জন্মের সংবাদ লিখেছেন। নবজাতক পোক্রোভাস্কায় গ্রামে ২০শে আগষ্ট, ১৮০৭ সালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। তার নামকরণ হয়েছে ফিওদর, সন্ত শহীদ ফিওদরের নামে। মালানিয়া তখন অসুস্থ, সে কয়েক ছত্র মাত্র লিখেছে। কিন্তু এই ক'টা ছত্রই ইভান পেত্রভিচকে অবাক করে দিলে। তিনি তো আর জানতেন না যে, মারফা দিমোফিয়েভ্না তার স্ত্রীকে এরই মধ্যে লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। ইভান পেত্রভিচ বেশিক্ষণ এই পিতৃত্বের গর্ব বোধ করবার

সময় পেলেন না। তখন তিনি এক স্বনামধন্য ফির্ণেস বা লেইসের (তখনো প্রাচীন নামের চলতি ছিল) প্রেমে পড়েছেন। সবে তিলসিতের সন্ধি শেষ হয়েছে, পৃথিবী তখন ঘুরছে ঘূর্ণিতে—আনন্দ কামনায় সে উন্মত্ত। তাঁর মাথাও এক সুন্দরীর কালো চোখের দৃষ্টিতে তখন ঘুরে গেল। তার টাকাকড়ি কম, তবু তাস খেলায় ছিল জোর বরাত। বহু লোকের সঙ্গে তখন তার পরিচয়, সব রকম আনন্দেই তিনি ডুবে গেলেন। এক কথায় পূর্ণ পাল তুলে তিনি চললেন আনন্দসাগরে।

নয়

তাঁর ছেলের বিয়েতে তিনি যে চটেছিলেন, বহুদিন তা বৃদ্ধের মনে রয়ে গেল। ইভান পেত্রভিচ যদি ছ'মাস পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরে এসে বাবার দয়া ভিক্ষা করতেন, তিনি হয়ত তাকে ক্ষমাই করে ফেলতেন। হয়তো প্রথমে তাকে করতেন ভৎর্সনা, তাঁর গাঁট-ওলা লাঠি দিয়ে দু-এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ভয় দেখাতেন, কিন্তু তাতো হোল না। ইভান পেত্রভিচ রইলেন বিদেশে, তিনি ব্যাপারটা আমোলই দিলেন না। তাঁর বাবার দিকেও ব্যাপারটা তেমনই রইল। যা করেছি, করেছি! আবার ওকথা তুলছ—এত স্পর্দ্ধা! স্ত্রী যখনি তাঁর মন কোমল করে দিতে চাইতেন, তিনি এই বলে তাঁকে ভৎর্সনা করতেন—কুকুরের বাচ্চা, ওর ভাগ্য ভালো যে ওকে আমি কিছু করিনি। আমার বাবা হলে পাজিটাকে নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলতেন, আর তাই-ই হোত ঠিক কাজ। এমন ভয়ানক কথা শুনে আনা পাভলোভনা শুধু অস্থির হয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকতেন বুকে। তার পুত্রবধূকে পিতর আন্দ্রেই একেবারে আমলই দেন নি। পেস্তভের এক চিঠিতে পুত্রবধূর উল্লেখ ছিল, তাই পড়ে তিনি লিখলেন, কোনো পুত্রবধূর কথা তিনি শুনতে রাজি নন, তা ছাড়া তিনি কর্তব্য হিসাবেই জানাচ্ছেন,

পলাতক দাসকে ঠাঁই দেওয়া আইন-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু পরে যখন নাতির ভূমিষ্ঠ হবার খবর পেলেন তার ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি গোপনে খোঁজ নিলেন, প্রসব হবার পর প্রসূতি কেমন আছে; কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি যে টাকা দিয়েছেন, একথা তাকে জানালেন না। ফিদিয়ার তখন এক বছরও পূর্ণ হয় নি, আনা পাভ্‌লোভ্‌না হঠাৎ ভয়ানক অসুখে পড়লেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, শয্যাশায়িনী আনা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ধর্মযাজকের সুমুখে তার স্বামীকে বললেন, তিনি তার পুত্রবধূকে শেষ দেখা দেখতে চান, তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চান, পৌত্রকেও আশীর্বাদ করতে তার মন চাইছে। বৃদ্ধ তখন শোকে মুহ্যমান, তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন, নিজের গাড়িখানা পাঠালেন পুত্রবধূকে আনতে। তাকে মালানিয়া সাজিয়েভ্‌না বলে এই তাঁর প্রথম সম্ভাষণ। মালানিয়া ছেলেকে নিয়ে এল, সঙ্গে মারফা দিমোফিয়েভ্‌না। তিনি তাকে একা যেতে দিতে চাইলেন না, দরকার হলে তিনিও তার পাশে দাঁড়াবেন—এই ছিল তার পণ। মালানিয়া সাজিয়েভ্‌না ভয়ে তখন আধমরা। সে পিতর আন্দ্রেইয়ের পড়বার ঘরে এসে ঢুকলো। একটি দাই ফিদিয়াকে কোলে করে নিয়ে এল, পিতর আন্দ্রেই নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখলেন একবার। মালানিয়া তাঁর হাতের উপর চুমু দেবে বলে তাঁর কাছে গেল। তার বেপথু ঠোঁটদুটি নিঃশব্দ চুম্বনে রূপ পেল।

তিনি এবার নীরবতা ভাঙলেন, কেমন আছ তুমি? চল কর্ত্রীর কাছে যাই। তিনি উঠে ফিদিয়ার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি দেখলেন। শিশু-হাসছে, তার খুদে হাতদুখানা বাড়িয়ে দিলে তাঁর দিকে। বৃদ্ধের মনে গিয়ে সোজা পৌঁছলো এ আবেদন। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, বেচারী, বেচারী! খুদে পাখী, তুমি বুঝি তোমার বাপের জন্য ভিক্ষা চাইতে এসেছ! ওগো খুদে মানুষটি, আমি তো তোমাকে ছেড়ে দেব না।

মালানিয়া সার্জিয়েভ্না আনা পাভলোভনার শোবার ঘরে ঢুকেই দরজার সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। আনা তাকে ইসারায় বিছানার কাছে আসতে বললেন। তারপর আলিঙ্গনের পালা। তার ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন। তার মুখ ব্যথায় কুঞ্চিত, তিনি কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন···

পিতর আন্দ্রেই অস্ফুটস্বরে বললেন, জানি, জানি···তুমি কি বলবে, না, না, দুঃখ কোরো না! মালানিয়া আমাদের কাছেই থাকবে, আর ওরই জন্য আমি ভাস্কাকে ক্ষমা করব।

বহু কষ্টে আনা পাভলোভনা স্বামীর হাত চেপে ধরে নিজের ঠোঁটের উপর তুলে নিলেন। সেইদিন সন্ধ্যায়ই তাঁর মৃত্যু হল।

পিতর আন্দ্রেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন। তিনি ছেলেকে এই মর্মে জানালেন, তার মার অন্তিম ইচ্ছা ও শিশু ফিওদরের মুখ চেয়ে তিনি তাকে আশীর্বাদ করছেন, আর মালানিয়া সার্জিয়েভ্নাকেও তাঁর বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছেন। তাকে দুখানা ঘর দিয়েছেন একতলা আর দোতলার মাঝখানে। তাঁর সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিয়েছেন; একচোখো ব্রিগেডিয়ার স্কুরোকিন আর তার স্ত্রী তাঁরা দুটি দাসী আর একটি ফাই-ফরমায়েস খাটবার ·ছোকরাও তিনি তাঁর জন্যে নিযুক্ত করেছেন। মারফা দিমোফিয়েভ না বিদায় নিয়ে চলে গেছে। গ্লাফিরার উপরে সে খুবই চটা, তার সঙ্গে দিনে তিনবার তার ঝগড়া চলছিল, ইত্যাদি···ইত্যাদি···

প্রথমে বেচারী মালানিয়া বড় বিব্রত হয়ে পড়লো, কিন্তু সময়ে সবই সয়ে গেল। এমন কি শ্বশুরের সঙ্গেও সে খাপ খাইয়ে নিলে। তিনিও তাকে গ্রহণ করলেন, এমন কি, তাকে তাঁর ভালও লাগলো। যদিও কথা তার সঙ্গে তিনি কমই বলতেন, আর তার দয়ার ভিতরে ছিল নির্জ্জান মনের অবজ্ঞা। মালানিয়া সার্জিয়েভ্নার উপর সবচেয়ে

বেশি আক্রোশ ছিল তার ননদ গ্লাফিরার। তার মা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন থেকেই গ্লাফিরা আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়িটার কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছিল। সবাই, এমন কি, তার বাবাও তখন তার হাতের মুঠোয় এসে গেছেন। তার হুকুম ছাড়া একটু চিনি অবধি কেউ পেত না। তার তখন এমনি অবস্থা যে, অন্য কাউকে একটু কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবার চাইতে মৃত্যুও তার ভাল। আর কাকে সে কর্তৃত্ব দেবে। পিতর আন্দ্রেইয়ের চাইতেও তার ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারটা তার বুকে বেশি বেজেছিল। সে এই হঠাৎ-অভিজাত মেয়েটাকে সাজা দেবে ঠিক করলো; আর মালানিয়া সার্জিয়েভ্না প্রথম থেকেই তার দাসী বনে গেল। আর সত্যই সে এই উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল গ্লাফিরার সঙ্গে কি করে এঁটে উঠবে! সে তো নম্র, দিশেহারা, অসুস্থ ভীরু মেয়ে। এমন দিন যেতনা, যখন গ্লাফিরা তাকে তার আগের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার উপযুক্ত জায়গা কোথায় সে নির্দেশ না দিত। মালানিয়া সার্জিয়েভ্নার পক্ষে এ নির্দেশ অসহ্য হলেও সে সয়ে যেত · কিন্তু ফিদিয়াকেও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। সেই তো তার দুঃখ। ওরা ছুতো তুললে, সে সন্তান পালনে অক্ষম, আর সন্তানকে দেখা পর্যন্ত তার নিষিদ্ধ হল। কালেভদ্রেই সে তার দেখা পেত। গ্লাফিরা তার পালনের ভার নিলে। শিশুকে সম্পূর্ণ তার অধীনে রাখা হল। মালানিয়া সার্জিয়েভ্না দুঃখ করে ইভান পেত্রভিচকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলে, তিনি যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসেন। পিতর আন্দ্রেই তখন ছেলেকে দেখবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তিনি শুধু চিঠিতে না আসার ওজুহাত দেখালেন, বাপকে স্ত্রীর তত্ত্বাবধান ও তাকে টাকা পাঠাবার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। তারপরে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি শীগ্‌গীরই ফিরে আসবেন— কিন্তু এলেন না। অবশেষে ১৮১২ সালে, তিনি বাড়ী ফিরলেন। ছ'বছর পরে বাপ ছেলেতে দেখা হল, তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন,

কিন্তু কেউ পুরানো দিনের কথা তুললেন না। আর তখন সে সময়ও ছিল না, সমগ্র রাশিয়া তখন শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা দুজনেই অনুভব করলেন, রুশ রক্ত তাদের ধমনীতে প্রবাহিত। পিতর আন্দ্রেই জাতীয় বাহিনীর একটি গোটা পল্টনকে নিজের অর্থে সমর সজ্জায় সজ্জিত করে দিলেন। যুদ্ধ একদিন শেষ হয়ে গেল, বিপদ গেল কেটে। ইভান পেত্রভিচের দিনগুলি আবার একঘেয়ে হয়ে উঠল·· দূরের হাতছানি আবার তার কাছে এল—তখন তাকে আকর্ষণ করছে তার সেই চিরাভ্যস্ত পৃথিবী—যেখানে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। মালিয়ানা সার্জিয়েভ্না তাকে ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর কাছে তার কতটুকুই বা দাম! মালিয়ানার শেষ আশাটুকু পর্যন্ত চুরমার হয়ে গেল। গ্লাফিরার হাতেই ফিদিয়ার পালনের ভার থাকা উচিত—তার স্বামীও তাই মনে করলেন। ইভান পেত্রভিচের দুঃখিনী স্ত্রী এ আঘাত সইতে পারল না, আর একবার বিরহ তার আর সহ্য হল না। কয়েক দিনের ভিতরেই সে অভিযোগ না করে শয্যায় আশ্রয় নিলে। জীবনে সে কখনো কোনো কিছুর বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াতে পারে নি, আজও রোগের বিরুদ্ধে সে লড়াই করলে না। কথা তার বন্ধ হয়ে গেল, মৃত্যুর ছায়া পড়লো মুখে। তখনো তার চোখে ধীর বিস্মিত দৃষ্টি, নম্রতা আর ভীরুতা। তেমনি মূক আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে সে তাকিয়ে রইল গ্লাফিরার দিকে। আনা পাভ্লোভনা যেমন মৃত্যুশয্যায় তার স্বামীর হাতের উপর চুমু খেয়েছিলেন, তেমনি করে সেও চুমু খেল গ্লাফিরার হাতে—তার হাতে সঁপে দিয়ে গেল তার একমাত্র সন্তানকে। এইভাবেই তার ইহলীলা শেষ হয়ে গেল। নম্র, ভীরু মেয়ে, কোমল ছিল তার মন। তাকে একটা চারা গাছের মতো তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে উপড়ে এনে কেন যে দূরে ছুঁড়ে ফেলা হল কে তা বলবে? কেউ ভাবলে না যে, মূলহীন গাছ রোদে শুকিয়ে যাবে, মরে যাবে। সে গেলও তাই।

তার সতেজভাব মিলিয়ে গেল, শুকিয়ে সে ঝরে পড়লো বিস্মৃতির গভীরে, কেউ তার জন্যে দুঃখ করলে না। বৃদ্ধ শ্বশুর তার সেই কমনীয় সুন্দর মুখখানা আর দেখতে পেলেন না, তার সেই মূক উপস্থিতিও চিরদিনের মতো হারালেন। তিনি গীর্জায় শেষবারের মতো তার দেহের সুমুখে নত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, বিদায়, আমার মূক শান্ত শিশু, বিদায়! তার কবরের উপর এক মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিতে দিতে তিনি চোখের জল ফেললেন।

তার মৃত্যুর পর তিনি আর বেশিদিন ইহজগতে রইলেন না, পাঁচ বছরের বেশি নয়। ১৮১৯ সালের শীতকালে মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হল। তিনি সেখানে গ্লাফিরা আর তার পৌত্রকে নিয়ে বসবাস করছিলেন। আনা পাভ্‌লোভ্‌না আর মালানিয়ার পাশে তাকে যেন কবর দেওয়া হয়, এই-ই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। ইভান পেত্রভিচ তখন প্যারীতে, তিনি উপভোগ করছিলেন প্যারীর জীবন। ১৮১৫ সালের পরেই তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি রাশিয়ায় ফিরবেন ঠিক করলেন। জমিদারীর বিলি-বন্দোবস্ত তো করতে হবে। আর গ্লাফিরার চিঠিতে খবর পেয়ে ভেবে দেখলেন, ফিদিয়া এবার তেরোয় পা দেবে, তার শিক্ষার দিকেও এবার বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

দশ

ইভান পেত্রভিচ রাশিয়ায় ফিরলেন পুরো ইংরেজ হয়ে। ইংরেজভক্ত শুধু নয়—ইংরাজীয়ানায় উন্মাদ। ছোট করে ছাঁটা তার চুল, কড়া ইস্ত্রী করা সার্ট, লম্বা শস্য-সবুজ ফ্রক কোট, তার আবার নানা অংশ—একটু একটু করে জোড়া দিয়ে তবে পুরো পোষাকটি পরা যায়। মুখের কঠোর ভাব, স্বভাব উদ্ধত, উদাসীন, দাঁতে চেপে চেপে কথা বলেন, হঠাৎ হেসে ওঠেন কাষ্ঠ হাসি। তার মুখে নেই লেশমাত্র

হাসি, আর তার একমাত্র আলাপ রাজনীতি—বা রাষ্ট্রিক অর্থনীতি নিয়ে। তার আধসেদ্ধ আধভাজা গরুর মাংসে আর পোর্ট মদের প্রতি আছে লোলুপতা—তার সব কিছুতেই বৃটেনের গন্ধ। কিন্তু এ বড় অদ্ভুত যে, এমন ইংরেজ ভক্ত হয়েও ইভান পেত্রভিচ দেশপ্রেমিক বনে গেলেন—অন্তত তিনি তো তাই বলতেন। যদিও রাশিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল সামান্যই, আচারে ব্যবহারে রুশত্ব তার বিন্দুমাত্র ছিল না, রুশ ভাষাও বলতেন তিনি অদ্ভুত ঢঙে আর উচ্চারণে। সাধারণ আলাপে তার কথা-বার্তা ছিল কেমন অদ্ভুত ধরণের, উদাসীনতা সেখানে দেখা দিত, আবার তাতে ছিল গ্যালিক ধরণ-ধারণ। কিন্তু যেই আলাপ বিশেষ কোনো দিকে মোড় ঘুরতো, ইভান পেত্রভিচ তখনি নানা বুলি ঝাড়তেন—বলতেন, 'এতে যথেষ্ট পরিমাণে মনঃসংযোগ প্রয়োজন',—'স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে এটা খাপ খায় না!' এমনি সব কথাই বলতেন। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা তিনি আমদানি করেছিলেন। এগুলি ছিল তার সঙ্গে আনা কতগুলি পাণ্ডুলিপিতে। তিনি এসে যা কিছু দেখতে পেলেন, তাতেই তার অসন্তোষ বেড়ে গেল। অব্যবস্থা তাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিলে, তার রাগ হল। বোনের সঙ্গে দেখা হতে, প্রথমেই তিনি যে আমূল সংস্কার করবেন সে-কথা বললেন। তাকে সাবধান করে দিলেন যে, এখন থেকে সব কিছুই চলবে নতুন ধারায়। গ্লাফিরা পেত্রভ্‌না কিছু বললেন না, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগলেন—আমার উপায় কি হবে? কিন্তু ভাই আর ভাই-পোর সঙ্গে জমিদারীতে এসেই তার ভয় উপে গেল। কিছু কিছু পরিবর্তন যে না হল তা নয়। পরভৃৎ আর চাটুকারের দল নির্বাসিত হল, এদের মধ্যে দুটি বৃদ্ধাও ছিল। একজন তো আবার অন্ধ, আর একজনের ছিল পক্ষাঘাত। আর একজন ওচাকভের সময়ে মেজর ছিলেন। তিনি তখন বৃদ্ধ, তার রাক্ষুসে ক্ষিধের জন্য তাকে রুটি আর শাক-সবজী খেতে দেওয়া হত।

নতুন হুকুম জারী হল, পুরানো অতিথিদের আর আপ্যায়ন করা হবে না। এদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছিলেন দূর প্রতিবেশী এক ক্ষুফুলারোগী ব্যারন, তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের কেতা-দুরস্ত মানুষ, আর বুদ্ধির দিক দিয়েও একেবারে অজমূর্খ। নতুন আসবাবপত্র এল মস্কো থেকে—পিকদান, ঘণ্টা, মুখধোবার সরঞ্জাম চালু হল। নতুন কেতায় প্রাতরাশ পরিবেশন করা হতে লাগল, ভোদ্‌কা আর গৃহজাত মদের বদলি এল বিদেশী পানীয়। ভৃত্যদের জন্য নতুন তকমা এল, পারিবারিক প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত হল নতুন কথা···কিন্তু গ্লাফিরার কর্তৃত্ব একটুও ব্যাহত হল না, তখনো কেনা-কাটি দেওয়া-থোওয়ার ভার তাঁর হাতে। বিদেশ থেকে আমদানী আলসাস-দেশীয় ভৃত্য একবার তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা-করেছিল কিন্তু সে তার পদ-মর্যাদা হারাল, তবে চাকরিটি বজায় রইল। গৃহস্থালী আর জমিদারীর বিলি-ব্যবস্থায়ও খানিকটা মতামত দেওয়ার ক্ষমতা রইল গ্লাফিরা পেত্রভ্‌নার। ইভান পেত্রভিচ পুরানো বিশৃঙ্খলার ভিতরে ঘন ঘন নতুন বিধি-ব্যবস্থার কথা বলতে লাগলেন, তা সত্ত্বেও সবই আগের মতো রইল। হ্যাঁ, সবই, তবে এখানে-সেখানে একটু আধটু অদল-বদল হল। যেমন, সম্পত্তির কিছু খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হল, একটু কঠোর হল নিয়ম-কানুন, জমিদারের জন্য প্রজার মাগ্‌না খাটার প্রথার কড়াকড়ি হল ; চাষীরা যাতে প্রত্যক্ষভাবে ইভান পেত্রভিচের কাছে আবেদন জানাতে না পারে সে হুকুমও জারি হল। এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, দেশপ্রেমিকের নিজের অনুজীবীদের প্রতি রয়েছে ভয়ংকর ঘৃণা। ইভান পেত্রভিচের বিধি-ব্যবস্থা শুধু পূর্ণমাত্রায় ফিদিয়ার উপর বর্তালো, তার শিক্ষার ধারায় এল সত্যিই পরিবর্তন—তার বাবা আর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই কাজেই মন দিলেন।

এগারো

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ইভান পেত্রভিচ যখন বিদেশে ছিলেন, তখন ফিদিয়ার ভার ছিল গ্লাফিয়ার উপর। তার মা যখন মারা-যান তখন তার বয়েস আট বছরও পোরেনি। মার সঙ্গে তার দেখা হোত মাঝে মাঝে, তবু সে তাঁকে খুবই ভালবাসত; তার স্মৃতি, তার সেই নম্র ম্লান মুখ, ম্লান দৃষ্টি, ভীরু সোহাগ তার মনে দাগ কেটে দিয়েছিল; সে দাগ তো মুছে যাবার নয়। সে অস্পষ্টভাবে তখনি ভাবতো, বাড়িতে তার মার কি অবস্থা, একটা ব্যবধান যেন তাদের মধ্যে খাড়া হয়ে আছে। সে-ব্যবধান ঘোচাবার সাহস তার মার নেই, ক্ষমতাও নেই। সে বাবাকে এড়িয়ে চলত, আর বাবাও তাকে কখনো আদর করতেন না। শুধু দাদু মাঝে মাঝে মাথা চাপড়ে আদর করতেন, হাতে চুমু খেতে দিতেন, কিন্তু তিনিও তাকে বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না। মালানিয়া সার্জিয়েভ্না মারা যাবার পর সে এসে পড়লো একেবারে তার পিসীর আওতায়। ফিদিয়া তাঁকে ভয় করতো। তাঁর উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ, আর কর্কশ স্বরে ছিল ভীতি। তাঁর সামনে সে একটা কথা বলতেও সাহস করত না। যদি একবার চেয়ারে সে নড়ে চড়েও বসতো, তিনি গর্জন করে উঠতেন, 'এই কি হচ্ছে! চুপ করে বসে থাক!' রবিবারে প্রার্থনা সাঙ্গ হলে, তাকে খেলতে অনুমতি দেওয়া হত। সে খেলাও অন্য ধরণের। তাকে একখানা মোটা বই দেওয়া হত, সেখানি যেন এক রহস্য, নাম তার 'প্রতীক ও স্মারক', লেখক কে এক ম্যাক্সিমোভিচ য়্যামবোদিক। এই বইখানিতে ছিল প্রায় এক হাজার রহস্যময় প্রতীকের কথা আর তার সঙ্গে পাঁচটি ভাষায় দুর্বোধ্য টীকা। একটি মোটাসোটা উলঙ্গ কিউপিড ছিল সে বইয়ের সেরা ছবি। তার একটির নীচে 'জাফরাণ আর রামধনু' এই বিষয়

সম্বন্ধ যে টীকা ছিল, তাতে লেখা—'এর প্রভাব যথেষ্ট।' আর একটি ছিল হিরা পাখীর ছবি, ভায়োলেট ফুল ঠোঁটে নিয়ে সে উড়ে যাচ্ছে···তার নীচে লেখা—'তুমি তো সবই জান।' কিউপিড আর ভল্লুক তার ছানাদের চাটছে—তার অর্থ—'ধীরে ধীরে কাজ করা।' ফিদিয়া এই ছবিগুলি দেখত, তাদের খুটিনাটি সে জেনে ফেলেছিল। কতগুলো ছিল একই রকম, তাদের সম্বন্ধে সে ভাবত, তার কল্পনার রাশ আলগা করে দিত, অন্য কোনো আমোদ-আহ্লাদের খবর সে রাখত না। যখন ভাষা আর গান শেখার সময় হল, গ্রাফিরা পেত্রভ্না শুধু গান শেখার জন্য এক বৃদ্ধা দাসীকে নিযুক্ত করলেন। তার দৃষ্টি খরগোসের মতো, লোক সে সুইডেনের, ফরাসী আর জার্মান সে সামান্যই জানত, তাছাড়া জানতো পিয়ানোয় একটু-আধটু টোকা দিতে। সবচেয়ে তার খ্যাতি ছিল শসার খোসা ছাড়ানোর ব্যাপারে। পরিচারিকা, পিসী আর বৃদ্ধা দাসীর মধ্যে ফিদিয়া তার জীবনের সেরা চারটি বছর কাটিয়ে দিলে। প্রায়ই সে এক কোণে 'স্মারক' নিয়ে বসে থাকত, দিনগুলি বসে বসে কেটে যেত—ঘরের ছাদ ছিল নীচু—জেরেনিয়ামের গন্ধ ভেসে আসতো। একটি নিঃসঙ্গ মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলতো, ঘরে কেঁপে কেঁপে উঠতো তার শিখা, ঝিঁ ঝিঁ ডাকত যেন তন্দ্রার ঘোরে ভীষণ ক্লান্তিতে। দেয়ালে ছোট্ট ঘড়িটা টিকটিক করে চলত দ্রুত বেগে। কোথায় পাটাতনের নীচে চঞ্চল হয়ে আঁচড়াত কামড়াত একটা ইঁদুর; আর তিনটি বৃদ্ধা বসে থাকতেন নিয়তির মতো। নিঃশব্দে কাঁটা নিয়ে বুনে যেতেন দ্রুত, তাদের হাতের ছায়া দেয়ালে অদ্ভুত হয়ে দেখা দিত, কেঁপে কেঁপে উঠত আলো-আঁধারে। আর শিশুর মগজে অদ্ভুত যত ভাবনা এসে বাসা বাঁধতো। সে-ভাবনায় আলোর স্পর্শ ছিল না, ছিল ঘন আঁধার। ফিদিয়াকে দেখে কেউ সুস্থ বলতে পারত না। সে একটু যেন ছিল ম্লান, একটু জবুথবু—গ্রাফিরা তো বলতেন, ও একেবারে খাঁটি একটি

চাষী। ওকে যদি প্রায়ই খোলা হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া হত, ওর গালে ফুটতো রক্তিম আভা, স্বাভাবিক রঙ দেখা দিত। কিন্তু তাতে-হল না। যাহোক, পড়াশুনোয় সে ভালই ছিল, যদিও প্রায়ই তার দেখা দিত কুঁড়েমি। কখনো সে কাঁদত না, কিন্তু সময়ে সময়ে মুখ গোমরা করে থাকত, একগুঁয়েমি দেখা দিত, তখন তাকে নিয়ে মানিয়ে চলা ছিল দুষ্কর। তার চারপাশে যারা ছিলেন, ফিদিয়া তাদের কাউকে ভালবাসত না…শৈশবে যে ভালবাসতে পারল না তার মতো অভাগা কে !

এমনি অবস্থায় তাকে পেলেন ইভান পেত্রভিচ, আর সময় নষ্ট না করে তিনি তার শিক্ষা-প্রণালী তার উপরে প্রয়োগ করলেন। তিনি গ্লাফিরাকে বললেন, 'আমি আগে ওকে মানুষ করে তুলতে চাই, শুধু মানুষ নয়, শক্ত মানুষ, ঠিক স্পার্টার মানুষের মতো।' ইভান পেত্রভিচ প্রথমেই তাকে স্কটল্যাণ্ডের সামরিক পোষাকে সাজিয়ে নিজের প্রণালীর উদ্বোধন করলেন। চার বছরের ছেলে হাঁটু অবধি পোষাক আর মাথায় পালকের টুপী পরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ; সুইডেনের বৃদ্ধার পরিবর্তে এলেন সুইজারল্যাণ্ডের এক শিক্ষক, তিনি আবার ব্যায়ামবীর। সঙ্গীত পুরুষের বিদ্যা নয় বলে একেবারে বাদ দেওয়া হলো ; প্রকৃতি বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন, গণিত, ছুতোরের বিদ্যা, আর রুশোর মত অনুসারে মধ্য যুগীয় প্রতীক সম্বন্ধে শিক্ষা বীরত্ব উদ্দীপ্ত করবার জন্য চালু রইল। এইগুলিই হলো 'ভবিষ্যৎ' মানুষের শিক্ষা। ভোর চারটের সময় তাকে জাগিয়ে দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ধারা-স্নান, তারপর একটা দণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন তারের উপর দিয়ে তাকে ছুটতে হোত। দিনে একবার সে খেতে পেত, একটি মাত্র থাকত ব্যাঞ্জন, ঘোড়া দাবড়াত, গুলী ছোড়া শিখত। বাপের আদর্শে তার ইচ্ছাশক্তি বিকাশের চেষ্টা হোত, তারপর সন্ধ্যায় সে বসত একখানা খাতায় দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি লিখতে, তার নিজের মন্তব্যও

তাতে থাকত। ইভান পেত্রভিচ তাকে ফরাসীভাষায় লিখে উপদেশ দিতেন তাতে আমার 'প্রিয় পুত্র' একথাটা এখানে-ওখানে থাকত! তিনি তাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করতেন। ফিদিয়া রুশ ভাষায় তাকে'তুমিই' বলতো, কিন্তু কখনো তাঁর সামনে বসতে সাহস করত না। এই 'শিক্ষা প্রণালী' বালককে দিশেহারা করে দিল, তার মগজে গোলমাল শুরু হল, মনের বিকাশ তার তখন অবরুদ্ধ। কিন্তু এই নতুন জীবনযাত্রায় শরীরের উপকারই হল। প্রথমেই সে পড়লো জ্বরে কিন্তু শীগ্ গীরই আরাম হল। সে তখন শক্ত-সমর্থ বালক। তার বাবা গর্ব অনুভব করলেন, নিজের বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গীতে বললেন, 'ও আমার হাতে-গড়া সন্তান।' ফিদিয়ার যখন ষোলো বছর বয়েস, ইভান পেত্রভিচ বললেন, এবার ওর ভিতরে স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করবার সময় হয়েছে।—আর আমাদের তরুণ স্পার্টান— তার মনে তখন লজ্জা, প্রথম গোঁপের রেখা ঠোঁটে, মন তারুণ্যে ভরপুর, আছে শক্তি আর উষ্ণ তরুণ রক্তধারা। সে উদাসীনতার ভান করলে, সকলের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখলে, স্বভাবে সে হল উদ্ধত।

সময় কেটে যেতে লাগলো। ইভান পেত্রভিচ বছরের বেশির ভাগ সময় লাভ্রিকিতে (এই তার প্রধান জমিদারীটির নাম) কাটাতে লাগলেন। শীতে একা চলে যেতেন মস্কোতে, সেখানে এক হোটেলে উঠতেন, ক্লাবে যেতেন, অভিজাত বৈঠকখানায় নিজের ভাবধারা আর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করতেন, আগের থেকেও বেশি ইংরেজিয়ানা দেখাতেন। কেমন এক অসন্তোষ যেন তখন দেখা দিয়েছে তাঁর ভিতরে। তিনি তখন নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এবার এল ১৮২৫ সাল, সঙ্গে নিয়ে এল দুঃখ আর দুর্ভোগ। ইভান পেত্রভিচের অন্তরঙ্গ বন্ধু আর পরিচিতরা সে দুর্ভোগ বেশি করেই ভোগ করলেন; ইভান পেত্রভিচ তাড়াতাড়ি তার বাড়ির নিরালয় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, পৃথিবী যেন তার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল।

আর এক বছর কেটে গেল, এবার ইভান পেত্রভিচের শরীর হঠাৎ ভেঙে পড়লো। তিনি তখন অশক্ত, অসুস্থ। স্বাধীন চিন্তা ছিল যাঁর, তিনি কিনা গীর্জায় যেতে শুরু করলেন, প্রার্থনায় যোগ দিলেন; ইওরোপীয় মানুষটি আবার রুশ-হামামে যেতে লাগলেন, বেলা দুটোয় খাওয়া আর ন'টায় শোওয়া চললো, আর বুড়ো পরিচারকের বক্‌বকানি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে লাগলেন। নেতা তার সমস্ত পরিকল্পনা আর চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেললেন, শাসনকর্তার সুমুখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, পুলিস ইন্‌সপেকটার দেখে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে গেলেন। কঠোর ইচ্ছাশক্তি ছিল যাঁর, তিনি তখন ফোঁড়া হলে বা সুপ ঠাণ্ডা হলে মুখ বিকৃত করতে লাগলেন, গজরানিরও তার অন্ত রইল না। আবার গ্লাফিরা পেত্রভ্‌না পেলেন সারা-বাড়ির কর্তৃত্ব আবার নায়েব গোমস্তা আমলা-কর্মচারী আর সবরকম লোক পিছনের দরজায় বুড়ীর কাছে এসে ধর্ণা দিতে লাগলো।

দাস-দাসীরা বুড়িকে বলতো, পাথুরে প্রাণ যেন! আবার সেই পাথুরে প্রাণকে তোয়াজ করা শুরু হোল। ইভান পেত্রভিচের এই পরিবর্তন তার ছেলেকে অবাক করে দিলে। সে তখন উনিশ বছরে সবে পা দিয়েছে, ভাবতে শিখেছে, একটু একটু করে অত্যাচারী বাপের হাত থেকে সে মুক্তির চেষ্টা করছে। আগেই সে তার বাপের কথায় আর কাজে বৈষম্য লক্ষ্য করেছিল, উদার ভাবধারা সম্বন্ধে তার মুখর ঘোষণা আর অতি কঠোর অত্যাচারের পরিচয় পেয়েছিল; কিন্তু এমন পরিবর্তন সে আশা করে নি। দীর্ঘদিনের আত্মকেন্দ্রিকতার এবার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। তরুণ লাভ্রেৎস্কী তখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবার তোড়জোড় করছে, ঠিক যাবার মুহূর্তে ঘনিয়ে এল ইভান পেত্রভিচের আর এক দুঃখ—তিনি অন্ধ, একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন—আর তা হলেন একদিনের ভিতরে।

রুশ ডাক্তারদের চিকিৎসা-বিদ্যার উপর ভরসা না করে তিনি বিদেশ যাবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত করলেন। দরখাস্ত নামঞ্জুর হলো। এবার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সারা রাশিয়া ঘুরলেন তিন বছর ধরে। এক ডাক্তার থেকে আর এক ডাক্তারের কাছে ঘোরা হোল, ঘোরা হোল এ শহর থেকে সে শহরে। নিজের ছেলেকে, দাস-দাসী আর ডাক্তারদের তার খিটখিটে মেজাজ আর নীচ স্বভাবে অতিষ্ঠ করে তুললেন। লাভ্রিকীতে যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি অসহায় জীব, শিশুর মতোই আবদার করেন, ঝগড়া করেন। বাড়িতে সবার পক্ষেই দুঃখময় জীবন শুরু হয়ে গেল—তিক্ততায় ভরে উঠলো দিনগুলি। শুধু খাবার সময়ে ইভান পেত্রভিচ শান্ত থাক্‌তেন, এর আগে কখনো এত খেতেন না, এমন লোভীও ছিলেন না। বাকি সময়টা তিনি নিজেকে আর আর-সবাইকে স্বস্তিতে কাটাতে দিতেন না। তিনি এই প্রার্থনা করতেন, এই বা নিজের অদৃষ্টের নিন্দা শুরু হোত, নিজের বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি আর নিজেকেও গাল দিতেন। যা নিয়ে তার ছিল গর্ব, তার ছেলেকে তিনি যা আদর্শ বলে শিখিয়েছিলেন, তারই উপর বর্ষণ করতেন অভিশাপ। তিনি চীৎকার করে ঘোষণা করতেন, তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না, আবার পরমুহূর্তেই উপাসনায় বসে যেতেন। এক মুহূর্তের নিঃসঙ্গতাও তাঁর কাছে তখন অসহ্য। তাঁর দাবী ছিল, বাড়ির সবাই রাত-দিন তার কাছে থাকবে, তাঁকে গল্প শোনাবে। কিন্তু গল্পের মাঝে মাঝে তিনি বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন—তুমি তো ভয়ংকর মিথ্যাবাদী—একি আজগুবী গল্প শোনাচ্ছ!

গ্লাফিরা পেত্রভ্‌না সবই সহ্য করে যাচ্ছিলেন—তাকে ছাড়া পেত্রভিচের তখন চলে না। তিনি রোগীর সবরকম খেয়াল মেটাতেন, যদিও তার প্রশ্নের চটপট উত্তর তিনি দিতেন না। তার ভয় ছিল পাছে তিনি অবরুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলেন। এইভাবে তিনি আরো

দুবছর কাটালেন, তার পর মে মাসের প্রথম দিকে মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে তাঁকে বারান্দায় রোদে নিয়ে বসানো হয়েছিল। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, গ্রাশা, গ্রাশা…আমার সুরুয়া কোথায় ওরে বুড়ী—কথা শেষ করতে না করতেই তার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল। গ্রাফিরা পেত্রভ্না সুরুয়ার পেয়ালাটা পরিচারকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাইয়ের মুখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন, তারপর নিঃশব্দে চলে গেলেন। তার ছেলেও সেখানে ছিল, সেও কিছু বললে না। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে বাগানের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বাগানে শ্যাম সমারোহ, সুগন্ধির ঢেউ বয়ে চলেছে, বসন্তের সূর্যের সোনায় উজ্জ্বল চারদিক। তার বয়স তখন তেইশ বছর। কি ভয়ংকর ভাবে কেটে গেল তার এই তেইশটি বছর—কি নিষ্ঠুর দ্রুত তার গতি!…জীবন এবার সুমুখে খুলে গেল—বিস্তৃত জীবন, বিশাল জীবন।

বারো

বাবাকে কবর দিয়ে গৃহস্থালি আর সম্পত্তির ভার গ্রাফিরা পেত্রভ্নার হাতে দিয়ে যুবক লাভ্রেৎস্কী মস্কৌ চলে গেল। তার মনে হোল এক অদৃশ্য শক্তি তাকে সেখানে টানছে। সে-শক্তির রূপ তার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া দুষ্কর। সে বুঝতে পারলো তার শিক্ষায় আছে বহু বিচ্যুতি, আর সে যথাসম্ভব তা পূরণের জন্য সংকল্প করলো। বয়ে-যাওয়া সময়ের ক্ষতিটুকু পূরণ করতে হবে বইকি? পাঁচ বছরে সে অনেক পড়েছে, কিছু দেখেওছে, বহু ভাবধারা তার মগজে টগবগ করে ফুটছে। একজন অধ্যাপকও তার শিক্ষার নানাদিক দেখে ঈর্ষিত হতেন; কিন্তু এমন অনেক জিনিষ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ রইল, যা প্রতিটি

ইস্কুলের ছেলেও জানে। লাভ্রেৎস্কী বুঝতে পারলো সে সহজ-স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি, স্বাভাবিক হতে পারে নি—সে যে বেমানান সে সম্বন্ধে তখন সে সচেতন। ইংরেজিয়ানায় উন্মত্ত পিতা তাকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন। তাঁর খেয়ালি শিক্ষার ফল ফলতে লাগলো। বহুদিন সে তার বাবার নির্দেশ মতোই চললো—সে নির্দেশ জারী হোলনা বটে, সে রইল তার সত্তায়। অবশেষে যখন সে বুঝতে পারলো, তখন যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে, সে তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে সে মিশতে পারত না। তেইশ বছরে, তার লাজুক হৃদয়ে ছিল অনির্বাণ ভালবাসার কামনা, কিন্তু কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকাবার সাহস তার ছিল না। তার বুদ্ধিবৃত্তি ছিল স্পষ্ট, আবার কিছুটা ভোঁতা; ব্যবহারিক জ্ঞানও ছিল; আবার একগুয়েমির দিকে তার ছিল ঝোঁক। তার সংকল্পের দৃঢ়তা আর মানসিক অলসতাও তখন প্রচণ্ড। শৈশবেই জীবনের ঘূর্ণাবর্তে তার পড়া উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে তাকে এক স্বভাব-বিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবনের গণ্ডীতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল,…এবার ভাঙলো সেই গণ্ডী—সেই মায়া। কিন্তু তবু সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—তেমনি সংযতবাক, নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে। এই বয়সে ছাত্রের উর্দি পরা হাস্যকর; কিন্তু উপহাসে সে ভীত হল না। তার দৃঢ় শিক্ষা তাকে পরের মতামত অবজ্ঞা করবার ক্ষমতা দিয়েছিল—সে তাই একটুও লজ্জিত না হয়ে পরলো ছাত্রের উর্দি। পদার্থ বিজ্ঞান আর গণিতের বিভাগে সে ভর্তি হোলো। লম্বা-চওড়া জোয়ান, স্বাস্থ্যের রক্তিমাভায় দীপ্ত মুখ নীরব যুবক। দীর্ঘ তার দাড়ি। সে তার সহধ্যায়ী ছাত্রদের কাছে অদ্ভুত জীব হিসেবেই দেখা দিল। তারা কি করে ভাববে যে, এই ভীষণ-দর্শন যুবক, যে বক্তৃতা শোনায় নিয়মনিষ্ঠ, দু-ঘোড়ার গাড়িতে যে আসে যায়, সে স্বভাবে শিশু ছাড়া কিছুই নয়। ওরা ওকে পাণ্ডিত্যাভিমানী বলেই মনে করতো, তার সঙ্গ থেকে দূরে থাকতো, প্রয়োজনও তাদের

হোত না; আর সেও থাকতো দূরে দূরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু-বছরে সে মাত্র একজনের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হোলো। সে তার কাছে লাটিন ভাষা শিখতো। ছাত্রটির নাম মিখালেভিচ। সে সব বিষয়েই পাণ্ডা আর কবি-খ্যাতিও তার ছিল। লাভ্রেৎস্কীর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল আন্তরিক, তার অদৃষ্টের পরিবর্তনেও সে অজান্তে কারণ হয়ে দাঁড়াল।

একদা থিয়েটারে (মোচালভ তখন খ্যাতির মধ্য-গগনে, লাভ্রেৎস্কী তাঁর একটি অভিনয়ও বাদ দিত না।) ড্রেস সার্কেলের বক্সে সে একটি তরুণীকে দেখতে পেল। কোনো নারীই এই গম্ভীর মানুষটির বুকে স্পন্দন না তুলে তাকে অতিক্রম করে যায় নি, কিন্তু এমনভাবে আগে তো দ্রুত তালে স্পন্দন উঠে নি। বক্সের মকমলের আসনে কনুই রেখে মেয়েটি বসে ছিল, সে একটুও নড়েনি। কিন্তু যৌবনের উষ্ণ উত্তেজনা তার সুন্দর পরিপূর্ণ মুখের রেখায় রেখায় খেলে গেল। এক মার্জিত মনের ছায়া পড়লো সুন্দর চোখে—সে-চোখ দুটি চেয়ে রইলো। কালো ভ্রূর নীচে আনত দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মৃদু কৌতূহল। সে কৌতূহল তার প্রকাশ-ব্যাকুল ঠোঁটের মৃদু হাসিতে, মাথা নাড়ার ভঙ্গীতে, তার বাহুতে, তার গ্রীবায়। সুবেশা নারী। তার পাশে বসে আছে এক শীর্ণা নারী, পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়েস হবে। পোষাকের গলাটা খোলা, কালো টুপী তার মাথায়, আবিষ্ট মুখে দন্তহীন হাসি। আর বক্সের ভিতরে বসে আছেন এক প্রৌঢ়, ঢিলেঢালা ফ্রক-কোট তার গায়ে, মুখে গাম্ভীর্য, আর পুঁতির মতো চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, গোঁফে দাড়িতে কলপ। উঁচু কপাল কিন্তু তাতে প্রতিভার চিহ্ন নেই, গালে বয়সের বলি-রেখা—সমস্ত চিহ্নগুলি মিলিয়ে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল বলে মনে হয়। লাভ্রেৎস্কী স্বপ্নের মতো সুন্দর তরুণীর এই মুখখানির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। হঠাৎ বক্সের দুয়ার খুলে গেল, মিখালেভিচ এসে ঢুকলো। এই মানুষটির

আবির্ভাব লাভ্রেৎস্কীর কাছে অদ্ভুত আর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হোল। মস্কোতে সে তার একমাত্র চেনা; তার সমস্ত মন যে টেনেছে—সেই তরুণী-টিরও সে চেনা। বক্সের দিকে তাকিয়ে সে দেখলে বক্সের সবাই মিথা-লেভিচকে পুরানো বন্ধুভাবেই গ্রহণ করলেন। মঞ্চের উপরে চলছে অভিনয়, সে অভিনয়ে লাভ্রেৎস্কীর আর তখন মন নেই। যদিও মোচালভ্ সেদিন প্রতিভায় বিকশিত, তবুও তাকে আগের মতো মুগ্ধ করতে পারলেন না। মঞ্চে এক বিষাদময় মূহূর্তে লাভ্রেৎস্কী সুন্দরীর দিকে মুখ তুলে তাকালে। স্বেচ্ছায় এ তাকানো নয়। সুমুখে ঝুঁকে আছে তরুণী; গাল তার ভাবলুতার আবেগে দীপ্ত। লাভ্রেৎস্কীর দৃষ্টি যেন তাকে পেড়াপীড়ি করছে ফিরে তাকাবার জন্যে। তরুণীর দৃষ্টি ছিল এতক্ষণ মঞ্চের দিকে; এবার আস্তে আস্তে সে দৃষ্টি ফিরে এল, তার দিকে মেয়েটি তাকালে।··· সারা রাত ঐ চোখ দুটি যেন তাকে হানা দিতে লাগলো। কৃত্রিম উপায়ে যে বাঁধ গড়া হয়ে ছিল, সে গেল ভেঙ্গে; সে উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠলো। এক জ্বরের ঘোর যেন লাগলো। ঠিক পরের দিনই সে ছুটলো মিখালেভিচের সঙ্গে দেখা করতে। তার কাছে সে খবর পেল, সুন্দরীর নাম বারবারা পাভ্‌লোভনা কোরোবিনা। যে দুজন বুড়ো-বুড়ীকে তাঁর সঙ্গে বক্সে সে দেখেছে, তাঁরা তার বাবা ও মা। আর মিখালেভিচের সঙ্গে তাদের পরিচয় দুবছর আগে কাউন্ট এন-এর ওখানে। সেখানে মিখালেভিচ ছিল গৃহশিক্ষক। সর্ববিষয়ে পাওা মিখালেভিচ বারবারা পাভ্‌লোভ্‌নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সে তাকে স্বর্গে তুললে। সে তার মসৃণ স্বরে বললে, শোন বাপু, আশ্চর্য মেয়ে সে, প্রতিভাও বলতে পার, যাকে বলে প্রকৃত শিল্পী—তাই। আর মনটিও ভারি দয়ালু। লাভ্রেৎস্কীর প্রশ্নে সে বুঝতে পারলো বারবারা তার মন জুড়ে বসেছে, সে তাই স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে রাজি হোলো। সে এও বললে, তাকে তাঁরা পরিবারের একজন বলেই মনে করেন। জেনারেল

মোটেই উন্নাসিক নন ; আর ওর মা তো একেবারে বোকা, তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। চাঁদ পনীর দিয়ে গড়া একথা যদি কেউ জোর দিয়ে বলে, তিনি তাই-ই বিশ্বাস করে নেবেন। লাভ্রেৎস্কী লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বিড়বিড় করে কি বললে, তারপর চলে গেল। পুরো পাঁচদিন ধরে সে তার ভীরুতার বিরুদ্ধে লড়াই করলে, তারপর ছ'দিনের দিন তরুণ স্পার্টান নতুন উর্দি চাপালে গায়ে, মিখালেভিচের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করলে। সে পরিবারের মানুষের মধ্যে গণ্য, তাই শুধু চুল আঁচড়ে নিল, তারপর তাকে নিয়ে কোরোবিনদের ওখানে গেল।

তেরো

বারবারা পাভ্‌লোভ্‌নার বাবা পাভেল পেত্রভিচ কোরোবিন একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর-জেনারেল। সারা জীবন তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চাকরীতে কাটিয়েছেন। যৌবনে ভাল নর্তক আর আদব-কায়দা দুরস্ত সৈনিক বলে তাঁর নাম ডাক ছিল। তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না বলে তিনি দু-তিনজন মাঝারি গোছের জেনারেলের য়্যাডজুটাণ্ট হয়ে প্রথম দিকে কাটাচ্ছিলেন। তারপর তাঁদেরই একজনের মেয়েকে বিয়ে করে যৌতুক পেলেন পঁচিশ হাজার রুবল্। সামারিক কুচকাওয়াজ আর ড্রিলের রীতিনীতি তখন তাঁর বেশ রপ্ত। এমনি ভাবেই চলছিলেন টেনে হিঁচড়ে বিশ বছর ধরে, এবার তিনি পেলেন জেনারেলের পদ ; একটা পল্টনের অধ্যক্ষতা তাকে দেওয়া হোলো। এইখানে পৌঁছেই তিনি চেষ্টার রাশ ঢিলে করে দিতে পারতেন, আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিতে পারতেন টাকাকড়ি ; আর তাই-ই তাঁর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার পরিকল্পনায় একটু ত্রুটি থেকে গেল। তিনি জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করবার এক নতুন উপায় বার করে ফেল্‌লেন—উপায়টি

অভিনব বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু যেখানে সতর্ক হবার প্রয়োজন ছিল না, সেখানেই সতর্ক হলেন বেশি, আর তারই ফলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হোল। সে এক বিশ্রী ব্যাপার, কেলেঙ্কারী ব্যাপার! জেনারেল কোনো গতিকে ছাড়া পেলেন, কিন্তু তাঁর জীবনের উন্নতির আশা তখন শেষ হয়ে গেছে, তাকে অবসর নিতে বলা হোল। আরো দুবছর তিনি সেণ্ট পিটার্স'বুর্গে ঘোরা ফেরা করলেন একটা ভাল পদের আশায়, কিন্তু কিছুই হোল না। তাঁর মেয়ে এরই মধ্যে কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছিল, খরচ বাড়ছিল দিন দিন···নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি মস্কৌ যাবেন বলে ঠিক করলেন, সেখানে অন্তত সস্তায় থাকা চলবে। তিনি স্টারো কোনিউশেনি ষ্ট্রীটে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিলেন, বাড়ীর সুমুখে বংশের প্রতীক আঁকা রইল, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মস্কৌ-এ বসবাস করতে লাগলেন। বার্ষিক আয় তার তখন দুহাজার সাড়ে সাতশো রুবল। মস্কৌ অতিথিবৎসলা নগরী,সমস্ত পৃথিবীকে সে সাদর আহ্বান জানাতে প্রস্তুত, তা এ তো একজন জেনারেল। তাই পাভেল পেত্রভিচকে শীগ্ গীরই মস্কৌর নানা বৈঠকখানায় দেখা গেল। তখনো সৈনিকোচিত দেহ সৌষ্ঠব তার আছে। তার ঘাড়ে এসে নামছে কলপ দেওয়া চুল, সস্ত য়্যান-এর স্মৃতিসূচক সামরিক চিহ্নের বিবর্ণ তকমা তিনি আঁটেন তার কালো পোষাকে। তিনি শীগগীরই নাচের আসরে তাসের টেবিলে ভিড় জমানো' নিষ্কর্মা যুবকদের কাছে পরিচিত হয়ে পড়লেন। কি করে সমাজে নিজের দাবীটুকু আদায় করতে হয় পাভেল পেত্রভিচ তা জানেন। তিনি কথা বলতেন কম আর অভ্যাসের বশে তা ছিল কিছুটা বা অনুনাসিক। অবশ্য তার উপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা কইতে হলে সে স্বর বদলে ফেলতেন। তিনি তাস খেলায় ছিলেন বিচক্ষণ, বাড়িতে পরিমিত আহার করতেন, আর নিমন্ত্রণে দু'জনের খাবার খেতেন একা। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই, তার নাম কাল্লোপিয়া

কার্লোভনা। তাঁর বাঁ চোখ সবসময়েই সজল; তারই জন্যে কার্লোভনা নিজেকে ভাবপ্রবণা বলে ভাবতেন। সব সময়েই তিনি উদ্বিগ্ন, মনে হোত তিনি বুঝি পরিমিত খেতে পান না। আঁটো মখমলের পোষাক পরতেন, আর মাথায় কালো টুপী, হাতে বিবর্ণ হলদে ব্রেসলেট। বারবারা পাভেল পেত্রভিচ আর কাল্লোপিয়া চারলোভ্‌নার একমাত্র মেয়ে। যখন সে কলেজ থেকে বেরুল, তখন তার বয়স সবে সতেরো বছর। কলেজে সে সেরা সুন্দরী বলে গণ্য না হোক, অন্তত সেরা বুদ্ধিমতী মেয়ে আর সেরা গায়িকা বলে তার খ্যাতি ছিল। সেখানে সে রাজকীয় মুদ্রা-অঙ্কিত উপাধি-সম্মান পায়। লাভ্রেৎস্কী যখন তাকে প্রথম দেখলো, তখন তার বয়েস উনিশও হয় নি।

চৌদ্দ

যখন মিখালেভিচ তাকে কোরোবিনদের অগোছালো বৈঠকখানায় নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে, স্পার্টার আদর্শে শিক্ষিত যুবক শিউরিয়ে উঠলো। কিন্তু স্নায়ুর এ বিহ্বলতা শীগ্‌গীরই চলে গেল। সাধারণত রুশদের আছে সহৃদয়তা, আর সেই সহৃদয়তা আরো বেড়ে ওঠে ভদ্রতায়। এই ভদ্রতা আবার খানিকটা ভ্রষ্ট চরিত্র মানুষের ভিতরেই বেশি দেখা যায়। জেনারেল গৃহিণী নিজের অস্তিত্ব যেন মুছে ফেললেন। বারবারা পাভ্‌লোভনা ধীর, স্থির, ব্যবহারে অনুপমা। তার সুমুখে যেন আপনা থেকেই মানুষ সহজ হয়ে আসে। সত্যই সুন্দর দেহ তার, তার হাসিমাখা চোখ দুটি, তার কাঁধের অপূর্ব ঢাল, রক্তাভ বাহু, লঘু অথচ মন্থর পদবিক্ষেপ, এমন কি তার স্বর—সেও যেন মধুরতার রেশ রেখে যায় বহুক্ষণ, এক লোভন মোহের সৃষ্টি করে। যেন ক্ষীণ সুগন্ধির মতোই তার ছলনা। মৃদু, কোমল সে; লজ্জায় সুমধুর, কথা তাকে ব্যক্ত করতে পারে

না, কিন্তু সে তো স্পন্দিত হয়ে উঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে—ভীরু অনুভূতি সে আনে না তো! লাভ্রেৎস্কী থিয়েটার প্রসঙ্গে আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিলে, গত কালের অভিনয় তার সূত্র। মেয়েটি অমনি মোচালভের কথা বলতে লাগলো, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস আর উল্লাসের ধ্বনিই নয়, কয়েকটি সঙ্গত মন্তব্যই সে করলো অভিনয় সম্বন্ধে। মেয়েদের পক্ষে শোভন আর বিশ্লেষনের পরিচায়ক সে-মন্তব্য। মিখালেভিচ এবার সঙ্গীতের কথা তুললে। সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে নিপুণ ভাবে বাজালে শোপাঁর কয়েকটি সুর। সেগুলি তখনকার অভিজাত সমাজে সবে চালু হয়েছে। নৈশ ভোজের সময় এলে লাভ্রেৎস্কী উঠতে গেল, তাকে পেড়াপীড়ি করা হোল থাকবার জন্যে। ভোজে জেনারেল তাকে চমৎকার লাফেৎ সুরা দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। জেনারেলের পরিচারক এই সুরা আনতে গাড়ি ভাড়া করে ছুটেছিল দেপ্রের মদের দোকানে। লেভ্রেৎস্কী রাত করেই সেদিন বাড়ি ফিরলো। বহুক্ষণ সে পোষাক পরেই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে রইল, তখন সে মোহমুগ্ধ। এই প্রথম সে অনুভব করলে, জীবন কিসে বাঁচবার উপযুক্ত হয়ে উঠে। তার সমস্ত অনুমান আর সংকল্প ভেসে গেল—সব কিছু তুচ্ছ আর অসার যেন—হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সব কিছু। সমস্ত সত্তা একই অনুভূতিতে তখন আচ্ছন্ন, একই কামনা —সে কামনা সুখের, অধিকারের, ভালবাসার—সে এক নারীর মধুর ভালবাসা চায়। সেইদিন থেকে কোরোবিনদের ওখানে সে প্রায়ই যেতে লাগলো। দু'মাস পরে সে তার প্রেম জানালে বারবারা পাভ্লোভ্নাকে, তার স্ত্রী হবার প্রস্তাব করলে। তার প্রস্তাব গৃহীত হোলো। জেনারেল বহুদিন আগে, এমন কি লাভ্রেৎস্কীর প্রথম আগমনের আগেই মিখালেভিচকে জিজ্ঞেস করে ছিলেন, লাভ্রেৎস্কী কতগুলি দাসের প্রভু। বারবারা পাভ্লোভনা যুবকের এই পূর্বরাগে

বা তার কাছে প্রস্তাব করবার সময়েও তার স্বাভাবিক ধীরতা হারায়নি, মনের প্রশান্তিও তার অটুটই ছিল। তবু বারবারা পাভ্লোভনাও জানতো তার পানিপ্রার্থী ধনী যুবক। আর কাল্লিয়োপা কার্লোভনা ভাবছিলেন, পার্টিতে পরবার জন্যে আমাকে একটা টুপী কিনতে হবে। আর তিনি আর একটা নতুন টুপী কিনেও ফেললেন।

পনেরো

তার প্রস্তাব গৃহীত হোল, কিন্তু কয়েকটি সর্ত ছিল। প্রথমে লাভ্রেৎস্কীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া এখুনি ছাড়তে হবে। কোন্ মেয়েই বা একজন ছাত্রকে বিয়ে করতে চায়! জমিদার, ধনী—তার এ কি অদ্ভুত শখ! স্কুলের ছেলের মতো ছাব্বিশ বছর বয়েসে পড়াশুনো করছে? দ্বিতীয়তঃ বারবারা পাভলোভ্না নিজের বিয়ের সাজ-সরঞ্জাম নিজে কিনবে, এমন কি, বর যে বিবাহের উপহার দেবে তাও সে-ই পছন্দ করে দেবে। ব্যবহারিক জ্ঞান তার যথেষ্ঠ, আর আছে সুরুচি; সুখে স্বচ্ছন্দ্যে থাকবার কামনা উগ্র আর সেগুলি সংগ্রহ করার নৈপুণ্যও আছে তেমনি। লাভ্রেৎস্কী তো তার এই নৈপুণ্যে বিস্মিত হোলো। বিয়ের পরেই তারা লাভ্রিকীর উদ্দেশ্যে নতুন কেনা গাড়ীতে চড়ে যাত্রা করলে। গাড়ীখানি বেশ আরামদায়কই বটে। তার চারদিকে তখন বারবারা পাভ্লোভনার সুচিন্তিত উদ্‌যোগের বিচিত্র আয়োজন। সুন্দর পোষাকের বাক্সে ঘরের কোণগুলি ভরে উঠেছে। কি সুন্দর প্রসাধন দ্রব্যের জিনিসগুলি আর কফির পাত্র! আর কি চমৎকার কফি তৈরী করে বারবারা ভোর বেলা!

লাভ্রেৎস্কীর তখন এসব দিকে দৃষ্টি নেই; সে সুখী, সে শিশুর মতো আনন্দের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে···সে সত্যিই তখন শিশুর মতো সরল। আর তার আরাধ্যা তরুণী স্ত্রী কি আনন্দের

বস্তু নয়—সে কি কামনার গোপন প্রতিশ্রুতি বয়ে আনে নি, আনে নি কি অব্যক্ত আনন্দের আহ্বান? সে তে প্রতিশ্রুতির চাইতে বেশিই দিয়েছে। লাভ্রিকীতে তারা এলেন গ্রীষ্মকালে। বারবারার কাছে বাড়ীখানা নোংরা আর অন্ধকার বলে মনে হোলো। ভৃত্যরা এখানকার সেকেলে, হাস্যকর তাদের ব্যবহার। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী বলেই স্বামীকে কোনো কথা বললেন না। তিনি যদি লাভ্রিকীতে থাক্‌তে চাইতেন, সবকিছুই তাহলে পালটে দিতেন। বাড়ীখানার সংস্কার দিয়েই শুরু হোত তার প্রথম কাজ। কিন্তু এই মানুষ-বর্জিত স্তেপ অঞ্চলে থাকার কথা একবারও তার মনে হয় নি। তিনি তো ক'দিনের জন্য এসেছেন আনন্দের সমারোহ নিয়ে ; নীরবে সয়ে যাবেন সব অসুবিধে, তাই নিয়ে সেখানে হাসি-ঠাট্টাও করবেন, ব্যঙ্গে মুখর হয়ে উঠবেন। মারফা দিমোফিয়েভ না তাঁদের দেখতে এলেন। বারবারার তাঁকে ভাল লাগলো, কিন্তু তিনি বারবারাকে পছন্দ করতে পারলেন না। নতুন মনিবানী গ্লাফিরা পেত্রভ্‌নার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও পারলেন না। তিনি যদি বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে হাত দিতে না ইচ্ছুক হতেন, যদি চুপ করেই থাকতেন, তাহলে গোলমাল হোত না। কিন্তু পাভেল পেত্রভিচ বৈষয়িক ব্যাপারে হাত দিতে এলেন। তিনি তো একথা স্পষ্টই বললেন, এমন নিকট আত্মীয়ের জমিদারী পর্যবেক্ষণ একজন জেনারেলের পক্ষেও অসম্মানের ব্যাপার নয়। আর এটা তো বোঝাই যায় যে, পাভেল পেত্রভিচ একজন নিতান্ত অচেনা লোকের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেও তখন রাজী। বারবারা পাভ্‌লোভনা নিপুণ-ভাবে আক্রমণ চালালেন। নিজে তিনি পুরোভাগে এলেন না, তিনি যেন রইলেন তার মধুচন্দ্রের আনন্দে ডুবে। গ্রাম্য জীবনে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন, গানে, পড়ায় মগ্ন হয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে তিনি গ্লাফিরাকে উত্তেজিত করে তুললেন। একদিন লাভ্রেৎস্কীর পড়বার ঘরে ছুটে এলেন গ্লাফিরা। উত্তেজিত হয়ে, চাবির থোলো টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, তিনি

আর গৃহস্থালির ভার নিতে পারবেন না, এখানে বাস করতেও তিনি রাজি নন। এই জরুরী অবস্থার জন্যে আগেই লাভ্রেৎস্কীকে তৈরী করে রাখা হয়েছিল, তিনি তখনি তাঁর চলে যাওয়ার মত দিলেন। গ্লাফিরা পেত্রভনা এতখানি আশা করেন নি। তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন, 'বেশ তো, মনে হচ্ছে আমি এখানে আর পাঁচজনের মতোই। জানি, কে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে আমার বাড়ী থেকে। শুধু একটা কথা শোন ভাইপো,—তুমি নিজেও কোথাও ঘর বাঁধতে পারবে না—চিরদিন ভবঘুরে হয়ে কাটাবে। এই কথাই আমি বলতে চাই—আর কিছু নয়।' সেই দিনই তিনি তার নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিবে গেলেন, আর তার এক সপ্তাহ পরে এসে পৌছলেন জেনারেল কোরোবিন। তাঁর ভাবখানা গম্ভীর, কিন্তু প্রসন্নতা সেখানে প্রচ্ছন্ন। তিনি সমস্ত জমিদারীর ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বারবারা পাভ্লোভ্না তার স্বামীকে নিয়ে চলে এলেন সেণ্টপিটার্সবুর্গে। দুটি শীত কাটালেন তারা সেখানে (গ্রীষ্ম কেটে গেল জারাইস্কায়েসেলোতে)। সেখানে সুন্দর, হাওয়া খেলে এমনি এক সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে বাসা বাঁধলেন। মধ্যবিত্ত এমন কি অভিজাত সমাজেও বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। এখানে ওখানে যাওয়া আসা, ভোজ দেওয়া, গানের জলসা, নাচের মজলিস বসালেন। আগুনের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে তেমনি বারবারা অতিথিদের আকৃষ্ট করতে লাগলেন। এমন উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রা ফিওদর পেত্রভিচের রুচি-বিরুদ্ধই ছিল। তার স্ত্রী তাকে সরকারী চাকরী নিতে পরামর্শ দিলেন। বাবার স্মৃতি তার মনে, তার নিজেরও ঝোঁক ছিল অন্যদিকে; তাই সরকারী চাকরী সম্বন্ধে তার ছিল বিতৃষ্ণা কিন্তু বারবারা পাভলোভ্নার জন্যেই সেণ্টপিটার্সবুর্গে তিনি রয়ে গেলেন। আর শীগ্গীরিই টের পেলেন তার নিরালায় অবস্থানকে কেউ বাধা দেবে না। আর তার কি

শান্ত আরামদায়ক পড়বার ঘর রচিত হয়নি সেণ্টপিটার্সবুর্গে, তার স্ত্রী কি এবিষয়ে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নন? তারপর থেকে দিনগুলি ভালই কাটতে লাগলো। তার সেই অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। আবার পড়া শুরু হোল। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা চললো। বড় অদ্ভুতই লাগলো, যখন দেখা গেল তার চওড়া কাঁধ দুটি যেন লেখার টেবিলের উপর চিরতরে ঝুঁকে আছে, তার দাড়িওয়ালা লাল মুখ অভিধানের আড়ালে লুকিয়ে রাখছেন, কখনো বা নোট বইয়ের পাতার ভিতরে ঝুঁকে পড়ছেন। সকালবেলা কাটতো পড়াশুনায়, তারপরে দুপুরের ভোজ (বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না গৃহিণী হিসাবে সুনিপুণাই ছিলেন)। রাতে তিনি এসে প্রবেশ করতেন এক মোহময়, সুগন্ধী, আলো-ঝলমল জগতে। সেখানে তরুণ আনন্দময় মুখের ভিড়—আর সেই জগতের মধ্যমণি সেই নিপুণা গৃহকর্ত্রী যিনি তার স্ত্রী। তিনি তাকে একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে সুখী করলেন। কিন্তু বেচারী শিশু ক্ষীণ আয়ু নিয়ে এসেছিল। বসন্তকালে সে মারা গেল, আর গ্রীষ্মে ডাক্তারের পরামর্শ মতো লাভ্রেৎস্কী তার স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশে স্বাস্থ্যনিবাসে চলে গেলেন। এমনি দুঃখের পরে মনকে তার একটু ভুলিয়ে রাখা দরকার; আর উষ্ণ জল-হাওয়ায় স্বাস্থ্যও ভাল হতে পারে। গ্রীষ্ম আর হেমন্ত তারা কাটালেন জার্মানী আর সুইজারল্যাণ্ডে, আর শীতে যেখানে যাওয়া দরকার, সেই প্যারীতেই গেলেন। প্যারীতে বারবারা পাভ্‌লোভনা গোলাপের মতোই বিকশিত হয়ে উঠলেন, এখানে তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গের মতোই সুনিপুণভাবে ছোটখাটো এক নীড় বাঁধলেন। শহরতলীর নিরালায় বিলাসীদের পাড়ায় সুন্দর একখানা বাড়ি খুঁজে নিলেন; স্বামীকে এমন এক ড্রেসিঙ্‌ গাউন তৈরী করিয়ে দিলেন যা তিনি আগে কখনো পরেন নি। এক ছিমছাম দাসী, একটি রাঁধুনি আর সুশ্রী ভৃত্য রাখলেন, একটি সুন্দর পিয়ানোও কিনে ফেললেন। এক হপ্তা পরেই তাকে শালের

জামা পরে বেঁটে ছাতা খুলে হাত দস্তানায় ঢেকে রাস্তা পার হতে দেখা গেল, তখন তিনি খাঁটি প্যারীর বিলাসিনী। শীগ্‌গীরই তার এক পরিচিত মহল তৈরী হয়ে গেল। প্রথমে শুধু রুশরাই আসতেন, এবার এলেন ফরাসীরা ; অতি ভদ্র ও নম্র, বিলাসী অবিবাহিতের দল। ব্যবহার তাদের সুন্দর, নাম অতি সুন্দর—শুনতে ভালই লাগে। ওরা সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতেন. অভিবাদন জানাতেন সহজ ভঙ্গীতে—চোখ কোঁচকাতেন, ভ্রূকুটি তাতে থাকত না। তাদের রক্তাভ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝলসে উঠত সাদা দাঁতগুলি—হাসিতে তো তারা ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রতিজনই তার বন্ধুদের আবার জুটিয়ে নিয়ে আসতেন। তাই সুন্দরী মাদাম দ্য লাভ্রেৎস্কী চৌসে দ্য আঁত্তি থেকে রুয়ে দ্য লিল্‌ অবধি পরিচিত হয়ে পড়লেন। সেকালে (১৮৩৬ সাল তখন চলছে) এখনকার মতো সাংবাদিক আর সংবেদকের এত ভিড় লাগেনি। এখন তো পিপড়ের ঢিবিতে ছাড়া পিপড়ের গাঁদির মতোই তারা ভিড় করে আছে। কিন্তু তখনোও কে-এক জ্যুলে বারবারা পাভ্‌লোভ্‌নার মজলিশে আসতেন। ভদ্রলোক তিনি বটেই. কিন্তু মুখখানা তার হতশ্রী, আর কুযশও যথেষ্ট অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন উদ্ধত, আর ঘৃণিত জীব। বারবারা পাভ্‌লোভনার তাকে খারাপই লাগলো, কিন্তু তিনি কতগুলি সংবাদপত্রে লিখতেন আর তার নামও কাগজে প্রায়ই ছাপাতেন বলে তাকে মজলিশে মাদাম বরণ করে নিলেন। কখনো বা তার নাম মাদাম দ্য লাভ্রেৎস্কী··· কখনো বা রুয়ে দ্যপির বিখ্যাত মাদাম বলে উল্লেখ থাকতো—এমনি করে সারা পৃথিবীকে তিনি জানাচ্ছিলেন তার নাম—পৃথিবী না হোক কয়েক শো গ্রাহককে তো বটেই। অথচ তাদের মাদাম লাভ্রেৎস্কী সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই ছিল না। কিন্তু তার লেখার বিরাম ছিল না। তিনি লিখতে লাগলেন, মাদাম হচ্ছেন সুন্দরী, দয়াবতী মহিলা, ফরাসিনীদের মতো তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ফরাসীদের এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর নেই !—সঙ্গীতে

তার কি অপূর্ব প্রতিভা, আর কি সুন্দরই না তিনি ওয়ালৎস নাচেন, (বারবারা সত্যিই ওয়ালৎস নেচে সমস্ত হৃদয়গুলিকে তার উড়ন্ত স্কার্টের প্রান্তে এনে আছড়ে ফেললেন); এক কথায় তিনি তার খ্যাতি বিদেশে ছড়িয়ে দিলেন। আর সে তো নিশ্চয়ই সুখী করবার মতোই কাজ, খুশি করবার মতোই কাজ। মাদামোয়াজেল মারস্ তখন মঞ্চ ছেড়ে চলে গেছেন, মাদামোয়াজেল রাচেল তখনো আসেন নি, কিন্তু তবু বারবারা পাভ্‌লোভনা থিয়েটারে যেতে লাগলেন। ইতালীয় সঙ্গীতে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, ওদ্রি তখন তার প্রতিভার ভগ্নাবশেষ নিয়ে কমেডি ফ্রাঁসোয়াতে হাই তুলছেন। তিনি তাতেই হেসে লুটোপুটি খেলেন, মাদাম দরভাল্-এর অতি রোমান্টিক উচ্ছাসবহুল অভিনয়ে তার চোখে ধারা বইল। আর সবার সেরা হোল—লিৎজ্ তার মজলিশে দু-দুবার এসে বাজিয়ে গেলেন। এত সাদাসিধে, চমৎকার মানুষটি—তিনি নিয়ে এলেন যেন এক রোমাঞ্চের শিহরণ। এমনি আনন্দে শীত চলে গেল। এমন কি, শীতের শেষে রাজসভায় তাঁকে পরিচিত করা হোলো, হাজির করা হোলো। ফিওদর ইভানিচেরও একঘেয়ে লাগছিল না। কখনো কখনো জীবন দুর্বহ হয়ে পড়ছিল শুধু শূন্যতায়। শোরবোনে তিনি বক্তৃতা শুনছিলেন, পড়ছিলেন, আর চেম্বারের বিতর্কে হাজ্‌রেও দিচ্ছিলেন। সেচ-ব্যবস্থার উপরে বিখ্যাত একখানা বইও তিনি অনুবাদ করতে লাগলেন। ভাবলেন, আমি তো আমার সময় বয়ে যেতে দিচ্ছেনা, সময় কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু সামনের শীতে আমাকে রাশিয়ায় যে করে হোক ফিরতে হবে, কাজ শুরু করতে হবে। কাজটা কি, স্পষ্ট ধারণা ছিল কিনা বলা শক্ত। আর ঈশ্বরই জানেন, শীতে রাশিয়ায় তার ফেরা সম্ভব হবে কিনা—যাহোক, এরই মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি চললেন ব্যাডেন-ব্যাডেন।…এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে তাঁর সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।

ষোল

একদিন বারবারা পাভ্‌লোভনা নেই, তিনি হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে পড়লেন। লাভ্রেৎস্কী দেখলেন মেঝের পরিপাটি করে ভাঁজ-করা একখানা কাগজ পড়ে আছে। তিনি কলের পুতুলের মতো তুলে নিলেন কাগজখানা ; ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলেন। ফরাসীতে লেখা :

আমার প্রিয়তমা বেৎসি, আমার দেবী! (তোমাকে বার্ব বা বারবারা ডাকতে মন তো চায় না)। তোমার প্রতীক্ষায় বুলেভারের কোণে বৃথা কেটে গেল। কাল দেড়টায় সময় আমাদের ছোট নীড়ে আসবে তো! তোমার অমায়িক মোটাসোটা স্বামীটি তো তখন বইয়ে মগ্ন থাকেন। আমরা গাইব তোমাদের কবি পুশকিনের সেই গান। সে-গান তো তুমি আমায় শিখিয়েছ—সেই যে বৃদ্ধ স্বামী ; নিষ্ঠুর স্বামী! তোমার খুদে হাতে আর পায়ে রইল আমার হাজার চুমু। আর তোমারই প্রতীক্ষায় রইলাম আমি। —আর্নেস্ট

লাভ্রেৎস্কী চিঠির তাৎপর্য যেন বুঝতে পারলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার পড়লেন—আর্নেস্ট! মাথা ঘুরছে, মেঝে যেন ঢেউয়ে ভেসে-চলা জাহাজের মতোই দুলে দুলে উঠছে। চীৎকার করে উঠলেন ; কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে, তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন!

একেবারে বুঝি পাগলই হয়ে গেলেন। অন্ধের মতো স্ত্রীকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, প্রতারণার সম্ভাবনা, বিশ্বাসঘাতকতা, এসব তার মনে কখনো ঠাঁই পায়নি। তার স্ত্রীর প্রেমিক এই আর্নেস্ট একটি তেইশ বছরের তরুণ। নাকটা থাঁদা, মুখে সরু গোঁফ—তাঁর স্ত্রীর পরিচিতদের ভিতরে একেবারে সাধারণ। কয়েকমুহূর্ত চলে গেল—তারপরে আধঘণ্টা—লাভ্রেৎস্কী দাঁড়িয়ে রইলেন। তার হাতের মুঠোয় চেপে আছেন সেই নিয়তির নির্দেশ

চিঠিখানি ; শূন্য দৃষ্টি মেঝের উপর, অন্ধকারের ঘুর্ণি উঠছে, তারই ভিতরে দেখতে পেলেন মুখের মিছিল। তারা তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার বুকখানা ব্যথায় সঙ্কুচিত ; তিনি যেন এক অতল গহ্বরে নেমে চলেছেন, নামার বিরাম নেই। হঠাৎ রেশমের পোশাকের পরিচিত খস্‌খস্‌ শব্দ তাকে অবসাদ থেকে জাগিয়ে তুললো। বারবারা পাভ্‌লোভনা বেড়িয়ে ফিরেছেন, তার গায়ে শাল, মাথায় টুপী। লাভ্রেৎস্কী শিউরে উঠলেন—পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে কেপে উঠলো। এবার তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তার মনে হোলো, এই মুহূর্তে তিনি তাঁকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেলতে পারেন, পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারেন, বা চাষার মতো নিজের হাতে গলা টিপে ধরতে পারেন। বারবারা পাভ্‌লোভনা অবাক হয়ে তাকে হাসাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি তখন পাগল। শুধু অস্ফুট স্বরে 'বেৎসী' এই কথাটি বলে তিনি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

লাভ্রেৎস্কী একখানা গাড়ী ভাড়া করে গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন, শহরের বাইরে তাকে নিয়ে যেতে। বাকি দিন আর সারা রাত এমনি ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। বার বার হাসেন, আর হতাশার ভঙ্গীতে হাত দুখানা ছোড়েন ; কখনো বা পাগলের মতো করেন, কখনো বা হঠাৎ সব কিছুই কৌতুককর বলে মনে হয় ; একটু বা খুশিই হয়ে ওঠেন। ভোরের দিকে তার মনে হোল শীতে জমে গেছেন। তিনি এবার শহরতলির একটা বাজে হোটেলে ঢুকে পড়ে একখানা ঘর ভাড়া চাইলেন। জানালার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। হাই উঠছে। দাঁড়াবার শক্তিও বুঝি তখন নেই। শক্তি নিঃশেষিত, বুঝি বা পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু তবু তো নেই ক্লান্তিকর অনুভূতি। তবুও ক্লান্তি চেপে বসেছে দেহে। চেয়ে রইলেন শূন্য দৃষ্টি মেলে, কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না। কি হোলো তার—তাও বোঝা যাচ্ছে না। কেন তিনি একা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেন অবসাদ—কেন মুখে তিক্ত স্বাদ—বুকে জগদ্দল পাষাণের ভার কেন?

কে বলবে, কেন তিনি এই শূন্য ঘরে, এই অচেনা পরিবেশে বসে আছেন? ভেবে পেলেন না, কেন বারবারা নিজেকে ঐ ফরাসীটার কাছে বিকিয়ে দিলে—আর নিজেকে বিশ্বাসহন্ত্রী জেনেও সে কেন ধীর-স্থির, স্নেহশীলা? সে তেমনি আগের মতো সুরেই কথা কয়—কেন নির্ভরতা বেজে ওঠে তার স্বরে? শুষ্ক ঠোঁট থেকে ফিসফিসানি ঝরে পড়লো, 'না, আমি বুঝি না, বুঝতে পারি না! কে বলবে, ও সেণ্টপিটার্সবুর্গে এমনি করেনি…' প্রশ্ন অসমাপ্ত রয়ে গেল। আবার হাই উঠছে। কেঁপে উঠছে মাথা থেকে পা অবধি। আনন্দ আর দুঃখের স্মৃতির হুল ফুটছে—বেদনা উথলে উঠছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো, এই তো কয়েক দিন আগে, ও তার আর আর্নেস্ট এর সুমুখে পিয়ানো বাজিয়ে গেয়েছিল 'বৃদ্ধ, বৃদ্ধ স্বামী আমার, নিষ্ঠুর স্বামী আমার!' ওর মুখখানা মনে পড়লো। চোখে অদ্ভুত দীপ্তি, গালে লজ্জার লালিমা! লাফিয়ে উঠলেন তিনি। ওদের কাছে গিয়ে বলতে হবে, 'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি। আমার প্রপিতামহ এক সময়ে চাষীদের ধরে ধরে ফাঁসি লটকাতেন, আর আমার দাদামশাই ছিলেন নিজেই চাষী'—তারপর ওদের খুন করবেন। আবার মনে হোল, এ এক স্বপ্ন, হয়তো বা স্বপ্নও নয়, এক অসম্ভব নির্বুদ্ধিতা—তাকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, চারদিকে তাকিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। খতিয়ে দেখতে বসলেন তিনি। বাজপাখী যেমন করে শিকারের দেহে নখ বসিয়ে দেয়, তেমনি করে আত্মার গভীরে ব্যথার দাগ বসে যাচ্ছে। আর সবার চেয়ে বড় কথা, লাভ্রেৎস্কী আর কয়েক মাস পরে বাবা হবেন, সেই আশায় কাটছিল দিন। তার অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্ত জীবন বিষাক্ত হয়ে গেল। …আর কি হবে, তিনি প্যারীতে ফিরে এসে এক হোটেলে ঘরভাড়া নিলেন। আর্নেস্ট-এর চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলেন বারবারা পাভ্লোভনার কাছে; সঙ্গে আর একখানা চিঠি:

ভিতরের এই কাগজের টুকরোটুকু থেকেই সব কথা জানতে পারবে। আমি বলি, এটা তোমার মতো সাবধানী মেয়ের উচিত হয়নি, এমন জরুরী চিঠি কিনা ফেলে দিয়েছিলে! (বেচারী লাভ্রেৎস্কী এই কথাটি বহুক্ষণ ধরে আওড়াচ্ছিলেন) আর তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে না। আমার তো মনে হয় তোমারও দেখা করার জন্যে পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। পনেরো হাজার ফ্রাঙ্কের বাৎসরিক বৃত্তি আমি তোমার জন্যে ধার্য করলাম; এর বেশি পারব না। উকীলের কাছে ঠিকানা পাঠিয়ো। যা খুশি কর, যেখানে খুশি থাক, তোমার সুখই আমার কামনা। উত্তরের প্রয়োজন নেই।

লাভ্রেৎস্কী লিখলেন, উত্তরে তাঁর প্রয়োজন নেই···কিন্তু তিনি উত্তরের আশায় পথ চেয়ে রইলেন, ক্ষুধার্তের মতো হাহাকার উঠলো তার বুকে। অসম্ভব ব্যাপারের সমাধান তো চাই। এর রহস্য যে দুর্ভেদ্য। বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না উত্তরে ফরাসী ভাষায় এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এ যেন শেষ আঘাত, সংশয়ের আর অবকাশ রইল না। সংশয় ছিল বলে তিনিই লজ্জিত হলেন। বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না নিজের পক্ষ সমর্থন করেন নি। তার শুধু ইচ্ছে, তিনি একটি বার দেখা করতে চান। অলঙ্ঘনীয় আদেশ যেন তিনি জারী না করেন এই তার অনুরোধ। চিঠিতে উচ্ছ্বাস নেই, আছে সুমিত সংযম, তবু এখানে ওখানে চোখের জলের দাগ রয়ে গেছে। লাভ্রেৎস্কী হাসলেন, এ হাসি তিক্ততায় রূঢ়, ভয়ঙ্কর। পত্র-বাহককে জানালেন, সে যেন গিয়ে বলে, সব ঠিক আছে। তিনদিন পরে তিনি আর প্যারীতে রইলেন না, রাশিয়ায় না ফিরে চলে গেলেন ইতালীতে। কেন যে ইতালী পছন্দ হোল নিজেই জানতেন না। কোথায় যাবেন, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও নেই—বাড়ি ফিরতে হোল না এইটুকুই যথেষ্ট। নায়েবকে লিখলেন, স্ত্রীর মাসোহারা যেন নিয়মিত পাঠায়; আর জেনারেল কোরোবিনের হাত থেকে যেন এখুনি জমিদারীর

ভার নিয়ে নেয়। হিসেব-নিকেশের জন্য দেরী যেন না হয়। জেনারেলের বিদায়ের বন্দোবস্তও যেন সে করে। চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠলো, বরখাস্ত জেনারেলের অসন্তোষ, আর ক্ষুন্ন মর্যাদার প্রতিচ্ছবি। মনে মনে খানিকটা খুশিই হলেন, এ যেন অসূয়া-প্রণোদিত সন্তোষ। তিনি গ্রাফিরা পেত্রভ্‌নাকে লাভ্রিকীতে ফিরে আসার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিলেন, তাকে সম্পত্তি দেখবার হুকুমনামাও পাঠালেন। গ্রাফিরা পেত্রভ্‌না লাভ্রিকীতে ফিরলেন না, তিনি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, হুকুমনামা বাতিল হোল, এ ব্যাপারে হাত দিতে তিনি নারাজ। ইতালীর এক ছোট্ট শহরে দিন কাটাতে লাগলেন লাভ্রেৎস্কী। অজ্ঞাত বাসের জীবন। তার তখন ইচ্ছা, স্ত্রীর খবর নেন। খবরের কাগজ থেকে তিনি সংগ্রহ করলেন, তিনি প্যারী ছেড়ে বাডেন-বাডেনে আছেন। মঁসিয়ে জ্যুলের লেখা এক রচনায় শীগ্‌গীরই তার নাম দেখা গেল। চটুল ভাষার আড়ালে তিনি আবিষ্কার করলেন বন্ধুর জন্যে বন্ধুর দরদ। পড়তে পড়তে ফিওদর ইভানিচ বিতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে গেলেন। একদিন আবার দেখলেন, তার একটি মেয়ে হয়েছে। দু-মাস পরে নায়েব জানালো, বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না তার তিন মাসের মাসোহারা আদায় করে নিয়েছেন। এবার জোর গুজবের পালা। নিন্দা চরমে পৌছলো। এক হাস্যকর গল্প তৈরী হল, কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। তার স্ত্রী সে-কুৎসার কেন্দ্র, তার তখন এক অদ্ভুত ভূমিকা। তারপর সবশেষ। বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না কুখ্যাতি কিনে ফেললেন সমাজে।

লাভ্রেৎস্কী তখন আর খবর রাখছেন না; বহুদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। কখনো কখনো স্ত্রীর প্রতি কামনা তাকে পেয়ে বসতো, তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে তখন প্রস্তুত। এমন কি তখন তাকে ক্ষমা করতেও রাজি—তখন তিনি তার সেই কোমল স্বর শুনতে চাইতেন, নিজের হাতে চাইতেন তার হাতের স্পর্শ। সময়ে সবই সয়ে গেল। তিনি যে

দুঃখ সয়েই জীবন কাটাবেন তা তো তার ভাগ্যে লেখা ছিল না। তার বলিষ্ঠ মন আবার নিজকে জাহির করলো। চোখ খুলে গেল, আঘাত আকস্মিক বলে মনে হোল না। তিনি নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারলেন। আমরা প্রিয়জনকে যখন বিদায় দিই, তখন তাকে চিনতে পারি। আবার পড়াশুনো শুরু হোলো আর কাজ। কিন্তু আগের মতো উৎসাহ আর তখন নেই। ছোট বেলার শিক্ষা আর জীবনের দুর্দৈবে যে অবিশ্বাস বাসা বাঁধলো, সে তো চিরদিনের মত রয়ে গেল মনে। সবকিছু সম্পর্কেই তিনি তখন উদাসীন। এমনি করে চার বছর কেটে গেল। এবার তার মনে হোল, বাড়ি ফেরবার মতো সাহসও তার হয়েছে। নিজের আত্মীয়-স্বজনের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াবার মতো মনের বল তার ফিরে এসেছে। সেণ্টপিটার্স বুর্গ কি মস্কৌতে না থেমে তিনি একেবারে ও—শহরে এসে হাজির হলেন। এইখানেই আমরা কিছুক্ষণ আগে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। আবার এইখানেই আমাদের ভদ্র পাঠককে অনুরোধ করছি তিনি ফিরে আসুন—আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসুন।

সতেরো

পরের দিন সকাল তখন দশটা হবে, লাভ্রেৎস্কীকে দেখা গেল কালিতিনের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। লিজা তখন টুপী আর দস্তানা পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

প্রার্থনা-সভায়। আজ রোববার।

তুমি গীর্জায় যাও?

লিজা নির্বাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমাকে মাপ কর লিজা, লাভ্রেৎস্কী বললেন, আমি কিছু মনে করে বলিনি। আমি বিদায় নিতে এসেছিলাম। আর এক ঘণ্টার ভিতরেই গ্রামে চলে যাচ্ছি।

এখান থেকে খুব দূরে নয়, তাই না? লিজা শুধালো।

প্রায় পচিশ ভার্স্ট হবে।

লেনোচকা একজন পরিচারিকার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

লিজা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, আমাদের ভুলে যাবেন না।

আমাকেও ভুলে যেও না। আর দেখ, যখন গীর্জায় যাচ্ছ—আমার জন্যে প্রার্থনা করবে তো?

লিজা থেমে গেল, মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, সহজ তার দৃষ্টি।

আপনার যদি ইচ্ছে হয়, তাই করব। লেনোচকা, চল, চল!

বসবার ঘরে লাভ্রেৎস্কী মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকে একা পেলেন। অ-ত্য কোলোঁ আর পিপারমেণ্টের গন্ধ আসছে। মাথা ধরার কথা বললেন। কাল রাতটা ভয়ানক যন্ত্রণায় কেটে গেছে। তেমনি অলস সৌজন্যে তিনি তাকে অভ্যর্থনা করলেন, তারপর আস্তে আস্তে শুরু হোল আলাপ।

ভ্লাদিমির নিকোলাই চমৎকার ছেলে—তোমার তা মনে হয় না? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

কোন্ ভ্লাদিমির নিকোলাইয়ের কথা বলছ?

কেন, পানসীনকে দেখ নি। সে তো কাল এখানে ছিল। তোমাকে তো তার খুব ভালো লেগেছে। ভাই শোন, তোমাকেই কথাটা গোপনে বলি। ছেলেটি আমার লিজার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে; তা বংশ ভালো, জীবনে উন্নতিরও খুব আশা। খুব চালাক ছেলে। যদি ভগবানের ইচ্ছে হয়···আমি মা, আমি তো বলতে পারি—আমি খুব খুশিই হব। এ এক বিরাট দায়ীত্ব—ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বাপ-মার উপরই নির্ভর

করে। এর থেকে রেহাই নেই। এই তো আমি এখানে একা পড়ে আছি, সবকিছুই নিজে করছি—ছেলেমেয়েদের পালন করা, লেখানো-পড়ানো সব কিছু। আমি ছাড়া কেই বা করবে? এই তো এক ফরাসী গভর্নেসও রেখে দিয়েছি।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না মার হৃদয়ের উদ্বিগ্নতা আর অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে বসলেন। লাভ্রেৎস্কী নীরবে শুনছেন, হাত দিয়ে দোমড়াচ্ছেন টুপিটা। তার উদাসীন দৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন ভদ্রমহিলা।

লিজাকে তোমার কেমন লাগে? তিনি বললেন।

এলিজাবেথা মিখাইলোভনা চমৎকার মেয়ে, লাভ্রেৎস্কী জবাব দিলেন। তিনি এবার উঠে নমস্কার করে মারফা দিমোফিয়েভ্নার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তার দিকে মারিয়া অসন্তুষ্ট হয়ে তাকিয়ে ভাবলেন, বেহাদ্দ কাটখোট্টা, একেবারে চাষী! এখন তো বুঝতে পারছি, ওর স্ত্রী কেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

মারফা দিমোফিয়েভ্না তার ঘরে নিজের পরিজন নিয়ে বসেছিলেন। পাঁচটি তার পরিজন, প্রিয়জনও তারা বটে। একটা বুলফিঞ্চ, তার শীস দেওয়া এখন বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাকে তিনি ভালবাসেন। এক ভীরু খুদে হাড় জিড়জিড়ে কুকুর, নামটি তার রোস্কা; একটা তিরিক্ষি মেজাজের বেড়াল, নাম ম্যাট্রন; একটি চঞ্চল মেয়ে, মস্ত তার চোখ আর টিকলো নাক, নাম তার সুরোচকা; আর আছে এক পঞ্চান্ন বছরের বুড়ী। সে সাদা টুপী পরে, কালো পোষাকের উপর পরে ধূসর রঙা কোর্তা। নাম তার নাস্তাশিয়া কারপোভ্না ওগারকোভা। সুরোচ্কা ছোট জাতের মেয়ে, অনাথা সে। মারফা তাকে দয়া করে রোস্কার মতোই পালন করছেন। মেয়ে আর কুকুরটাকে তিনি পথেই পেয়েছিলেন। দুজনই তখন ক্ষুধার্ত, আর জীর্ণশীর্ণ, হেমন্তের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রোস্কা হারিয়ে যায় নি, পথের কুকুর পথে পড়েই

ভিজছিল। কিন্তু সুরোচ্‌কাকে ইচ্ছে করেই তার কাকা মাতাল মুচীটা ফেলে গিয়েছিল। তার নিজেরই তখন খাবার জোটে না এমনি অবস্থা। ভাইঝি তো খাবার পেতই না, বরং লাশের বাড়ি খেত রোজ। নাস্তাশিয়া কারপোভ্‌নার সঙ্গে পরিচয় হয় এক গীর্জায়। দেখা হোল, দুজনে আলাপ করলেন, তারপর মারফা তাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। সেই থেকেই সে আছে। নাস্তাশিয়া আমুদে, নরম স্বভাবের স্ত্রীলোক, নিঃসন্তানা বিধবা; গরীব। পাকা চুলে ভরা গোলগাল তার মাথাটি, সাদা নরম দুখানি হাত, মুখখানা বড় কোমল। মারফা দিমোকিয়েভ্‌নার উপর তার শ্রদ্ধাও খুব। মারফাও এই জন্যেই তাকে ভালবাসেন, একটু বা ঠাট্টাও করেন তার স্বভাব নিয়ে। নাস্তাশিয়ার যুবকদের উপর যথেষ্ট দুর্বলতা; একটু নির্দোষ ঠাট্টায়ও সে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ওর জীবনের সঞ্চয় মোট বারোশো রুবল। মারফার খরচেই খায় দায়, থাকে—তবুও পদ-মর্যাদা তার সমান। মারফা দাসত্বে কাউকে দাবিয়ে রাখতে চান না। লাভ্রেৎস্কীকে দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন; 'আরে ফিদিয়া, এস, এস! কাল রাতে আমার পরিজনদের সঙ্গে দেখা হয় নি—এই তো আমরা সবাই আছি—চা খেতে জড়ো হয়েছি। ছুটির দিনের চা পর্ব আর কি! সবাইকেই তুমি আদর করতে পার; শুধু সুরোচকাই আদর করতে দেবে না, আর বেড়ালটাও আঁচড়ে-কামড়ে দিতে পারে। তারপর ফিদিয়া, আজই যাচ্ছ নাকি?

লেভ্রেৎস্কী একটা নীচু টুল টেনে বসে পড়ে বললেন, হাঁ, আজই চলে যাচ্ছি। এরই মধ্যে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। এলিজাবেথা মিখাইলোভ্‌নার সঙ্গেও দেখা হোলো।

ওকে লিজা বলে ডাক না কেন? তোমার কাছে কবে আবার ও মিখাইলোভ্‌না হোল! আরে ও রকম কোরো না, সুরোচকার টুলখানাই ভেঙে যাবে।

লিজা গীর্জায় যাচ্ছিল, লাভ্রেৎস্কী বললেন, ওর যে এত ভক্তি তা তো জানতাম না।

হাঁ গো,'হাঁ, মেয়ের ভারি ভক্তি, তোমার-আমার চেয়ে ঢের বেশি।

নাস্তাশিয়া মিহি স্বরে বললে, তোমার আবার ভক্তি নেই! আজ তো ভোরের প্রার্থনা-সভায় যাওয়া হো'ল না, সন্ধ্যেয় তো ঠিক যাবে।

না, না, তুই একা যাবি—আমার কুড়েমি ধরেছে, মারফা বললেন। আমি এখন চায়ের ভক্ত হয়ে পড়েছি। নিজের সমান বলে নাস্তাশিয়াকে মনে করলেও তিনি তাকে 'তুই' বলেই ডাকেন। আর যা হোক, তিনি মানী পেস্তভ-পরিবারের মানুষ তো। ইভান গ্রজনির পল্টনে ছিলেন তার পূর্বপুরুষ সেকথা তো তিনি ভুলতে পারেন না।

লাভ্রেৎস্কী আবার আগের কথার খেই ধরে বললেন, হাঁ, তোমাকে জিজ্ঞেস করি—মারিয়াও এইমাত্র আমাকে বলছিলেন···কি যেন ওর নাম? পানসীন না? ও কেমন লোক?

বাবা! মেয়েটা কি বক্‌বক্ করতে পারে! মারফা বলে উঠলেন। হয়তো তোমাকে বলেছে, টোপে কেমন এক পাত্র সে গেঁথে ফেলেছে। ও ঐ পাদ্রির ছেলেটার সঙ্গে গুজগুজ করে সেই তো ভাল, আবার অন্যের কথায় কেন বাপু! না, এখনো গুজবটা রটেনি—এইটুকু যা আশা! কিন্তু নিজেই তো ও রটাবে।

আশার কথা কি বলছ? লাভ্রেৎস্কী শুধালেন।

অমন চমৎকার ছেলেকেও আমার পছন্দ হয়নি—সত্যিই তো ও আর এমন কিছু পাত্র নয়!

তুমি বুঝি ওকে পছন্দ কর না?

না, করি নাই তো। আমি সকলের সঙ্গে ভাব জমাতে পারি না। নাস্তাশিয়া কারপোভ্‌না ওর প্রেমে পড়েছে—এই তো যথেষ্ট।

বেচারী বিধবা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

মারফা, কি করে তুমি ওকথা বললে! তোমার ভগবানে ভয় নেই!

বিধবা চেঁচিয়ে উঠলো। ওর চোখে মুখে, লজ্জার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

মারফা বাধা দিয়ে বললেন, বদমাসটা মেয়েদের মন ভোলাতে জানে। জানো, ওকে একটা নস্যিদানি দিয়েছে। ওর কাছ থেকে এক টিপ নস্যি চেয়ে দেখ না ফিদিয়া। দেখবে, কি সুন্দর জিনিসটি, উপরের ঢাকনায় এক ঘোড়সওয়ার সৈন্যের ছবি। কি গো বাছা, কি বলবে বল!

নাস্তাশিয়া কারপোভ্‌না হাত তুলে হতাশার ভঙ্গী করলো।

লিজার ব্যাপার কি? লাভ্রেৎস্কী জিজ্ঞেস করলেন, ওকে কি সে ভালবাসে?

আমার তো মনে হয়, ভালো না বাসুক, পছন্দ করে। কিন্তু কি ব্যাপার, ঈশ্বরই জানেন! মন এক অদ্ভুত জিনিস—এক ঘন বন যেন—একটি তরুণী মেয়ের মন তো বুঝি তার চেয়েও রহস্যভরা। সুরোচকার কথাই ধর না—ওর মনের কথা বার কর তো। তোমার আসবার পরই তো ও গিয়ে ঘরে লুকিয়েছে। বাড়ির বাইরেও যায়নি।

সুরোচকা হাসি চাপতে না পেরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। লাভ্রেৎস্কী উঠে পড়ে আস্তে আস্তে বললেন:

হাঁ, মেয়েদের মন একটা হেঁয়ালী।

চলে যাচ্ছেন তিনি।

মারফা বললেন, আবার শীগগিরই দেখা হবে তো?

হাঁ পিসী, দেখা হবে বলেই তো মনে হয়। এখান থেকে দূরও তো বেশি নয়।

ভ্যাসিলিভ্‌স্কয়েই তো যাচ্ছ। লাভ্রিকিতে থাকতে চাও না—তাই না! তা সে তোমার ব্যাপার। তবে একটা কথা, মার সমাধিটা

গিয়ে একবার দেখে এস, ঠাকুরমারটাও বাদ দিও না। বিদেশে গিয়ে হয়তো অনেক সব বিদ্যে শিখে এসেছ, ওঁরা কবরে শুয়ে তোমাকে দেখে শান্তি পাবেন। আর গ্লাফিরার শেষ কাজটাও কোরো। এই রুবলটা নাও! নাও, নাও! আমি চাই ওর শেষ কাজটা হয়। আমিও ওকে দেখতে পারতাম না, কিন্তু মেয়েটা স্বাধীনচেতা ছিল বটে। ভারি চালাক মেয়ে! তা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তো করেনি। যা হোক, ভগবান তোমার ভাল করুন। তোমাকে হয়ত বিরক্ত করলাম।

মারফা ভাইপোকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাছা ভেবো না! লিজার সঙ্গে পানসীনের বিয়ে হবে না। ওর চেয়ে ভাল স্বামী সে পাবে।

লাভ্রেৎস্কী জবাব দিলেন, আমার তার জন্যে একটুও ভাবনা নেই। এমনি বললাম।

এবার তিনি চলে গেলেন।

আঠারো

চার ঘণ্টা পরে বাড়ির পথে চললেন লাভ্রেৎস্কী। গ্রামের মেঠো পথে গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে চললো। এক পক্ষ ধরে বৃষ্টি হয়নি। দুধের মতো মিহি কুয়াশার আবরণ চারদিকে, দূরের বন তারই আড়ালে ঢাকা। পোড়া গন্ধ আসছে। বিবর্ণ নীল আকাশে অগণন মেঘ ছায়ার মতো ভেসে চলেছে। রঙের ঈষৎ ছোঁয়া লেগেছে তাদের গায়ে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া উঠছে, শুকনো হাওয়া। গরম তাতে কমে না। গদির উপরে মাথা রেখে, দুহাত বুকে জড়ো করে লাভ্রেৎস্কী বসে আছেন। মুক্ত প্রান্তর বিছিয়ে আছে পাখার মত সুমুখে। সরে সরে যাচ্ছে উইলো ঝোপ, আস্তে আস্তে মিলিয়ে

যাচ্ছে। কাক আর বকের দল চলে-যাওয়া গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে। প্রান্তর শেষ হয়ে এল, এবার বন। কত গাছ, কিন্তু স্তেপের বন ঘন নয়—ছাড়া ছাড়া—উলঙ্গ বন; কোথাও বা সতেজ সবুজ সমারোহ নিয়ে বার্চ গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এ চিরপরিচিত পটভূমি—বহুদিন দেখা হয়নি, তাই ভাব উথলে উঠছে। মাধুর্য আর দুঃখ দুইই এসে মৃদু ঘা মারছে হৃদয়ের তন্ত্রীতে। মনও যেন রাশ ঢিলে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও যেন মাথার উপরের ভাসমান ঐ মেঘের মতোই অস্পষ্ট। মনে পড়ছে ছেলেবেলার কথা, মার কথা। অন্তিম শয্যায় মা; ওরা ওকে তার কাছে নিয়ে এল। তিনি ওর মাথাটা কেমন করে বুকে চেপে ধরে, ক্ষীণ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। গ্লাফিরা পেত্রভ্‌নাকে দেখে উদ্‌গত কান্না আবার থেমে গেল। বাবার কথাও মনে পড়ে। উদ্দাম, চির-অসন্তুষ্ট বাবা, গম্ভীর তার স্বর। তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন, দাড়ি আর তখন ছাঁটেন না, কেমন যেন করুণতা ছেয়ে গেল তার মুখে। একদিন রাতে মদ খেয়ে একটু বেসামাল হয়ে গিয়ে ঝোল ফেলে দিয়েছিলেন তোয়ালের উপর। তারপর হেসে উঠে বলতে লাগলেন নিজের কীর্তির কথা। কখনো বা দৃষ্টিহীন চোখ টিপছেন, কখনো বা লাল হয়ে উঠছেন। বারবারা পাভ্‌লোভ্‌নার কথা এবার মনে পড়লো; তার মুখ বিকৃত হয়ে এল। হঠাৎ যেন মোচড় দিয়ে উঠলো ব্যথা। মাথা নাড়তে লাগলেন লাভ্রেৎস্কী। এবার লিজা এল।

তিনি ভাবতে লাগলেন, একটি নতুন মানুষ তার জীবনে পা দিলে। চমৎকার মেয়ে! কি হবে ওর কে জানে! সুন্দরী মেয়ে। বিবর্ণ মুখ, কিন্তু সদ্য-ফোটা তার মাধুরী। গম্ভীর মুখ, চোখে সহজ দৃষ্টি, চমৎকার গড়ন, লঘু ছন্দে চলে, মৃদু তার স্বর। হঠাৎ ও যখন থেমে যায়, আমার এত ভালো লাগে। তন্ময় হয়ে কথা শোনে, হাসে না; তারপর ভাবনায় ডুবে যায়, চুলের রাশ পেছন দিকে সরিয়ে দেয়।

পানসীন তার যোগ্য নয়। কিন্তু কেন? আর আমিই বা এমন আকাশ-কুসুম ভাবছি কেন—কেনই বা দিবাস্বপ্ন দেখছি। সবাই যা করে, ও মেয়েও তাই·করবে। আমি এখন ঘুমোই। লাভ্রেৎস্কী চোখ বুজলেন।

ঘুম এল না এল তন্দ্রা। অতীতের স্মৃতির মিছিল চলেছে, ভেসে উঠছে; ভাবনাকে ঘিরে ফেলেছে। অন্য চিন্তার স্রোতে মিশে যাচ্ছে। কেন যেন রবার্ট পিলের কথা মনে পড়লো·········ফরাসী দেশের ইতিহাসের এক পাতা—সেনাপতি হলে তিনিও জয়ী হতেন··· গোলার শব্দ, সতর্ক ঘন্টি···অভিযান···মাথাটা পিছলে পড়ছে, জেগে উঠলেন। তেমনি প্রান্তর, স্তেপভূমির দৃশ্য। ধুলোর ঝড়ে ঝলসে উঠছে ঘোড়ার নাল, গাড়োয়ানের হলদে পোষাকটা হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে···বাড়ি ফিরছ বাপু, ভাল···ভাল! লাভ্রেৎস্কীর মগজে আবার ভাবনা। চীৎকার করে উঠলেন, ক্লোকটা জড়িয়ে গদি হেলান দিলেন। আবার গাড়ির ধাক্কায় জেগে উঠে বসলেন। বিস্ফারিত চোখে তাকাচ্ছেন চারদিকে। তার সুমুখে টীলার উপরে একখানা ছোট্ট গ্রাম ভেসে উঠেছে, একটু ডানে দেখা যাচ্ছে ছন্নছাড়া এক জমিদার বাড়ি। বন্ধ-শার্সী বাড়ির একটু ছোট্ট গাড়ি-বারান্দা—সুমুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। ফটক-থেকে শুরু হয়েছে কাঁটা ঝোপ, সতেজ সবুজ ঝোপ, শনের মতই ঘন। ওক কাঠ দিয়ে তৈরি এক গোলাবাড়িও দেখা যাচ্ছে, এখনো বেশ মজবুত আছে, একটুও ধসে পড়েনি। এই ভাসিলিয়েভ স্কোয় গ্রাম।

গাড়োয়ান গাড়ি এনে ফটকে থামালো। লাভ্রোৎস্কীর খাস খানসামা কোচবাক্সে বসেছিল, সে যেন লাফিয়ে পড়বে এমনিভাব দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এই রোখো! ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এল, চাপা শব্দ কিন্তু কর্কশ। কেউ এলো না, একটা কুকুরও ছুটে এল না। খাস খানসামা আবার নীচে লাফিয়ে পড়বার জন্যে চেঁচিয়ে উঠলো,

রোখো! অস্পষ্ট ঘেউ ঘেউ শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত পরে কে-একজন যেন ছুটে এল প্রাঙ্গণে। তার মাথার চুল বরফের মতো সাদা। সে গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল, হাতে চোখ তার আড়াল করা। হঠাৎ সে হাঁটু চাপড়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে এবার ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। ফটক খোলা হয়েছে। গাড়ি ঢুকে পড়েছে ভিতরে। কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে চাকার শব্দ উঠছে। এবার গাড়ি-বারান্দা। পাকা চুলওয়ালা মানুষটি ভারি চটপটে, সে এরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির শেষ ধাপে। পা দুটি সে ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজা খুলে, গাড়ির ঢাকনা তুলে দিলে। প্রভুর হাত ধরে তাঁকে নামতে সাহায্য করলে। এবার হাতে খেল চুমু।

লাভ্রেৎস্কী শুধালেন, খবর কি বাপু তোমার? তোমার নাম আন্তন না? তাহলে এখনো বেঁচে আছ!

বুড়ো নিঃশব্দে অভিবাদন জানালে, তারপর ছুটলো চাবীর থোলো আনতে। কোচওয়ান নিঃশব্দে বসে আছে কোচবাক্সে, হাত দুটো বুকের উপরে জড়ো করা। বন্ধ দরজার দিকে তার দৃষ্টি। লাভ্রেৎস্কীর খানসামা উপর থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছে নীচে। কোচবাক্সের উপর হাত রেখেই সে পটের ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো এবার চাবী নিয়ে ফিরে এল। সাপের মতো শরীরটাকে অযথা কুঁচকে, কসরৎ করে, সে তালা খুলে ফেললে। এবার সে আবার সেলাম ঠুকে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট হলঘরটিতে ঢুকে লাভ্রেৎস্কী ভাবলেন, তাহলে আবার বাড়ি ফিরে এলাম।...শার্সী খুলে দিচ্ছে, শব্দ উঠছে—পরিত্যক্ত নির্জন ঘরে দিনের আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

উনিশ

লাভ্রেৎস্কী এসে উঠলেন তার ছোট্ট বাড়িতে। এখানেই দুবছর আগে মারা গেছেন গ্লাফিরা পেত্রভ্না। বাড়িটি এ শতকের, একালের নয়—আগের শতকের সাবেকি তৈরী—মজবুত পাইন কাঠে তৈরী। নড়বড়ে দেখায়, কিন্তু আরো পঞ্চাশ বছর টিঁকে থাকবে, বেশিও থাকতে পারে। লাভ্রেৎস্কী ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ধুলোয় ঢাকা মেঝে, জানালার ঝন্‌কাঠের উপর মাছির সার শুদ্ধ হয়ে বয়ে আছে; তাদের অসুবিধেই ঘটালেন ঘরের জানালা খুলে দিয়ে। গ্লাফিরা মরবার পর কেউ আর জানালা খোলেনি। সবকিছুই তেমনি আছে; কেউ ছোঁয়ওনি। খুদে ডিভানগুলো আছে বসবার ঘরে, সরু সরু তাদের পায়া; ধূসর চকচকে সিল্কের গদি মোড়া, গদি ছিঁড়ে গেছে কোথাও, কোথাও বা ঝুলে পড়েছে; মহিমময়ী ক্যাথেরিনের আমলের তারা স্মৃতি। বসবার ঘরে গৃহকর্তার প্রিয় আরামকেদারা, উঁচু আর খাড়া তার পিঠ, অথচ সেখানে বুড়ো বয়সেও তিনি কখনো হেলান দিয়ে বসেন নি। দেয়ালে ফিওদরের প্রপিতামহের পুরানো প্রতিকৃতি ঝুলছে। আন্দ্রেই লাভ্রেৎস্কী—গম্ভীর, উদ্ধত, গম্ভীর পুরুষ--কালো পটভূমিকা থেকে মুখখানা আবছা ভেসে উঠছে। কুঞ্চিত চোখ ভারী পাতার ভিতর থেকে উঁকি মারছে, কালো চুল খাড়া হয়ে আছে বিরাট কপালের উপরে। ফ্রেমের এক কোনে শুকনো ফুলের মালাটি ধূলায় ধূসর। আন্তন বললে, গ্লাফিরা নাকি ঐ মালা নিজে তৈরী করেছিলেন। শোবার ঘরে একখানা সরু আর উঁচু খাট—উপরে সাবেকী আমলের ডোরা-কাটা চাঁদোয়া। একরাশ বিবর্ণ বালিশ পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। মেরী-মার ছবি পড়ে আছে বিছানায়। যে ছবি থাকতো শিয়রে, এখন তা বিছানায়

পড়ে লোটাচ্ছে। ফ্রেমখানা বিবর্ণ। শেষ মুহূর্তে নাকি ঐ ছবি শেষবারের মতো তার শীতল ঠোঁটে চেপে ধরে ছিলেন গ্লাফিরা। একটা ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল কাঠ আর পেতল মিশিয়ে তৈরি; একখানা বিকৃত ছায়াময় আরসী আছে জানালার ধারে এক কোণে—তার সোনালি ফ্রেম কালো হয়ে গেছে। শোবার ঘরের পাশেই উপাসনার ঘর। ছোট্ট ঘর—দেয়ালে কিছু নেই, উলঙ্গ দেয়াল—এক কোণে এক বিরাট আধার তারই মধ্যে আইকন। মেঝের ছেঁড়া গালচে মোমের গলানি পড়ে পড়ে বিশ্রী; এই গালচের উপর হাঁটু গেড়ে বসে উপাসনা করতেন গ্লাফিরা পেত্রভ্না।··· আন্তন লাভ্রেৎস্কীর খানসামাকে নিয়ে চাবী খুলে আস্তাবল দেখতে গেছে। তার বদলে একটি প্রৌঢ়া এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় রুমাল বাঁধা তার, মাথাটা কাঁপছে, শূন্য দৃষ্টি। কিন্তু তবুও সে দৃষ্টিতে কোথায় যেন আছে ব্যগ্রতা, কৌতূহল, এতবছরের সেবার অভ্যাস-আর আছে বুঝি বা দুঃখ। সে দুঃখে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত। সে লাভ্রেৎস্কীর হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে আলতো করে ছুঁইয়ে দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হুকুমের অপেক্ষায়। লাভ্রেৎস্কী তার নাম মনে করতে পারলেন না, কখনো দেখেছেন কিনা তাও মনে হোল না। তার নাম বোধ হয় আপ্রাক্সিয়া; চল্লিশ বছর আগে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে মুরগী পোষার ভার দিয়েছিলেন গ্লাফিরা। কথা সে বলছে না—যেন পাগল—শুধু তাকিয়ে আছে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে। ওরা ছাড়া বাড়িতে আছে তিনটি নাদা-পেট ছেলেমেয়ে, তাদের পরনে ঢিলে পোষাক। ওরা আন্তনের নাতি-নাতনি। তাছাড়া আছে এক নুলো চাষী, ওকে এখন মুক্তি দেওয়া হয়েছে দাসত্ব থেকে। বনমুরগীর মতো সে শুধু কিচির-মিচির করে, কিন্তু একেবারে অকেজো। শিকারী কুকুরটা লাভ্রেৎস্কী আসার সময় ছুটে এসেছিল, ঘেউ ঘেউ করেছিল; সেটাও বুড়ো হয়ে গেছে। দশ বছর কেটেছে তার ভারী শিকল গলায় ঝুলিয়ে। ওকে কেনা

হয়ে ছিল গ্রাফিরা পেত্রভ্‌নার হুকুমে, সে ঐ ভারী শিকল গলায় বয়েও বেড়াত তার হুকুমেই, কষ্টই হোত।…

বাড়ি আর পরিজন দেখা শেষ করে লাভ্রেৎস্কী বাগানে এসে দাঁড়ালেন। ভাল লাগছে। আগাছায় আর কাঁটা ঝোপে ভরে গেছে, তবুও পুরানো দিনের লাইম গাছগুলি এখনো ঘন ছায়া রচনা করে। গাছগুলি মস্ত, ছাঁটাই-করা পত্রবিন্যাসও তাদের দেখবার মতো। ঘন সারিতে হয় তো একশো বছর আগে লাগানো হয়েছিল ওদের। বাগানের প্রান্তে এক পুকুর, স্বাদু তার জল। পুকুরের ধারে ধারে শেওলার মেলা। মানুষের চিহ্ন এখানে নেই, দ্রুত তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—গ্রাফিরা পেত্রভ্‌নার বাড়িখানি তবু এখনো পরিত্যক্ত হয় নি, ছন্নছাড়া হয় নি।—মনে হয় এক শান্ত ঘুমে সে বিভোর, সেখানে ঘন জনতার কোলাহল এসে পৌছয় না, তাকে স্পর্শ করে না। ফিওদর ইভানিচ গ্রাম ঘুরে দেখতে বেরুলেন। চাষীর মেয়ে আর বৌরা কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলো, হাত তাদের চিবুকের উপরে রাখা। পুরুষরা দূর থেকে সেলাম ঠুকলে, ছেলেমেয়েরা ছুটে পালালো, কুকুর ডেকে উঠলো উদাসীন ভাবে। তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। খিদে পেয়েছে, কিন্তু চাকর-বাকর আর রাঁধুনি সন্ধ্যের আগে এসে পৌছবে না; খাদ্যদ্রব্য নিয়ে লাভ্রিকী থেকে এখনো আসে নি গাড়ি—তাই আন্তনের উপরই নির্ভর করতে হোল। সে ছুটলো মনিবের হুকুম তামিল করতে। একটা বুড়ো মুরগী ধরে সে তাকে মারলে; আপ্রাক্সিয়া পালক ছাড়ালে, ছাল ছাড়ালে, ধুয়ে-পাখলে বসিয়ে দিলে সস্‌প্যানে। যখন রান্না হয়ে গেল, আন্তন টেবিলে বিছিয়ে দিলে ঢাকনা, সাজিয়ে দিলে ছুরি আর কাঁটা। একটা পুরানো দিনের নুনদানি এনে সে রাখলো; তার আবার তিনটি মাত্র পায়া আছে। একটা ডিকেণ্টারও এল কাচের, তার উপরে গোল কাচের ঢাকনি দেওয়া। এবার সে মনিবকে গিয়ে অনুনয়

করে বললে, 'খানা তৈরী', তারপর চেয়ারের পিছনে তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তোয়ালে তার ডান হাতে, গা দিয়ে বেরুচ্ছে পুরানো দিনের গন্ধ—ঠিক যেন সাইপ্রেস গাছের খোসবাই। লাভ্রেৎস্কী একটু সুরুয়া খেলেন, মুরগীটার দিকে এবার বাড়িয়ে দিলেন হাত। মুরগীর গায়ে বড় বড় ব্রণ—পায়ের চামড়া শীটিয়ে গেছে ; মাংস যেন কাঠের মতো শক্ত আর ক্ষার-ক্ষার তার স্বাদ। লাভ্রেৎস্কী খাওয়া শেষ করে এক পেয়ালা চা চাইলেন ; বললেন, 'যদি চা হয় তো'—বুড়ো তখনি 'আনছি হুজুর' বলে ছুটে চলে গেল। কথা সে রাখলো। এক-চিমটি চা লাল কাগজের মোড়কে ছিল, তাই-ই বার করা হোলো। একটা ভারী সামোভার খুঁজে বার করা হোল ; সামোভারটি যেমন জমকালো দেখতে তেমনি আওয়াজও দেয় খুব। চিনিও পাওয়া গেল, দানাগুলি কালো, নোংরা। লাভ্রেৎস্কী এক মস্ত পেয়ালায় চা পান করলেন, এই পেয়ালাটা ছেলেবেলা থেকেই তার পরিচিত। পেয়ালার গায়ে তাস আঁকা—শুধু অতিথিরাই এতে চা খেতেন—এখন তিনিও যেন অতিথির মতোই এই পেয়ালা থেকে চা পান করছেন।

চাকর-বাকররা এসে পৌছলো সন্ধ্যায়। লাভ্রেৎস্কী পিসীর বিছানায় শুতে চাইলেন না। খাবার ঘরে তার বিছানা করে দেওয়া হোলো। মোম বাতি নিবিয়ে দিয়ে তিনি বহুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে, কত দুঃখের স্মৃতি এসে হানা দিলে। এক পরিত্যক্ত নির্জন গৃহে রাত কাটালে যে অনুভূতি মনে ঘনিয়ে আসে, তেমনি অনুভূতি তাকে পেয়ে বসলো। চারদিক থেকে অন্ধকার যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে, সে যেন নতুন অধিবাসীর আগমনে অসন্তুষ্ট—বাড়ির দেয়ালগুলিও যেন চমকে গেছে। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। তিনি কম্বল গায়ে টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সবাই ঘুমিয়ে গেলে আন্তন এল আপ্রাক্সিয়ার কাছে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে ফিসফিসিয়ে কথা হোল,

কখনো বা তাদের গোঙানি শোনা গেল; তারা ক্রুশের চিহ্ন আঁকলে বুকে। তারা আশাই করেনি যে, মনিব এসে ভাসিলিয়েভ্‌স্কোয়ে বাসা বাঁধবেন! অমন চমৎকার জমিদারি আর পরিপাটি সাজানো বাড়ি তো কাছেই আছে, সেখানে গেলেন না কেন? তারা ভুলে গেল যে, সে-বাড়ির স্মৃতি তার কাছে বিষাক্ত; ঘৃণিত সে বাড়ি! কথা শেষ হলে আন্তন রাতের চৌকিদারির পেটা-ঘণ্টায় হাতুড়ির ঘা মারলে। এতকাল গোলাবাড়িতে অব্যহৃত হয়ে পড়েছিল ঘণ্টাখানা, এখন আবার ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। রাত্রির প্রহর জানিয়ে দিয়ে সে উঠোনে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তার সাদা মাথাটা দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে! মে মাসের রাত স্নিগ্ধ, মন্থর। বুড়ো ঘুমুচ্ছে, নিদ্রা তার গভীর, মধুর।

বিশ

পরদিন লাভ্রেৎস্কী তাড়াতাড়িই উঠে পড়লেন। নায়েবের সঙ্গে দেখা হোল, যেখানে শস্য ঝাড়া হয় সেখানে গেলেন, কুকুরের গলা থেকে শেকল খুলে নিতে হুকুম দিলেন। শেকল খোলা হোল; কুকুর একবার খাপছাড়া চীৎকার করে উঠলো, কিন্তু তার খোয়াড় থেকে বেরুল না। লাভ্রেৎস্কী এবার ফিরে এলেন ঘরে। এক শান্তি, এক অবসাদ যেন ঘিরে ধরেছে তাকে, তিনি এই অবসাদেই গা এলিয়ে দিয়ে সারাদিন কাটালেন। বার বার বলতে লাগলেন, 'এখানে এসেই যেন তীরে পৌছলাম, এতদিন তো ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি।' জানালার ধারে বসে রইলেন, বই পড়া হোল না, চারদিকে যে শান্ত জীবনযাত্রার স্রোত বয়ে চলেছে, তারই শব্দ কান পেতে শুনতে লাগলেন; গ্রামের বিরল শব্দের জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন। কোথা থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট শব্দ, কিন্তু স্বরগ্রাম তার উঁচু, একটা ডাঁশ সে সুরে সুর মেলালে। শব্দ

মিলিয়ে গেছে, কিন্তু ডাঁশের গুনগুনানি থামে নি। মাছিদের মাপা-জোপা ভনভনানির ভিতর দিয়ে কানে আসছে একটা মোটা-সোটা *ভ্রমরের গুনগুনানি—বার বার সে মাথা কুটছে ছাদে।* বাইরে মুরগীর ডাক; গুনগুনানি গিয়ে মিশছে তার রুক্ষ স্বরে। একটা মাল-বোঝাই গাড়ি শব্দ তুলে চলে গেল। গাঁয়ের কোন্ বাড়ির ফটক খোলার শব্দ; 'কি বলছ গা?' চাষীর মেয়ের রুক্ষস্বর। একটি বছর দুয়েকের মেয়েকে দোলাতে দোলাতে আস্তন বলছে, 'আহা খুকুমনি আমার!' আবার সেই রুক্ষ মেয়েলি স্বর বেজে উঠছে। তারপর নিস্তব্ধতা; সব যেন মৃত। একটা গাড়ির ঝকঝকানি নেই, নেই শব্দ, একটা পাতা নড়ে না হাওয়ায়। চড়াই পাখীরা নিঃশব্দে নেমে আসছে মাটিতে, আবার নিঃসাড়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। 'এইখানেই বাসা বাধলাম আমি,' লাভ্রেৎস্কী আবার ভাবলেন। 'এখানে জীবন চলেছে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে, গা ভাসিয়ে দিলাম এই জীবনে। সে শান্ত নিস্তরঙ্গ, ঢেউ তাতে ওঠেনা, উঠবে না।' তিনি রোমন্থন করতে লাগলেন, এর বৃত্তে যে এসে ধরা দেবে, তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে নির্জনতার এই শক্তির কাছে। এখানে দুশ্চিন্তা চিরদিনের জন্য নির্বাসিত, মন হবে না তার শিকার। চাষী যেমন লাঙ্গলের চষা জমির পিছনে পিছনে চলে, জীবনও তেমনি চলবে—ধীর পায়ে, শ্লথ হবে তার গতি। সত্যিই কি শক্তি লুকিয়ে আছে এই নিস্তব্ধতায়, আছে কি বিরাট উত্তেজনা! এইতো জানালার নীচে ঐ সতেজ গাছটা ঘন ঘাসের আস্তরণ ফুঁড়ে উঠে এল, তাকে ছাড়িয়ে উঠেছে ঋজুদেহ আর এক গাছ; আবার তাদের উপর লতা তার লাল আঁকড়ি বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঠে পাকা রাইয়ের সোনালি দ্যুতি, যবের ছড়া উদ্‌গত; প্রতিটি গাছের পাতা, প্রতিটি ঘাসের শীষ যেন যথাশক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে। লাভ্রেৎস্কী আবার ভাবতে বসলেন; আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটে গেছে এক নারীকে ভালবেসে। নির্জনতার এই একঘেয়েমি যেন আমার উন্মাদনাকে সংযত করে দেয়,

আমাকে যেন শান্ত করে দেয়, আমার কাজ যেন আবার অনায়াসে আমি করতে পারি। আবার তিনি কান পেতে শুনলেন নিস্তব্ধতার ধ্বনি।—আশা তার নেই—কিন্তু তবু কিসের আশায় তিনি যেন উদ্‌গ্রীব। *নিস্তব্ধতা তাকে চারদিক থেকে ছেয়ে ফেলছে; সূর্য শান্ত নীল আকাশে* আস্তে আস্তে চলেছে, মেঘ চলেছে অলস গমনে তার মাথার উপর দিয়ে। ওরা যেন জানে, কোথায় ওরা চলেছে। আর কোথায়, কোনখানে জীবন এখন উত্তাল-উদ্দাম, দ্রুত সে ছুটছে, সংঘাত লেগেছে; কিন্তু এখানে নিঃশব্দে সে বয়ে যায়, যেমন জলের ধারা বয়ে যায় জলার ঘাসের উপর দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি এমনি ভাবনা তাকে পেয়ে বসলো। তাকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যে-জীবন নিঃশব্দে বয়ে গেল, তারই ভাবনা; তারই জন্যে দুঃখ—যে-জীবন বসন্তের তুষারের মতো তার বুকে গলে গলে যাচ্ছে। আরো আশ্চর্য লাগছে, তার দেশের প্রতি ভালোবাসা এমন করে জুড়ে বসেছে তার মন!

একুশ

দু-এক সপ্তাহের ভিতরেই গ্রাফিরা পেত্রভ্‌নার খুদে বাড়িখানা গুছিয়ে ফেললেন লাভ্রেৎস্কী। আঙিনা পরিস্কার করা হোল, বাগানের আগাছা দূর হোলো। লাভ্রিৎকী থেকে এল আসবাব; মদ, বই, মাসিকপত্র এল শহর থেকে; আস্তাবলে দেখা দিল ঘোড়া। ফিওদর ইভানিচ প্রয়োজনের সবকিছু জোগাড় করে নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। এ জমিদারের না তপস্বীর জীবন কে বলবে! বৈচিত্র্যহীন দিন কাটতে লাগলো, তবু একঘেয়ে লাগলো না। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ তার হয় না, তিনি জমিদারির কাজ-কর্ম দেখেন, ঘোড়ার পিঠে জমিদারির পথঘাট আবিষ্কার করে বেড়ান; আবার পড়াশুনোও করেন। তবে পড়াশুনোর

চাইতে গল্প শুনতেই ভালবাসেন। লাভ্রেৎস্কী পাইপ নিয়ে বসেন জানালার ধারে, সুমুখে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা চা; আন্তন থাকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, দুটি হাত তার পিছনে; পুরানো দিনের গল্প সে বলে যায়। বিগত আমলের সেই অতুল সমৃদ্ধির ইতিহাস, যখন যব আর রাই সের মেপে বিক্রি হোত না, বড় বড় বস্তা হিসেবেই হোত, আর দুই কি তিন কোপেক ছিল এক-এক বস্তার দাম। তখন ছিল চারদিকে দুর্ভেদ্য ঘন বন, মানুষের পদ-সঞ্চার-হীন কুমারী স্তেপ-ভূমি। সে-ভূমি শহরের ধারে গিয়ে পৌঁছে ছিল। আর এখন, আশী বছরের বুড়ো অভিযোগ জানায়, এখন গাছ-পালা কেটে আর চষে ওরা কিছু রাখে নি, গাড়ি চলার পথও এখন বন্ধ। আন্তন তার মনিবানীর গল্পও করে। গ্লাফিরা পেত্রভ্‌নার কথাই ওঠে: কি নিপুনা গৃহিনী, কি মিতব্যয়ী! একজন ছোকরা-মতো ভদ্রলোক ওঁর কাছে আসতেন ঘোড়ায় চড়ে, প্রায়ই আসতেন, কিন্তু গ্লাফিরা কখনো তার জন্যে ভুলেও সাজপোষাক করেন নি। কিন্তু শেষে ভদ্রলোকের এক প্রশ্নে তিনি তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিলেন। তিনি নাকি কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো তার বিষয়-সম্পত্তি কতটা তাই জানতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি হুকুম দিলেন, তিনি মারা যাবার পর তার সম্পত্তির সমস্তখানিই পাবেন ফিওদর ইভানীচ। আর লাভ্রেৎস্কী তো একেবারে সবকিছুই পেয়েছেন, লাল রিবন দেওয়া ছুটির দিনের টুপীটি, হলদে গাউনটি পর্যন্ত বাদ যায় নি। লাভ্রেৎস্কী পুরানো কাগজপত্র কিছু পাবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু তা পেলেন না। শুধু পেলেন একখানা বই, তাতে তার পিতামহ পিতর আন্দ্রেই এক জায়গায় লিখেছেন, 'সেণ্ট পিটার্স'বুর্গে মাননীয় প্রিন্স আলেকজাণ্ডার আলেকজান্দ্রোভিচ প্রোজোরভ্‌স্কী তুরস্ক সাম্রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন, তারই উৎসব।' কোথাও বা রাজনীতিক খবর লেখা: 'আর ফরাসী ব্যাঘ্রের কথা ওঠে না।' তার পাশে লেখা: 'মস্কোভ্‌স্কীয়ে ভেদোমস্তি মিখাইল

পেত্রভিচ কলিচেভের মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছেন। ইনি কি পিতর ভ্যাসিলিয়েভিচ কোলিচেভের পুত্র?' লাভ্রেৎস্কী ক'খানি বর্ষ-পঞ্জী, য়্যামেবোদিকের রহস্যঘন তন্ত্রসারও আবিষ্কার করলেন। এই স্মারক ও প্রতীক বহু স্মৃতিই জাগিয়ে তুললো। গ্লাফিরা পেত্রভ্‌নার ড্রেসিং টেবিলে তিনি একটা কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা বাণ্ডিল পেলেন, আবার কালো মোম দিয়ে সেটি সীল-মোহর করা। বাণ্ডিলটি ছিল একেবারে দেরাজের নিভৃতে—এক কোণে। বাণ্ডিলে তার বাবার যৌবনের একটি প্যাস্টেলে আঁকা ছবি। চিকণ চুলের গোছা গোছায় গোছায় কপালে এসে পড়েছে পেস্তা-চেরা অলস চোখ, ঠোঁট ফাঁক করা; আর একটি আবছা ছবি এক বিবর্ণা নারীর, সাদা তার গাউন, হাতে সাদা গোলাপ—ইনি তার মা। গ্লাফিরা কখনো নিজের ছবি আঁকান নি। আন্তন গল্প করে, 'কর্তা শুনুন, আমি তখন এ বাড়িতে থাকি না, তবুও আপনার ঠাকুর্দার বাবাকে আমার এখনো মনে পড়ে। উনি যখন মারা গেলেন, আমার বয়েস তখন মাত্র আঠারো বছর। একদিন বাগানে বুড়ো কর্তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। আমি তো ভয়েই সারা কিন্তু কর্তা কিছুই বললেন না; শুধু নামটা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর একখানা রুমাল আনতে পাঠালেন। মস্ত মানী লোক ছিলেন তিনি—তাঁর মতো আর কাউকে দেখলাম না! এর কারণ কি জানেন, ওঁর হাতে ছিল এক আশ্চর্য কবচ, আথোসের মঠের এক সন্ন্যাসী দিয়েছিলেন। তিনি কবচখানি দিয়ে বলেছিলেন, তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে দিচ্ছি এই কবচ। তুমি কবচ পর, তোমার আর শাস্তির ভয় থাকবে না। জানেন তো, তখন কি দিনকাল, কিন্তু কর্তামশায় যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। কোন হোমরা-চোমরা লোক তাকে অগ্রাহ্যি করলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে শুধু বলতেন, 'আরে মাছের প্রাণ মানুষ'! এই কথা সবসময়েই ছিল তার মুখে। তিনি থাকতেন ছোট্ট একটা কাঠের বাড়িতে, কিন্তু কি না

রেখে গেলেন! রূপোর বাসন-কোসন আরো কত কি-সব মাটির নীচের ঘরে বোঝাই থাকতো। ভারি হিসেবী ছিলেন তিনি। ঐ যে ডিকেণ্টার ওটাও তাঁর আমলের। ওতে করে তিনি ভোদ্কা খেতেন। তারপর আপনার ঠাকুর্দা পিতর আন্দ্রেইচের কথা বলি। এক পাথরের বাড়ী তিনি তৈরী করে ফেললেন, কিন্তু ভালাই তার হোল না; সব ওলট-পালট হয়ে গেল তার আমলে। তিনি জীবনে সুখ পেলেন না, টাকাকড়ি যা ছিল উড়ে গেল, এমন কিছু করেও গেলেন না, যাতে সবার মনে থাকে; একখানা রুপোর চাম্চেও তার আমলে তৈরি হয় নি—কর্তামশায়ের আমলের যাকিছু আছে সে ঐ গ্লাফিরা পেত্রভনার জন্যে। তিনি যে বড় হিসেবী ছিলেন।

লাভ্রেৎস্কী বলে উঠলেন, ওঁকে না সবাই পাথুরে প্রাণ বলতো?

আন্তন প্রতিবাদ জানালে, কে বলতো একথা!

বুড়ো সাহস করে কথায় কথায় একবার জিজ্ঞেস করলে: কর্তা কর্ত্রী এলে কোথায় থাকবেন?

লাভ্রেৎস্কী অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন, তার কথা জিজ্ঞেস কোরো না। তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

যে আজ্ঞে হুজুর। বুড়োর স্বরে বিষণ্ণতা।

তিন সপ্তাহ পরে লাভ্রেৎস্কী ঘোড়ার পিঠে চড়ে ও—শহরে এলেন, কালিতিনদের সঙ্গে দেখা করাই তার উদ্দেশ্য। সন্ধ্যেটা তাদের ওখানেই কাটিয়ে দিলেন। লেম সেখানে ছিলেন। তাঁকে তাঁর ভারি ভাল লাগলো। বাবার হুকুমে বাজনা বাজাতে তিনি শেখেন নি, কিন্তু সঙ্গীত তার প্রিয়। মার্গ-সঙ্গীতের তিনি একজন সমজ্‌দার। পানসীন সেদিন অনুপস্থিত। গভর্ণর-জেনারেল তাকে শহরের বাইরে পাঠিয়েছেন কাজে। লিজা একাই বাজালে; অতি সতর্কতা তার। লেম উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, হঠাৎ তিনি একটা কাগজ পাকিয়ে পাকিয়ে সঙ্গীত পরিচালকের দণ্ডের

মতো করে নিয়ে তাল দিতে লাগলেন। মারিয়ার প্রথমে পেল হাসি, তারপরে তিনি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বেঠোফেন তার ভাল লাগে না। স্নায়ুর পক্ষে বড় উত্তেজক। দুপুর রাতে লাভ্রেৎস্কী লেমকে তার আস্তানায় পৌছে দিতে গেলেন, সেখানে রাত তিনটে পর্যন্ত কেটে গেল। লেম অনেক কথাই বললেন। তার কুঁজো শরীর সোজা হয়ে উঠলো; চোখে আলো দেখা দিল, চুল খাড়া হয়ে উঠলো উৎসাহে-উত্তেজনায়। লাভ্রেৎস্কীর তার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল। তিনি আস্তে আস্তে সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করতে লাগলেন। গলে গেলেন বুড়ো। তিনি অতিথিকে বহু গৎ বাজিয়ে শোনালেন, তার অক্ষম কণ্ঠে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়েও উঠলেন। শিলারের গাথা ফ্রিডোলিন নিয়ে সুর বেঁধেছেন, সেই সুর বাজিয়ে শোনালেন। লাভ্রেৎস্কী অজস্র প্রশংসা করলেন, তারপর বিদায়ের আগে নিমন্ত্রণ করলেন লেমকে, ক'দিন এসে তিনি যদি থাকেন তার গ্রাম্য নিবাসে। লেম বিদায় দিতে বাইরে এসেছিলেন, তিনি রাজি হয়ে জোরে করমর্দন করলেন। লাভ্রেৎস্কী চলে গেলেন, লেম দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ভোরের বিশুদ্ধ হাওয়া বইছে, ভিজে হাওয়া, উষার প্রথম আভাস চারদিকে। তিনি চারদিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এলেন কেমন অপরাধীর মতো। আমি কি পাগল হয়ে গেছি! বিড় বিড় করে বকতে বকতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সংকীর্ণ খাট শব্দ করে উঠলো। ক'দিন পরে লাভ্রেৎস্কী যখন গাড়ি নিয়ে তাকে নিয়ে যেতে এলেন, তিনি অসুস্থতার ভান করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফিওদর ইভানিচ তার ঘরে গিয়ে সাধ্য-সাধনা করতে লাগলেন। সবচেয়ে তিনি খুশি হলেন যখন শুনলেন লাভ্রেৎস্কী একটা পিয়ানো নিয়ে গেছেন তার জন্যে। কালিতিনদের ওখানে সন্ধ্যেটা কেটে গেল। কিন্তু আগের মতো আর সে আনন্দ নেই। পানসীন রয়েছে সেখানে। সে তার ভ্রমণের কথা বলছিল, গ্রামের অভি-

জাতদের সে ঠাট্টা করছিল, তাদের অনুকরণ করছিল। লাভ্রেৎস্কী হাসতে লাগলেন তার অভিনয় দেখে। লেম এক কোণে চুপ করে বসে রইলেন। ভ্রূ তার কুঞ্চিত, জবুথবু হয়ে বসে আছেন। লাভ্রেৎস্কী যখন বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন লেমের মুখে খুসির ভাব দেখা দিল। গাড়িতে তিনি একপাশে চুপ করে বসে রইলেন। এবার মৃদু উষ্ণ হাওয়ায় মন তার চঞ্চল হয়ে উঠলো। অস্পষ্ট ছায়া, ঘাসের গন্ধ, বার্চ ফুলের কুঁড়ি বিছিয়ে আছে, শান্ত তারা-ঝলা চাঁদহীন রাত, ঘোড়ার খুরের শব্দ।—পথের মায়া তাকে মুগ্ধ করে ফেললো। বসন্তের মন্ত্র নেমেছে চারদিকে, রাত যেন ঘিরে ধরেছে এই হতভাগ্য জার্মাণকে, তার আত্মার উপর আসন বিছিয়েছে। প্রথম তিনিই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।

বাইশ

সঙ্গীতের কথা দিয়েই শুরু হোলো, তারপর এল লিজা ; আবার সঙ্গীতে ফিরে এলেন। লিজার কথা যখন উঠলো, স্বর তার মৃদু হয়ে এল। লাভ্রেৎস্কী কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন আবার সঙ্গীতের দিকে। একটু বা ঠাট্টা করেই বুঝি বললেন, তিনি অপেরা রচনা করেন না কেন।

লেম বলে উঠলেন, অপেরা, সে তো আমার ক্ষমতায় হবে না। আর তো আমার সে জীবন্ত কল্পনা নেই, অপেরায় তো তারই দরকার ; আমার সে-শক্তি আর নেই···কিন্তু এখনো আমি বোধ হয় প্রেমের সুর তৈরী করতে পারি, কিন্তু বাণী ঠিক হবে তবে তো আমার সুর বেজে উঠবে। তিনি নীরব। চুপ করে বসে আছেন, চোখ আকাশের দিকে।

তিনি কিছুক্ষণ পরেই বলে উঠলেন, যেমন এই বাণীটি—হে তারাদল, নিষ্পাপ তারার দল!···

লাভ্রেৎস্কী ফিরে তাকালেন।

লেম আবার আবৃত্তি করলেন, হে তারাদল, নিষ্পাপ তারার দল! তোমরা ন্যায়বান আর দুষ্কৃতকারী—সবার দিকেই তো চেয়ে থাক। কিন্তু যে বুকে পাপ নেই, সেই তো তোমাদের ঐ দৃষ্টির অর্থ বোঝে—সে বুঝি ভালও বাসে। কিন্তু আমি তো কবি নই…অমনি গভীর চিন্তা থাকবে সে গানে।

লেম টুপীটা ঠেলে দিলেন…রাতের আলোয় তার মুখখানা আরো বিবর্ণ দেখায়, মনে হয় যেন কচি সে মুখ।

তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, আর তোমরা…তোমরা জানো কে ভালবাসে, কে পারে ভালবাসতে। তোমরা যে নিষ্পাপ, তোমরাই তো বুকে সান্ত্বনা দাও। না, না, হোল না। তিনি বলে উঠলেন, আমি তো কবি নই, এমনি একটা কিছু আমি চাই।

আমিও কবি নই, তার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, লাভ্রেৎস্কী বলে উঠলেন।

নিষ্ফল, নিষ্ফল স্বপ্ন! লেম অস্ফুট স্বরে বললেন। গাড়ির কোণে চুপ করে চোখ বুজে আছেন, বুঝি বা ঘুমাতে চান।

কয়েক মুহূর্ত চলে গেল…লাভ্রেৎস্কী শুনলেন…বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে বলছেন, তারার দল, নিষ্পাপ তারার দল। ভালবাসা…

ভালবাসা, লাভ্রেৎস্কী মনে মনে আওড়ালেন। চিন্তায় তিনি বিভোর, মনে তার পাষাণের ভার।

তিনি জোরে বললেন, ক্রিস্টোফার ফিওদরিচ, আপনি ফ্রিডোলিনের গানের যে সুর দিয়েছেন, সুন্দর সে সুর। আচ্ছা, এই ফ্রিডোলিন সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান—যখন কাউন্ট তাকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—যখন তিনি হলেন তাঁর স্ত্রীর প্রেমিকা—বলুন তো, তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

লেম উত্তর দিলেন, আপনি ঐ কথা ভাবছেন, হয়তো আপনার সে-অভিজ্ঞতা আছে—হয়তো সয়েছেন…হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন;

কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। লাভ্রেৎস্কী জোর করে হাসলেন, পায়ের দিকে তার দৃষ্টি।

তারার দল নিষ্প্রভ; আকাশে দিনের ধূসর আভাস। গাড়ি এসে ভ্যাসিলিয়েভ্স্কোয়ের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। লাভ্রেৎস্কী অতিথিকে তার ঘর দেখিয়ে দিলেন। তারপর পড়বার ঘরে এসে জানালার ধারে বসে পড়লেন। ভোরের আগে নাইটিঙ্গেল বাগানে তার শেষ গান গেয়ে উঠলো। তার মনে পড়লো, মারিয়াদের বাগানেও একদিন গেয়ে উঠেছিল নাইটিঙ্গেল। তার গান শুনে লিজা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে। তার চোখের চাউনিও মনে পড়ছে। ভীরু সলাজ সে চাউনি। তার কথা ভাবতে লাগলেন, মনের পাষাণ ভার যেন নেমে গেছে। নিষ্পাপ কুমারী, জোরে তিনি বলে উঠলেন; তারপর মৃদু হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। পবিত্র কুমারী! এবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

লেমও বহুক্ষণ বসে রইলেন; হাঁটুর উপরে স্বরলিপির খাতা খোলা। একটা আশ্চর্য সুর যেন ঘুরে মরছে, তিনি জেগে উঠেছেন, উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, সুরের মাধুর্য যেন তাঁকে ঘিরে ফেলেছে; কিন্তু তবু ধরা-ছোঁয়া তো সে দেয় না!

তিনি এবার বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, কবিও নই, সুরকারও আমি নই। বালিসে তাঁর ক্লান্ত মাথাটা ঢলে পড়লো গভীর ঘুমে।

তেইশ

পরদিন গৃহস্বামী আর অতিথি বাগানে বুড়ো লাইম গাছটার তলায় বসে চা খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদজী, কথায় কথায় লাভ্রেৎস্কী বললেন, আপনাকে তো শীগ্‌গীরই এক বিবাহ-উৎসবের সুর রচনা করতে হবে।

কেন—কার ?

পানসীন আর লিজার যে বিয়ে। কাল দেখেন নি, পানসীনের চোখের চাউনি, ওর দিকে তার চোখ আর মন। মনে হচ্ছে, এর মধুর পরিণতি হবেই।

লেম চেঁচিয়ে উঠলেন, কখনে না।

কেন!

অসম্ভব! একটু থেমে বললেন, কিন্তু পৃথিবীতে সবই সম্ভব। আর রাশিয়ায় তো তা বটেই।

রাশিয়ার কথা এখন রাখুন, এ বিয়েতে আপনার আপত্তি কেন ?

এটা যে আগাগোড়া ভুল, ভুল! এলিজাবেথা মিথাইলোভনা ভাল মেয়ে, মন তার দরাজ, উন্নত…আর ওতো একজন বিলাসী।

কিন্তু লিজা তো ওকে ভালবাসেন !

লেম উঠে দাঁড়ালেন।

না, ভালবাসে না। ওর মন নিষ্পাপ, ও ভালবাসার স্বাদ জানে না। মাদাম ফন কালিতিনা ওকে বলেছেন, পানসীন চমৎকার ছেলে, ও তাই মেনে নিয়েছে। ও তো একেবারে শিশু, উনিশ বছর বয়েস হলেও বুদ্ধি ওর হয় নি। সকাল-সন্ধ্যেয় ও প্রার্থনা করে কাটায়। কিন্তু পানসীনকে ও ভালবাসে না। যা সুন্দর তাই তো ও মেয়ে ভাল বাসবে। পানসীন তো সুন্দর নয়, তার আত্মা তো সুন্দর নয়। লেম পায়চারী করতে করতে অনর্গল বলে চললেন। চোখ তাঁর নীচু।

ওস্তাদজী, লাভ্রেৎস্কী হঠাৎ বলে উঠলেন, আমার কি মনে হয় জানেন, আপনি আমার ভাগ্নীর প্রেমে পড়েছেন।

লেম থেমে পড়লেন।

ভাঙ্গা গলায় বললেন, আমাকে অনুগ্রহ করে ঠাট্টা করবেন না।

আমি পাগল নই—আমি সুমুখের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছি—রঙীন ভবিষ্যৎ তো আমার জন্যে নয়।

লাভ্রেৎস্কী দুঃখিত হয়ে বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলেন। লেম তাকে নিজের রচিত সুর বাজিয়ে শোনালেন। তারপর রাতের খাবার সময় লাভ্রেৎস্কী আবার লিজার কথা পাড়লেন। বৃদ্ধ আবার শুরু করলেন। লাভ্রেৎস্কী শুনতে লাগলেন কৌতূহল আর মনযোগভরে।

তিনি এক সময়ে বলে উঠলেন, এখন তো সব গোছ-গাছ করে নিয়েছি—বাগানেও ফুল ফুটেছে—এখন যদি ওকে ক'দিনের জন্য ওর মা আর পিসীর সঙ্গে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনি—কেমন হয় ওস্তাদজী?

লেম প্লেটের উপর মাথা নীচু করে রইলেন। তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, বেশ হয়!

পানসীনের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়।

হাঁ, বৃদ্ধের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

দুদিন পরে ফিওদর ইভানিচ শহরে কালিতিনদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

চব্বিশ

সবাইকে বাড়িতেই তিনি পেলেন, কিন্তু মনের কথা তখুনি বললেন না। লিজার সঙ্গে আগে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সুযোগ এসে গেল। বসবার ঘরে ওঁরা একা। আলাপ শুরু হোলো…এরই মধ্যে লাভ্রেৎস্কী লিজার পরিচিতের বৃত্তে এসে গেছেন। তাই লজ্জা করছে না সে। কারো সঙ্গে কথা কইতে তার

লজ্জাও নেই। তিনি শুনছেন তার কথা, মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, লেমের কথাগুলো মনে পড়ছে। ঠিকই বলেছেন লেম! এমনও তো হয়, দুটি স্বল্পপরিচিত মানুষ—অন্তরঙ্গতা তাদের জমেনি, তবু তারা হঠাৎ দুজনে দুজনের কাছে এল। পরস্পরের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো মিতালি। বন্ধুত্বের হাসি, এমন কি অঙ্গভঙ্গীও বাদ গেল না। লাভ্রেৎস্কী আর লিজার যেন তাই হয়েছে। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে লিজা আর ভাবছে, উনি লোক তো ভাল! তিনিও ভাবছেন, তুমি এমন মেয়ে লিজা—এমন মেয়ে! যখন লিজা একটুও ইতস্ততঃ না করে বললে, সে চায় তার কাছে মনের কথা খুলে বলতে, শুধু তিনি কি ভাববেন বলেই পারছে না, লাভ্রেৎস্কী তখনো অবাক হলেন না।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ভয় পেও না, বল লিজা!

লিজা তার স্বচ্ছ চোখ তুলে তাকালো।

বলতে সে শুরু করলে, মনে মুখর হয়ে উঠছে কথার ভিড়—তারই সাড়া মুখে।···আপনি চমৎকার মানুষ। কিন্তু মাপ করবেন, বলতে সাহস হচ্ছে না···কিন্তু কি করে···কি করে আপনি স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন?

লাভ্রেৎস্কী লিজার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর পাশে এসে বললেন, শোন, ওকথা তোলে না, পুরানো ক্ষতে হাত দিও না, তোমার হাত তো কোমল লিজা···কিন্তু তবু তো আঘাত লাগবে।

লিজা বলতে লাগলো···যেন শোনেনি সে তার কথা। জানি, তিনি অবিচার করেছেন। তাঁর পক্ষ আমি সমর্থন করছি না; কিন্তু ভগবান যে মিলন ঘটালেন, তাকে মানুষ কি করে ছিঁড়ে ফেললো?

এলিজাবেথা মিথাইলোভ্না, তোমার আর আমার মত এখানে আলাদা, তিনি গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, আমরা পরস্পরকে তো বুঝতে পারব না।

লিজার মুখ ম্লান হয়ে গেছে, দেহ কাঁপছে, ক্ষীণ সে কাঁপন। তবুও নীরব সে তো রইল না।

ক্ষমা করুন, সে বললে। যদি তিনি ক্ষমা চান তখন কি হবে? মৃদু তার স্বর।

ক্ষমা! লাভ্রেৎস্কী চেঁচিয়ে উঠলেন, যার পক্ষ তুমি নিয়েছ, তাকে তোমার আগে চেনা দরকার! ঐ ওকে আমি ক্ষমা করব, বাড়িতে বরণ করে নিয়ে আসব! ওতো শূন্যগর্ভ আত্মাহীন এক জীব! আর কে-ই বা তোমাকে বললে যে, সে ফিরে আসতে চায়? সে তার ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট। আর এসব কথা বলেই বা লাভ কি? সে নাম তো তোমার উচ্চারণ করাও উচিত নয় লিজা। তুমি নিষ্পাপ, তুমি কোনো দিন বুঝবে না, সে কি জীব!

ওঁকে কি আপনি গালাগালই দেবেন, লিজা তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে যেন বললে, আপনিই তো ওঁকে ত্যাগ করেছেন ফিওদর ইভানিচ।

লাভ্রেৎস্কী অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন, আমি তোমাকে আবার বলছি, সে কি, তুমি তা জান না।

লিজা চোখ নীচু করে বললে, তাহলে তাকে বিয়ে করলেন কেন?

লাভ্রেৎস্কী উঠে দাঁড়ালেন।

কেন—কেন বিয়ে করলাম? তখন যে আমি অনভিজ্ঞ, কাঁচা। আমি জড়িয়ে পড়লাম মোহে, বাইরেটা দেখে মুগ্ধ হলাম। মেয়েদের তখন আমি চিনি না। কিছুই জানি না। ভগবান তোমাকে তো এক সুন্দর বিবাহিত জীবন দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু বিশ্বাস কর, সে-জীবন সম্পর্কেও নিশ্চয় করে তো কিছু বলা যায় না।

লিজা বললে—তার স্বর অস্পষ্ট, ধরা। আমার ভাগ্যও হয় তো খারাপ হতে পারে। কিন্তু ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া

ছাড়া উপায় কি! জানিনা, বলতে পারছি না, কিন্তু ভাগ্যের হাতে সঁপে না দিলে···

লাভ্রেৎস্কী হাত মুঠো করে মেঝেয় পা ঠুকলেন।

লিজা তাড়াতাড়ি বললে, আমাকে ক্ষমা করুন, রাগ করবেন না।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না। লিজা উঠে চলে যাচ্ছিল।

একটু অপেক্ষা কর, লাভ্রেৎস্কী হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমার মা আর তোমার কাছে আমার এক প্রার্থনা আছে—আমার ওখানে একদিন যাবে না?—পারিবারিক একটু উৎসব হবে। আমি একটা পিয়ানো জোগাড় করেছি; লেমও আছেন ওখানে। এখন ফুটেছে লিলাক; একটু গ্রামের হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলবে—তারপরে ফিরে আসবে—যাবে তো?

লিজা মার মুখের দিকে তাকালো, মারিয়ার মুখে নিরুপায় ভাব; লাভ্রেৎস্কী তাকে মুখ খোলবার সময় না দিয়ে তার দুহাত তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। মারিয়া সামান্য উচ্ছ্বাসের প্রকাশেই অভিভূত হয়ে পড়েন, এই 'বর্বরের' কাছ থেকে এই শিষ্টাচারটুকুও তিনি আশা করেন নি। তাই রাজি হয়ে গেলেন। তিনি যখন কোন্ তারিখে যাবেন ভাবছেন, লাভ্রেৎস্কী তৎক্ষণে লিজার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে, ধন্যবাদ··· আমি দুঃখিত···লিজার ম্লান মুখ খুশির আলোয় ভরে গেল, মুখে তার লাজুক হাসি—চোখও যেন হাসছে—তার ভয় হয়েছিল, হয় তো তিনি কিছু মনে করেছেন!

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না জিজ্ঞেস করলেন, ভ্লাদিমির নিকোলাই যাবে তো?

নিশ্চয়ই, লাভ্রেৎস্কী উত্তর দিলেন, কিন্তু একেবারে পারিবারিক ব্যাপার হলেই ভাল হয় নাকি?

কিন্তু আমি ভাবছিলাম, মারিয়া কি যেন বলতে গেলেন…বেশ তো, তোমার যেমন ইচ্ছে।

ঠিক হোল, লেনোচকা আর সুরোচ্‌কাও যাবে। মারফা দিমোফিয়েভ্‌না যেতে রাজি হলেন না।

তিনি আপত্তি তুললেন, বাছা, আমার বুড়ো হাড়ে অতো ধকল সইবে না। আর আমার তো মনে হয়, তোমার ওখানে ঘুমোবার জায়গাও নেই। আমি অন্যের বিছানায় শুতে পারি না বাপু। অল্প বয়েসীরাই যাক! লাভ্রেৎস্কী আর লিজাকে একা পেলেন না; কিন্তু তার দৃষ্টি এসে বারবার পড়ছিল তার মুখে। লিজা একটু লজ্জিত হোল, তবু ভাল লাগলো…ওঁর জন্যে তার কত দুঃখ! বিদায়ের সময় তিনি ওর হাতখানা নিজের হাতে চেপে ধরলেন, তারপর চলে গেলেন। এবার নিঃসঙ্গিনী লিজা ভাবতে বসলো।

পঁচিশ

লাভ্রেৎস্কী যখন বাড়ি ফিরে এলেন তাঁর বসবার ঘরের সামনে একজন ঢ্যাঙা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা নীল কোট তার পরনে, দাগ-ধরা মুখ, চাপ দাড়ি আছে, তবে ছাঁটা নয়; এক দীর্ঘ খাড়া নাক, খুদে চোখ, জ্বলজ্বলে তার দৃষ্টি। এ লোকটি মিখালেভিচ, তার সেই পুরানো কলেজ-জীবনের মিতা। লাভ্রেৎস্কী তাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারলেন না, তারপরে নাম শুনেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মস্কোর পরে আর তাদের দেখা হয় নি। বৃষ্টিধারার মতো প্রশ্ন ঝরে পড়লো, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের দমক; বিগত দিনের স্মৃতি টেনে আনা গেল। তারপর পাইপে তামাক আর মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে মিখালেভিচ হাত নেড়ে বলতে লাগলো তার জীবনের কথা। এর ভিতরে উত্তেজক তেমন কিছু নেই, কোথাও সফলতার গর্ব নেই—তবু সে হাসছে

ধরা গলায়—স্নায়ু-বিকলতার হাসি। এক ধনী জোতদারের খাতা লিখতো সে এক মাস আগে—এখন সে থাকে ও-শহর থেকে কিছু দূরে। লাভ্রেৎস্কীর বিদেশ থেকে ফেরার কথা শুনে তাই সে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। যৌবনে যেমন উচ্ছ্বাস তার ছিল আজও তাই আছে। লাভ্রেৎস্কী তার নিজের কথা তুললেন, মিখালেভিচ বাধা দিয়ে বিড়বিড় করে বললে, শুনেছি বন্ধু শুনেছি—কে ভেবেছিল এমন হবে। সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় সে ঘুরিয়ে দিলে।

সে বললে, আজ এখানে থেকে কাল চলে যাব। আজ কিন্তু অনেক রাত জাগতে হবে। আমি জানতে চাই, কি করলে তুমি জীবন নিয়ে, কি তোমার আদর্শ, কি তোমার বিশ্বাস—তুমি কি হয়েছ, জীবন তোমাকে কি শিখিয়েছে। (মিখালেভিচ তখনো পুরানো দিনের বুলি ছাড়তে পারে নি) আমার কথা যদি ধর—আমি খুব বদলে গেছি··· আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে জীবনের ঢেউ···কে যেন বলেছিল একথা ? কিন্তু তবু আমার সত্তা বদলায়নি—বদলায় নি আমার আত্মা, এখনো সত্যে আমি বিশ্বাসী, শিবে আমি বিশ্বাসী। শুধু বিশ্বাসীই নই—আমার এ বিশ্বাস গভীর—এ যেন এক ধর্ম। শোন, তুমি তো জানতে আমি কবিতা চর্চা করতাম ··আমার কবিতায় কবিত্ব ছিলনা, কিন্তু ছিল সত্য। আমি তোমাকে আমার শেষ কবিতাখানা পড়ে শোনাব···সেখানে আছে আমার হৃদয়ের বিশ্বাস। শোন···মিখালেভিচ কবিতা পড়তে শুরু করলো ; দীর্ঘ কবিতা, শেষ ছত্র ক'টিতে লেখা···

আমার হৃদয় নতুন অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত
আমি যেন শিশু, তেমনি করেই আমি বাড়ছি।
যা কিছু পূজা করেছি, আজ তা পুড়িয়ে ফেল্‌লাম
আর যা কিছু পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, আজ তারই পূজা শুরু হোলো।

মিখালেভিচ শেষ ছত্র দুটি আওড়াতে আওড়াতে যেন কেঁদেই ফেললে ; মুখ বিকৃত হয়ে এল। এক গভীর উচ্ছ্বাস তার বিস্তৃত মুখে খেলে যাচ্ছে, তার সাধারণ মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। লাভ্রেৎস্কী শুনছিলেন —এক বিদ্রোহী যেন নড়ে উঠছে ; মস্কোর এই ছাত্রটির উৎসাহে তিনি যেন নিজে ক্ষেপে উঠছেন। বিশ মিনিটও কাটলো না এর মধ্যে শুরু হোল তর্ক-বিতর্ক। এ তর্কের শেষ নেই, আর রুশরাই এমনি তর্ক করতে পারে। বহু বছর পরে, নিজেদের অস্পষ্ট বোঝাশোনা নিয়ে তারা কথা কাটাকাটি করতে লাগলো ; অতি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে চললো তর্ক —যেন এ তাদের জীবন-মরণ সমস্যা। তারা চেঁচালে, এমন তর্জন-গর্জন করলে যাতে বাড়িতে সবাই চমকে উঠলো। আর বেচারী লেম ! মিখালেভিচ আসবার পর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন, তিনি তো তখন বিস্মিত ; একটু বা ভয়ই পেলেন।

মিখালেভিচ দুপুর রাতে চেঁচিয়ে উঠলো, তাহলে কি তুমি চাও ? তোমার কি মোহ-বিচ্যুতি ঘটেছে ?

লাভ্রেৎস্কী কড়া জবাব দিলেন, আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় ? ওরা তো শুকিয়ে যায়, ওদের অসুখে ধরে—তুমি কি একবার পরখ করে দেখবে আমাকে ? হাত দিয়ে তুলতে পার কিনা দেখ তো ?

মোহ-বিচ্যুত মানুষ যদি না হও তাহলে তুমি অবিশ্বাসী। সে তো এর চেয়েও খারাপ। (মিখালেভিচের উচ্চারণে ইউক্রাইনের টান) অবিশ্বাসী বলতে তুমি কি বোঝ। হাঁ, ভাগ্য তোমার বিরুদ্ধে একথা স্বীকার করি, এর জন্য তুমি দায়ী নও। তুমি এক উদগ্র প্রেমিকের আত্মা নিয়ে এসেছিলে, তোমার ছিল উগ্র কামনা—অথচ তখন তুমি নারী সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। জোর করেই এই বিচ্ছেদ আনা হয়েছিল। তাই জীবনে প্রথম যে নারী এল, সে তোমাকে বোকা বানালে।

লাভ্রেৎস্কী মন্তব্য করলেন, তোমাকেও সে বোকা বানিয়েছে।

হাঁ, মানি-একথা মানি। আমিও ভাগ্যের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—যাক্ ও কথা, ও একটা বুলি মাত্র। ভাগ্য বলে কিছু নেই। একটা পুরানো বুলি—পুরানো সংজ্ঞা। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় ?

এই প্রমাণ হয় যে, ছোটবেলা থেকেই মন আমাদের পঙ্গু হয়ে গেছে।

বেশ তো, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াও—তুমি পুরুষ না ? নিশ্চয়ই, শক্তি তোমাকে ধার করে আনতে হবে না ! কিন্তু বিশেষ একটা ব্যাপারকে একেবারে একটা অলঙ্ঘণীয় বিধানের কোঠায় ফেলতে পার না।

এখানে বিধানের কথা ওঠে কি করে ? লাভ্রেৎস্কী বাধা দিলেন, আমি মানিনা যে···

মিথালেভিচ আবার বললে, না, এ তোমার বিধান···বিধান ··

একঘণ্টা পরে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি আত্মকেন্দ্রিক জীব—তুমি ঠিক তাই···তুমি নিজের সুখ চাইছ, জীবনে সুখ খুঁজেছ নিজের, নিজের জন্য নিজে বাঁচতে চেয়েছ···

আত্মসুখ বস্তুটা কি বল তো ?

তাই তো তুমি সবদিকে ভাঙচুর করেছ, সবকিছু ধসে পড়েছে।

কিন্তু আত্মসুখ বস্তুটা কি আমি জানতে চাই !

সবকিছু তাই ধসে পড়লো। যেখানে পা রাখবার জায়গায়ও নেই, সেখানে গেলে পা রাখতে, চোরাবালিতে ঘর বাঁধলে···

সোজা কথায় বল তো, উপমা দিও না। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—ঠিক, ঠিক—যত খুশি হাস—কিন্তু তোমার কোনো বিশ্বাসের বালাই নেই, নেই মনের উত্তাপ···তুমি তো শুধু এক মনময় জীব, কিন্তু তাও তুচ্ছতায় ভরা···তুমি আর কিছু নয় এক সনাতন ভোলতেয়্রবাদী—তুমি ঠিক তাই !

কি—আমি ভোলতেয়্রবাদী ?

হাঁ, ঠিক তোমার বাবার মতোই, অথচ কখনো তা তোমার মনেও হয় নি।

লাভ্রেৎস্কী চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি একটা আস্ত ক্ষ্যাপা !

মিথালেভিচ উষ্ণ হয়ে উঠলো, হায়, এখনো সে-উঁচুদরের শিরোপা আমার ভাগ্যে মেলে নি।···

মিথালেভিচ রাত আড়াইটের সময় আবার চেঁচিয়ে উঠলো, তোমাকে কি বলব আমি জানি না। তুমি অবিশ্বাসী নও, মোহ-বিচ্যুত নও, ভোলতেয়্রবাদী নও—তুমি একটা বেহদ্দ কুড়ে—হাঁ, তুমি তাই, আবার খানিকটা পাকামিও আছে। বহু অকর্মণ্য আছে, যাদের পাকামি নেই, তারা কিছু করে না বলেই পা ঠোকে ; কিছু করবার শক্তি নেই বলেই পা ঠোকে ; তারা বিচার-বুদ্ধির ধার ধারে না। কিন্তু তুমি চিন্তা কর, তবু তুমি সময়কে বয়ে যেতে দাও। তুমি উঠে কাজে লেগে পড়তে পার,—কিন্তু তা কর না। ভর-পেট খেয়ে তুমি শুধু শুয়ে থাক···এই-ই তোমার আদর্শ···তুমি ভাব·· মানুষ এসব কি করছে ; এতে তার লাভ কি ?

লাভ্রেৎস্কী বাধা দিলেন, তোমার এ ধারণা কোথা থেকে হোল যে, আমি শুয়ে থাকি ? কিসে তোমার আমার মতবাদ সম্বন্ধে এমন ধারণা হোল ?

মিথালেভিচ বলে চললো, তোমাদের এই শ্রেণীটাই তাই। পড়াশুনো-করা অকর্মণ্যের দল। তোমরা জার্মানদের দুর্বলতার খবর রাখ ; ইংরেজ আর ফরাসীদের কোথায় ব্যথা—তাও তোমাদের জানা—আর এই বিদ্যেই তোমাদের প্রধান অবলম্বন—এরই উপর নির্ভর করে তোমাদের এই লজ্জাস্কর অকর্মণ্য জীবন কাটাচ্ছ, তাকে সমর্থন করতে চেষ্টা করছ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বা আত্মপ্রসাদে মত্ত, তারা বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে চুপ করে আছেন, চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন মূর্খরা কেমন সোরগোল

তুলেছে। হাঁ, মশাই, হাঁ। আমাদের মধ্যে এমন অভিজাত আছেন, তোমাকে লক্ষ্য করে বলছি না, যাঁরা সারা জীবন একঘেয়েমির ভিতরে ডুবে কাটিয়ে দিলেন—তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন, আঁকড়ে ধরে রইলেন। —এ যেন সাদা মোরব্বার ভিতরে ব্যাঙের ছাতার মতো। নিজের উপমায় সে নিজেই হেসে ফেললো। উঃ! একঘেয়েমির কি অবসাদ, কি আবেশ!—এই-ই হবে আমাদের রুশদের মৃত্যুর কারণ। সব সময়েই এই অকর্মণ্য মানুষগুলো কাজ করবার কথা ভাবছে—এরা কেমন বেখাপ্পা, লক্ষ্য করেছ…

হঠাৎ গালাগাল দিতে শুরু করলে কেন? লাভ্রেৎস্কী এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, কাজের কথা নিয়ে চীৎকার করতে বেশ লাগে। কিন্তু কি কাজ করতে হবে তাই বল তো! গালাগাল রেখে দাও তো পল্টাভার ডেমোস্থিনিস-মশাই।

জানতে চাও নাকি? না আমি তা বলতে প্যারব না। প্রতি লোকটাকে নিজেকে তা জেনে নিতে হবে। ডিমোস্থিনিসের স্বরে বিদ্রূপ। একজন জমিদার, একজন অভিজাত—আর তিনি কিনা জানেন না কি করতে হবে! তোমার বিশ্বাসের বুনিয়াদ পাকা হলে তুমি তা জানতে; যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে কোনো কিছুরই প্রকাশ হয় না—হতে পারে না।

আমাকে বিশ্রাম করবার সময় দাও; চারদিক তাকিয়ে দেখবো—তবে তো! লাভ্রেৎস্কী অনুনয় করলেন।

না, এক মুহূর্তের বিশ্রাম নয়, মিথালেভিচ উদ্ধত স্বরে হুকুম জারী করলে যেন—এক মুহূর্তের বিশ্রামও নয়। মৃত্যু তো কারো জন্য বসে থাকে না, জীবনও বসে থাকবে না।

চারটের সময় সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো। এবার তার গলা ভেঙে গেছে—কি কাল, আর কি স্থান অকর্মণ্য হয়ে থাকবার! এইখানে,

বর্তমানে, এই রাশিয়ায়, যখন সবারই কর্তব্য রয়েছে, যেখানে রয়েছে গুরু দায়িত্ব, সেখানে কিনা আমরা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি···স্রেফ ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি !

লাভ্রেৎস্কী মন্তব্য করলেন, তোমাকে বলছি, আমরা এখন ঘুমিয়ে নেই। অন্যকে ঘুমোতে বরং বাধাই দিচ্ছি। মোরগের মতো কিচির-মিচির করছি। শোন তো, ঐ তো তিন নম্বর মোরগটা ডাকছে না !
এই ঠাট্টায় মিখালেভিচ হেসে উঠে শান্ত হয়ে গেল। বেশ তো, কাল আবার হবে। পাইপটা রেখে সে হাসলো।

লাভ্রেৎস্কীও বললেন, কাল আবার হবে। কিন্তু তবু দুই বন্ধু আরো একঘণ্টা ধরে আলাপ করলেন। তাদের স্বর এবার শোনা গেল না, বিষণ্ণ স্বর, তার রেশ হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

লাভ্রেৎস্কী বহুবার আটকে রাখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মিখালেভিচ তবু চলে গেল। তাকে পীড়াপীড়ি করে রাখা গেল না। তবু মনের সুখে আলাপ করে নিলেন। তার মনে হোল, মিখালেভিচের কাছে একটা কানাকড়িও নেই। তিনি দেখলেন বন্ধুর বেশ-ভূষায়, মুখে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের চিহ্ন—জুতোর গোড়ালি তার ক্ষয়ে গেছে, কোটের বোতাম নেই ; হাতে দস্তানা বোধ হয় বহুদিন পরা হয় না ; চুল উস্‌কোখুস্‌কো। খাবার সময় গোগ্রাসে সে খেল, মাংস দুহাতে ধরে ছিঁড়ে নিলে, হাড় চিবুলে কালো কালো দাঁতে। শোনা গেল, সরকারী চাকরীতে কিছু হয় নি, এখন তার একমাত্র আশা এই নতুন মনিবটি। ইনি একজন শিক্ষিত লোককে আফিসে রেখেছেন এইটেই জাহির করা তার উদ্দেশ্য। মিখালেভিচ তাতে হতাশ হয়ে পড়েনি, তার সেই আদর্শবাদী কবির জীবন সে কাটাচ্ছে। মানুষের ভাগ্যের কথা আর নিজের লক্ষ্যের কথা সে ভাবছে ; কিন্তু নিজে যে ডুবে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। মিখালেভিচ বিয়ে করে নি, কিন্তু বহুবার

প্রেমে পড়েছে, আর তাদের নিয়ে লিখেছে কবিতা। এমনি এক উচ্ছ্বাস সে উৎসর্গ করেছিল রহস্যময়ী এক পোল্যাণ্ডবাসিনীকে, তার কালো চুল দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সে।...*এই পোল্যাণ্ডবাসিনী সম্পর্কে গুজব ছিল যে, সে বহু সামরিক কর্মচারীর পরিচিত, আর নগণ্য ইহুদিনী ছাড়া কিছুই নয়*...কিন্তু যদি তাই-ই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

মিখালেভিচ লেমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলো না। তার উচ্ছৃঙ্খল কথাবার্তা, বেপরোয়া ভাব দেখে লেম ভয়ে পেয়ে গেলেন। এ-সবে তিনি তো অভ্যস্ত নন।...গরীব ভিখারী আর-এক ভিখারীকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তারা আর মিতালি পাতাতে পারে না।—এতে অবাক হবার তো কিছু নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার মতো তো কিছু নেই—আর সবচেয়ে নেই কোনো আশা।

বিদায় নেবার আগে মিখালেভিচ আর লাভ্রেৎস্কীর দীর্ঘ আলাপ হোলো। মিখালেভিচ বারবার বললে, যদি লাভ্রেৎস্কী না শোধরায় তার ধ্বংস অনিবার্য। তাকে অনুরোধ করলে, যাতে তিনি চাষীদের মঙ্গলের দিকে নজর দেন। নিজেকে সে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরলে,—এই ব্যথার ভিতর দিয়ে তার হয়েছে শুদ্ধি। তারপর বার কয়েক নিজেকে সুখী মানুষ বলে জাহির করলে...সে যেন উড়ে-যাওয়া পাখী—সে যেন সমতল প্রান্তরের স্থলপদ্ম।

লাভ্রেৎস্কী মন্তব্য করলেন, হাঁ, কালো স্থলপদ্ম বটে!

মিখালেভিচ বিদ্রূপ করে উঠলো, দেখ, আর যাই-ই হও, অভিজাতদের পাকামিটাও রপ্ত করতে চেষ্টা কোরো না। বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, খাঁটি চাষীর রক্ত তোমার ধমনীতে বইছে। তোমার এখন কি দরকার তা আমি বুঝতে পারছি। এক স্বর্গের দেবী চাই, যে তোমাকে টেনে নিয়ে আসবে তোমার এই দুঃখবাদ থেকে।

লাভ্রেৎস্কী বললেন, বন্ধু, যথেষ্ট হয়েছে, স্বর্গের দেবী যথেষ্ট দেখেছি, আর নয়।

তুমি একটা অসূয়াবাদী, মিখালেভিচ চেঁচিয়ে উঠল।

তুমি ভুল করছ। কথাটা অসূয়াবাদী নয়, অসূয়ক।

অসূয়াবাদীই তো, একটুও লজ্জা না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মিখালেভিচ।

গাড়িতে বসেও তার কথা থামে না। পরিচারক বার করে নিয়ে এল তার হালকা হলদে রঙের বাক্সটা, সে গাড়িতে পুরানো জোব্বাটা জড়িয়ে আরাম করে বসে রাশিয়ার ভাগ্য নিয়ে তর্ক করতে লাগলো। হাত সে বারবার শূন্যে তুলছে, মনে হচ্ছে রাশিয়ার মঙ্গলের বীজ সে ছড়াচ্ছে চারদিকে। এবার ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো···তার চীৎকার শোনা যাচ্ছে···'আমার শেষের তিনটে কথা মনে রেখ!' গাড়ি থেকে দেহের অর্ধেকটা বার করে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'মনে রেখো, শেষ তিনটে কথা··· ধর্ম-প্রগতি আর মানবতা···বিদায়!' তার টুপী-পরা মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। লাভ্রেৎস্কী একা সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি তাকিয়ে রইলেন ব্যগ্র দৃষ্টিতে, গাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে ভাবলেন, মনে হয়, ও ঠিকই বলেছে। আমি একটা অকর্মণ্য। মিখালেভিচ যা বলেছে, তার অনেক কথাই তখন তার মনে দাগ কেটে বসেছে। তর্ক তিনি করেছেন, মতের মিলও হয় নি, কিন্তু তবু দাগ তো কেটে দিলে। মানুষটি যদি ভাল হয়, তার যুক্তির তো দাম কম নয়— আর সে-যুক্তিকে কি রোখা যায়?

ছাব্বিশ

দুদিন পরে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না ভ্যাসিলিয়েভ্‌স্কোয়েয় এলেন। তার কথা তিনি রাখলেন। সঙ্গে এল মেয়েরা। এসেই বাগানে ছুটে গেল

মেয়েরা; মারিয়া শ্লথ গমনে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ালেন। অলস চোখ বুলিয়ে সবকিছুই তারিফ করলেন। কথায়ও তাঁর অলসতা। তিনি ভাবছিলেন, লাভ্রেৎস্কীর নিমন্ত্রণে এসে তিনি তাকে ধন্য করেছেন, এ ত যেন দাতার এক মহাদান। আন্তন আর আপ্রেক্সিয়া পুরানো দিনের প্রথা অনুসারে তাঁর হাতে চুমু খেল, তিনি প্রসন্ন হাসি বিতরণ করে তাদের কৃতার্থ করলেন। তারপরে আস্তে আস্তে চায়ের কথা পাড়লেন। আন্তন ভ্রূভঙ্গী করলে, সে আজকের উৎসবের জন্য পরেছে সাদা দস্তানা। মহিলা-অতিথিকে চা এনে দিলে লাভ্রেৎস্কীর মাইনে-করা খানসামা। আন্তনের মত—সে আর যাই হোক, সহবৎ শেখেনি! কিন্তু আন্তনের মর্যাদা খাবার টেবিলে অক্ষুণ্ণই রইল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার চেয়ারের পেছনে সে এসে দাঁড়াল, আর তার সেই পদমর্যাদা কাউকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হোলো না। ভ্যাসিলিয়েভস্কয়ে অতিথি—সমাগম অভাবনীয় ব্যাপার। সে খুসিতে ভরপুর। তার প্রভুর সঙ্গে অভিজাতদের মেলামেশা আছে, এতেই তার আনন্দ। শুধু তারই যে উত্তেজনা এসেছে তা নয়। লেমও যেন কেমন উত্তেজিত। তিনি পরেছেন ধূসর রঙের খাটো কোট, গলায় রুমাল জড়িয়েছেন, বার বার খেঁকারি দিয়ে গলা সাফ করছেন আর পরম সৌজন্যভরে অতিথিদের জন্য পথ করে দিচ্ছেন। লাভ্রেৎস্কী বুঝতে পারলেন, লিজা আর তাঁর ভিতরে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তা এখনো অটুট আছে। লিজা এসেই যখন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, তিনি খুসি হয়েই উঠলেন। খাওয়ার পরে লেম পকেট থেকে বার করলেন একটা স্বরলিপির ছোট্ট বাণ্ডিল, সেটা পিয়ানোর উপর রেখে দিলেন। নক্ষত্র নিয়ে লেখা পুরানো জার্মান প্রেম-গাথায় সুর বেঁধে দিয়েছেন তিনি। লিজা স্বরলিপি পেয়েই বসে গেল পিয়ানোয়।… হায়, সুর তো যেন কেমন একঘেয়ে! সুরকার প্রকাশ করতে চেয়েছেন

গভীরতা, কিন্তু পারেন নি। আছে সেখানে প্রয়াস আর কিছু নেই। লাভ্রেৎস্কী লিজা দুজনেই তা অনুভব করলেন। লেমও বুঝলেন—একটি কথাও না বলে তিনি স্বরলিপির বাণ্ডিল আবার পকেটে পুরে ফেললেন। লিজা অনুরোধ করলে, কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন। যেন নিজের ভিতরে তিনি গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, এবার উঠে চলেও গেলেন।

বিকেলে মাছ ধরতে গেলেন সবাই। বাগানের প্রান্তে পুকুর, সেখানে রুই আর নানা মাছের মেলা। পুকুরের ধারে গাছের ছায়ায় আরামকেদারায় বসলেন মারিয়া। তাঁর হাতে সবচেয়ে সেরা ছিপ। আন্তন পাকা মাছধরিয়ে; সে রইল তাঁর পাশে পাশে। সে বড়শীতে টোপ গাঁথলে, বড়শী ফেলার কায়দাও তার আলাদা। লেম খুদে মেয়ে দুটিকে নিয়ে বাঁধের কাছে চলে গেলেন, লাভ্রেৎস্কী বসলেন লিজার পাশে। মাছ চারে আসছে, বড়শী ঠোকরাচ্ছে! বড়শী মাঝে মাঝে উঠে আসছে, শূন্যে রুই মাছের সোনালি আর রূপালি মেশানো ঝলক; খুদে মেয়ে দুটি চেঁচিয়ে উঠছে আনন্দে। এমন কি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাও দু-দুবার চেঁচিয়ে উঠলেন। লাভ্রেৎস্কী আর লিজাই মাছ ধরলেন কম; সেদিকে তাঁদের মনও নেই। তাঁদের আশেপাশে ছিপগুলো উঠছে-পড়ছে, শব্দ করছে, স্তব্ধ জলে উঠছে ক্ষীণ আলোড়ন। লিজা একটা ভেলার উপর দাঁড়িয়ে; লাভ্রেৎস্কী একটা উইলো গাছের বাঁকানো গুড়ির উপরে। লিজার পরনে সাদা পোষাক, এক হাতে টুপী, আর এক হাতে ছিপ। লাভ্রেৎস্কী তাকিয়ে আছেন তার মুখখানার দিকে, সুশ্রী ছাঁদের মুখ, চুল কানের পেছনে তোলা, তার কোমল গাল দুখানায় সূর্যের শেষ আলোর ঝলক। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, কি সুন্দর তুমি, আবার পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ালে! কি সুন্দর তুমি! লিজা মুখ ফিরিয়ে চেয়ে

আছে, জলের দিকে তার চোখ, ঠোঁট কুঁচকে আছে, হাসছে নাকি! লাইম গাছ ছায়া করে আছে।

লাভ্রেৎস্কী বললেন, শোন! আমি তো তোমার সঙ্গে সেই দিনের আলাপের কথাই ভাবছি। তুমি এত ভাল।

আমি তো···লিজা বিব্রত হয়ে পড়ল।

হাঁ, তুমি ভাল মেয়ে, আমি তো আনাড়ি, তবু বুঝতে পারি সবাই তোমাকে ভালবাসে। লেমের কথাই ধর না, উনি তো তোমাকে ভালই বেসে ফেলেছেন। লিজার ভ্রূ কুঁচকে গেল; অস্বস্তিতে সে এমনি করে।

লাভ্রেৎস্কী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ওঁর জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে, উনি এত করে সুর তৈরী করলেন, সে সুর সার্থক হল না। তরুণরা ব্যর্থ হলে সইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধরা তো পারেন না। তখন নিজের অক্ষমতার কথা মনে থাকে না। শুনলাম, ভ্লাদিমির নিকোলাই নাকি চমৎকার একখানা গান বেঁধেছেন।

হাঁ, তেমন কিছু নয়, তবে একেবারে খারাপও নয়।

তোমার কি ওঁকে একজন ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞ বলে মনে হয়?

হাঁ, ওঁর প্রতিভা আছে, কিন্তু উনি এদিকে মন দেন না।

মানুষ হিসেবে উনি কেমন?

লিজা হাসলো, তারপর ফিওদরের দিকে একবার তাকালে।

কি একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেস করলেন দেখুন তো। সে বড়শীটা তুলে আবার ফেললে।

অদ্ভুত কেন? আমি আত্মীয় হিসেবেই ওকথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

আত্মীয়?

আমি তোমার মামা হই।

ভ্লাদিমির নিকোলাই বড় ভাল লোক, লিজা বললে। তিনি চতুর; মা তাকে খুব পছন্দ করেন।

তুমি?

বাঃ রে, আমার কেন পছন্দ হবে না; তিনি তো চমৎকার মানুষ!

ওঃ—লাভ্রেৎস্কী চুপচাপ, দুঃখ আর বিদ্রূপের ছাপ তার মুখে। তাঁর তীব্র দৃষ্টির সুমুখে লিজা বিব্রত হয়ে পড়লো। কিন্তু তবু সে হাসছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, ভগবান ওদের মঙ্গল করুন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

লিজা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

আপনি ভুল করছেন ফিওদর ইভানিচ, সে বললে, আপনি মনেও করবেন না…হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসলো, আপনার কি ভ্লাদিমির নিকোলাইকে ভাল লাগে না?

না।

কেন?

আমার মনে হয়, ওঁর হৃদয় নেই।

লিজার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

আপনি লোককে বড় নিষ্ঠুরভাবে বিচার করেন, বহুক্ষণ পরে সে বললে।

আমার তা মনে হয় না। তার প্রতি অবিচার করবার আমার অধিকার কি? আমি নিজেই যখন লোকের বিচারের সুমুখে দাঁড়াতে পারি না। তুমি কি জান না লিজা, আমি লোকের উপহাসের পাত্র… তিনি আবার বললেন, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছ তো?

কি প্রতিশ্রুতি?

আমার জন্যে প্রার্থনা করেছিলে?

হাঁ। রোজই তো করি। কিন্তু একে বিদ্রূপ করবেন না। লাভ্রেৎস্কী

লিজাকে বোঝাতে চাইলেন, অন্যের বিশ্বাসে তিনি ঘা দিতে চান না। এবার মানুষের ইতিহাসে ধর্মের স্থান কোথায় সেকথা বলতে লাগলেন।

এক সময়ে লিজা বললে, মানুষ খৃষ্টান হবে ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্যে নয়, মানুষ মরবে বলেই তার এই বিশ্বাস দেখা দেবে।

লাভ্রেৎস্কী লিজার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কি বললে তুমি ?

কথাটা আমার নয়।

…কিন্তু মৃত্যুর কথা বললে কেন ?

জানিনা। মাঝে মাঝে ঐকথাই ভাবি।

মাঝে মাঝেই ভাব ?

হাঁ।

তোমার দিকে তাকিয়ে তাতো মনে হয় না লিজা। তোমার আশায় উদ্দীপ্ত মুখ—সে মুখে হাসি…

হাঁ, এখন তো আমি সুখী ? লিজা সরলভাবে বললে।

লাভ্রেৎস্কীর ইচ্ছা হোল, তার হাত দুটো চেপে ধরেন, নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিপীড়ন করেন।…

মারিয়ার স্বর ভেসে এল, লিজা, লিজা, দেখ, কেমন একটা রুই মাছ ধরেছি !

আসছি মা, লিজা ছুটে গেল মার কাছে। লাভ্রেৎস্কী বসে রইলেন। তিনি ভাবলেন, ওর কাছে এমন করে বললাম, যেন জীবনের স্বাদ আমি পাইনি। লিজা টুপীটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে গেছে, তার দিকে তাকিয়ে মন ভরে গেল। টুপীর ফিতে দোমড়ানো! তারই দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিজা ফিরে এসে আবার ভেলায় উঠে বসলো।

কিছুক্ষণ পরে সে বললে, ভ্লাদিমির নিকোলাইয়ের হৃদয় নেই—একথা আপনি কেন বললেন ?

হয়তো আমার ভুলও হতে পারে; কিন্তু সময়ে সবই বোঝা যাবে। লিজা চিন্তামগ্ন। লাভ্রেৎস্কী পাড়লেন ভ্যাসিলিয়েভ্স্কোয়ের জীবনের কথা। তার পরিবেশের কথা তিনি লিজাকে বলতে চান, ভালও বুঝি লাগে। লিজা মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছে। সে উত্তরে সারল্য আছে, বুদ্ধির ঝলক আছে। তিনি লিজাকে বলতে লাগলেন।

লিজা বিস্মিত।

সত্যি, আমার তো মনে হয়েছে আমার আর আমার দাসী নাস্তিয়ার নিজস্ব কোনো কথা নেই। সে তো একদিন তার প্রেমিককে বলেছিল, আমার সঙ্গ তো তোমার খারাপই লাগবে; তুমি অত ভাল কথা বল, আর আমার নিজের কোনো কথাই নেই।

লাভ্রেৎস্কী মনে মনে ভাবলেন···কথা যত কম বলা যায় ততই তো ভাল!

সাভাশ

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। সবাই গাড়িতে উঠে বসলেন। লেমকে পাওয়া গেল না। তিনি আগেই চলে গেছেন। সূর্যাস্তের শেষ দীপ্তি মুছে গেছে। রাত ঘন হয়ে এসেছে। হাওয়ায় উষ্ণ অনুভূতি। মারিয়ার ঘুম আসছে, খুদে মেয়ে দুটি আর পরিচারিকা ঘুমিয়ে গেছে। গাড়ি চলেছে দ্রুতবেগে, মসৃণ পথের উপর দিয়ে। লিজা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। চাঁদ উঠেছে, তারই আলো তার মুখে। রাতের গন্ধঘন হাওয়া তার মুখে গালে বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে সুখী। তার হাত গাড়ির দরজার উপরে—লাভ্রেৎস্কীর সান্নিধ্যে। তিনিও সুখী··· গাড়ি ছুটেছে রাতের উষ্ণতায়, লিজার মুখ থেকে তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না, শুনছেন তার কোমল স্বর, ফিসিফিসিয়ে সে বলছে কথা।

মারিয়াকে জাগাবার তার ইচ্ছে নেই—এ মুহূর্ত থাক অমর হয়ে—সবার সজাগ চোখের আড়ালে। তিনি তার হাতের উপর চাপ দিয়ে বললেন, তুমি আমার মিতা তো—তাই না। সে মাথা নাড়লে। গাড়ি চলেছে—হেলে-দুলে উঁচু-নীচু পথ বেয়ে। গ্রীষ্মের রাতের সৌন্দর্য যেন আত্মা ছুঁয়ে দিয়ে গেল—সব কিছু যেন আশ্চর্য, অদ্ভুত—অথচ এতো চেনা তার পরিবেশ ; এক গভীর শান্তি বিরাজ করছে—দৃষ্টি চলে যাচ্ছে সুদূরে—কিন্তু যা দেখছে তার গভীরে তো চোখ যায় না। এই যে শান্তি সেও যেন আজ যৌবনের জোয়ারে উদ্দাম—সেখানে ডেকেছে বান। ঘোড়া ছুটেছে, হেলে-দুলে, তার দীর্ঘ ছায়া এগিয়ে চলেছে পাশে পাশে ! তার খুরের শব্দে যে ধ্বনি উঠছে তাও যেন সুন্দর। আলোর কুয়াশায় ঢেকে গেছে তারার দল ; আধখানা চাঁদ আকাশের শিয়রে ; নীল আকাশে তার নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে—আর তারই খানিকটা মেঘের গায়ে গায়ে মুক্তোর মতো চলকে পড়ছে—মুক্তোর নীল-সোনালি তার দ্যুতি। মেঘ ভেসে চলেছে, রাতের হাওয়ায় চোখে ঘনিয়ে আছে কেমন এক আর্দ্র কুয়াশা—সে চোখ থেকে নেমে এসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর বয়ে যায় হৃৎপিণ্ডে। লাভ্রেৎস্কী পান করছেন সৌন্দর্য, তাকে অনুভব করছেন।···লিজার কথা ভাবছেন···পানশীনকে সে ভালবাসতে পারে না—যদি অন্য পরিবেশে দেখা হোত তাদের—কি হোত ভগবানই জানেন ! লেমের কথাই ঠিক, ওর কোনো মতামত নেই··· কিন্তু তাতো সত্যি নয়—মতামত ওর আছে বই কি।···'অত হালকা করে ভাববেন না'—ওর সেই কথা তার মনে আছে। তিনি আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, মাথা তাঁর নীচু, তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে আবৃত্তি করলেন।

যা কিছু পূজো করতাম, তা পুড়িয়ে ফেলেছি ·
যা কিছু পুড়িয়ে ফেলেছি, আজ তারই পূজা শুরু···

ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন, বাড়ির দিকে লাফিয়ে ছুটলো ঘোড়া।

পরের দিন একঘেয়েভাবেই কাটলো। ভোর থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। লেম মুখ বিকৃত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইলেন। লাভ্রেৎস্কী শোবার সময় একগাদা ফরাসী সংবাদপত্র নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। দু সপ্তাহ ধরে সেগুলির মোড়ক খোলা হয়নি। মোড়ক খুলে দৈনিক কাগজের উপরে চোখ বোলালেন, নতুন কিছু নেই। কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কি হোলো! যেন কিছুতে কামড়েছে, এমনিভাবে লাফিয়ে উঠলেন। কাগজে পুরানো বন্ধু মঁসিয়ে জ্যুলের একটা লেখার দিকে চোখ পড়লো। জ্যুলে তার পাঠকদের জানাচ্ছেন, বিলাসের রাণী মাদাম দ্য লাভ্রেৎস্কী—প্যারীর মজলিসের যিনি শোভা বাড়াতেন, তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। সংবাদ একেবারে রূঢ় সত্য। তিনি ছিলেন মৃতার বন্ধু···তারপর আছে সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাস।···

লাভ্রেৎস্কী পোষাক পরে বাগানে নেমে এলেন। সকালটা বাগানের পথে পায়চারী করে কেটে গেল।

আটাশ

পরের দিন সকালে লেম লাভ্রেৎস্কীর কাছে গাড়ি চাইলেন, তিনি শহরে ফিরে যাবেন। বললেন, বৃথা সময় নষ্ট করছি; এখন আবার কাজ শুরু করা দরকার। লাভ্রেৎস্কী তখনি জবাব দিলেন না, তিনি যেন আনমনা। তারপরে বললেন, বেশ তো, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। লেম চাকর-বাকরের সাহায্য না নিয়েই জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলেন, স্বরলিপি-খানা পুড়িয়ে ফেললেন। ঘোড়া গাড়িতে জোতা হোলো। তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন লাভ্রেৎস্কী তাঁর পকেটে গুঁজে নিলেন মঁ্যসিয়ে জ্যুলের প্রবন্ধটি! পথে কথাবার্তা তেমন হোল না। দুজনেই নিজের নিজের

চিন্তায় বিভোর। লাভ্রেৎস্কী তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। লেমও স্যুটকেশটি নিয়ে শুষ্ক বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলেন। এবার লাভ্রেৎস্কীর হুকুমে গাড়ি চললো তার নিজের বাড়িতে···শহরে তিনি এখানে এসেই বাড়ি নিয়ে রেখেছিলেন। ক'খানা চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে, তিনি ছুটলেন কালিতিনদের বাড়িতে। বসবার ঘরে পানসীন একা। সে তাকে দেখেই আলাপ জুড়ে দিলে। লিজা তাকে এরই মধ্যে লাভ্রেৎস্কী সম্বন্ধে বলেছে যে, তিনি চমৎকার লোক। পানসীন তাই তার মন পাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল। সে শুরু করলো জীবনের আদর্শ, রাশিয়ার ভবিষ্যতের কথা। লাভ্রেৎস্কী তার লম্বা-চওড়া কথা শুনে গেলেন নিস্পৃহ-ভাবে। পানসীন বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। এবার এলেন মারিয়া, সঙ্গে গিদিয়োনোভ্স্কী; তারপরে মারফা আর লিজা। তারপরে এসে পৌঁছলেন মাদাম বেলেনিৎসীনা—সঙ্গীতের তিনি ভক্ত। লুটিয়ে পড়া তার গাউন, ভারী সোনার বালা দুহাতে। হাতে ঝলমলে হাত-পাখা। সঙ্গে তার মোটাসোটা স্বামীটা—মস্ত তার পা আর গোদা গোদা হাত। তার স্ত্রী সমাজে তার সঙ্গে কথা বলেন না, তবে নিভৃতে তাকে আদর করে খুদে শুয়োর বলে ডাকেন। ঘর ভরা লোক, গোলমাল। লাভ্রেৎস্কীর ভাল লাগলো না। লিজার সঙ্গে গোপনে কথা বলবেন, তাই তিনি আছেন, নইলে চলে যেতেন। কিন্তু বহুক্ষণ সুযোগ মিললো না। শুধু বারবার চোখ তুলে তাকে দেখতে লাগলেন। কি সুন্দর লিজা! লিজা মাদাম বেলিনিৎসিনার পাশে বসেছিল গম্ভীর মুখে। লাভ্রেৎস্কীর দিকে একবার সে তাকালে। তার মনে হো'ল, তিনি যেন কি বলতে চান। কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করতে সে ভয় পেল, কেন এ ভয় সে বুঝতে পারল না। এবার সে পাশের ঘরে চা করতে চলে গেল। লাভ্রেৎস্কীও সেখানে এলেন।

সামোভারে চায়ের কেৎলি চাপাতে-চাপাতে লিজা জিজ্ঞেস করলে, আপনার কি হয়েছে?

কেন বল তো ?

আগের সে-আপনি নেই।

লাভ্রেৎস্কী ঝুঁকে পড়ে বললেন, তোমাকে একটা খবর দিতে চাই, কিন্তু বলা তো এখন অসম্ভব। এই যে খবরের কাগজের দাগ-দেওয়া ছত্র ক'টা পড়ে দেখো। কাউকে বোলো না, কাল আবার আসব।

লিজা হতবাক্…পানসীন এসে দাঁড়ালো দরজায়। সে খবরের কাগজ খানা পকেটে পুরে ফেললে।

পানসীন এসেই জিজ্ঞেস করলে, এলিজাবেথা মিথাইলোভ্না, আপনি কি ওবারমান পড়েছেন।

লিজা অস্ফুট স্বরে কি বলে উপরে চলে গেল। লাভ্রেৎস্কী বসবার ঘরে ফিরে এলেন, তাস খেলার টেবিলে গিয়ে বসলেন। মারফা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, তার খেলার জুড়ি গিদিয়োনোভস্কীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। লোকটা একেবারে খেলতে জানে না। এতো আর গুজগুজ ফুসফুস করা নয়।

লিজাও এক সময়ে ফিরে এসে এক কোণে বসে পড়লো। লাভ্রেৎস্কী তার মুখের দিকে তাকালেন; সেও তাকালে—দুজনেই ভীত। কেমন বিব্রত লিজা, বুঝি বা ভর্ৎসনার কটাক্ষ তার চোখে। কিন্তু কথা তো বলবার উপায় নেই। অতিথিদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে থাকতে আর পারছেন না লাভ্রেৎস্কী। লিজার কাছে বিদায় নেবার সময় বললেন, কাল দেখা হবে।

আসবেন! লিজা উত্তর দিলে।

লাভ্রেৎস্কী চলে যেতে পানসীন যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো; গিদিয়োনোভ্স্কীকে পরামর্শ দিতে লাগলো, কখনো বা মাদাম বেলিনিৎসীনাকে ক্ষেপাতে লাগলো; তারপরে গাইলো গান।

লাভ্রেৎস্কী সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। তিনি দুঃখ পান নি, একটুও চঞ্চল হন নি ; তবু ঘুম এল না। অতীতের স্মৃতিও মনে করতে পারলেন না। শুধু অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুকে স্পন্দন জাগলো ; প্রহরের পর প্রহর চলে গেল, কিন্তু ঘুম চোখে এল না— সে-কথা ভাবতেও পারলেন না। কখনো বা মনে ভাবনার ঝলক খেলে গেল ; হয়তো সত্যি নয়, হয়তো গুজব—তারপর আবার ভাবতে বসলেন। জীবনের পর্যালোচনা শুরু হোলো।

উনত্রিশ

পরদিন সকালে যখন লাভ্রেৎস্কী এলেন, মারিয়াও যথেষ্ট ভদ্রতা দেখালেন না। তিনি ভাবলেন, তাহলে ওর আসা-যাওয়া শুরু হোল। তিনি লাভ্রেৎস্কীকে অগ্রাহ্যই করে আসছিলেন। তাকে অতিথি বলে তিনি মনে করেন নি, আত্মীয় বলেই তিনি ভাবতেন। তাও আবার অবাঞ্ছিত। মারিয়াকে সম্ভাষণ জানিয়ে লিজাকে নিয়ে লাভ্রেৎস্কী এলেন বাগানে। সুরোচকা আর লেনোচকাও সেখানে খেলা করছিল।

লিজা শান্ত সংযত, কিন্তু ম্লানমুখী, সে পকেট থেকে ভাজ করা কাগজখানা লাভ্রেৎস্কীকে ফিরিয়ে দিলে।

সত্যিই ভয়ানক ব্যাপার ! লিজা বললে।

লাভ্রেৎস্কী চুপ করে রইলেন।

হয়তো সত্যিও না হতে পারে।

লিজা পায়চারী করতে করতে বললে, বলুন, আপনি দুঃখিত হয়েছেন কিনা ? একটুও হন নি ?

আমার যে কি হয়েছে, আমি নিজেও বুঝতে পারছি না লিজা। লাভ্রেৎস্কী বলে উঠলেন।

আপনি তো তাকে ভালবাসতেন ?

হাঁ।

খুবই বাসতেন ?

হাঁ।

তার মৃত্যুতে আপনার দুঃখ হয় নি ?

আমার কাছে তার মৃত্যু তো অনেক আগেই হয়েছে।

আপনি যা বলছেন, এতো পাপীর কথা···আমার উপর রাগ করবেন না। আমাকে বন্ধু বলে মনে করবেন—বন্ধু তো সবই বলতে পারে। আমার খুবই খারাপ লাগল···আপনার কালকের মুখের অবস্থা দেখে আমি খুসি হইনি·· মনে আছে, সেদিন তার বিরুদ্ধে আপনি নালিশ করছিলেন—হয়তো তখন তিনি মারা গেছেন। কি ভয়ানক। আপনার উপরেই এল শাস্তি।

লাভ্রেৎস্কীর মুখে তিক্ত হাসি···

তোমার কি তাই মনে হয় ? যা-ই-ই হোক, আমি তো এখন মুক্ত।

লিজা শিউরে উঠলো···

আপনি অমন করে বলবেন না! এই মুক্তি আপনার কাছে কি নিয়ে আসবে ? এখন ওকথা ভাববেন না, এখন তো শুধু ক্ষমার কথা···

লাভ্রেৎস্কী অসহিষ্ণু হয়ে হাত নেড়ে বললেন, অনেক দিন আগেই তাকে আমি ক্ষমা করেছি।

লিজা উত্তেজিত হয়ে উঠলো···

আপনি ভুল করলেন। আপনাকেই ক্ষমা চাইতে হবে···

কার কাছে ?

ভগবানের কাছে ? তিনি ছাড়া আর কে ক্ষমা করবেন ?

লাভ্রেৎস্কী তার হাত চেপে ধরলেন।

বিশ্বাস কর লিজা, আমি যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি। ঢের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

লিজা অস্ফুটস্বরে বললে, আপনি সত্যিই বলছেন, কিন্তু আপনি ভুলে গিয়েছিলেন—সেদিন আমার কাছে আপনি বলেছিলেন—তাকে ক্ষমা করতে আপনি রাজি নন…

নিঃশব্দে তারা চলতে লাগলেন।

হঠাৎ থেমে পড়ে লিজা বললে, আপনার মেয়ে কেমন আছে?

লাভ্রেৎস্কী চমকে গেলেন।

তুমি উদ্‌বিগ্ন হোয়ো না। মেয়ের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা আমি করেছি।

লিজা হাসলো, হাসি তিক্ততায় তীক্ষ্ণ।

লাভ্রেৎস্কী ধীরে ধীরে বললেন ঠিকই বলেছ, আমার এই মুক্তির দাম কি? সত্যিই আমার কাছে এর কি দাম?

খবরের কাগজখানা কখন পেলেন? তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো লিজা।

তোমরা যেদিন গিয়েছিলে, তার পরের দিন।

আপনি সত্যি বলেছেন…সত্যি বলছেন, আপনি কাঁদেন নি?

না, শুধু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম; চোখের জল কোথা থেকে আসবে? অতীত নিয়ে কাঁদব! যে অতীত আমাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, তাকে নিয়ে চোখের জল ফেলব? তাকে তো আমি বিদায় দিয়েছি। সে আমার আত্মার সুখ শান্তি ধ্বংস করতে পারবে না। তার যে অস্তিত্ব আছে, তাই-ই আমি ভুলে গেছি। আর কাঁদবারই বা কি আছে। এক পক্ষ আগে হলে হয়তো একটু বা দুঃখই পেতাম কিন্তু আজ তো আর সেদিন নেই।

এক পক্ষ? এক পক্ষকালের মধ্যে এমন কি ঘটলো আপনার জীবনে? লিজা জিজ্ঞেস করলে।

লাভ্রেৎস্কী নিরুত্তর। হঠাৎ লিজার মুখ রক্তালো হয়ে উঠলো। লাভ্রেৎস্কী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, হাঁ, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ লিজা—আমি এই এক পক্ষের মধ্যে নারীর নিষ্পাপ হৃদয়ের যে কি মূল্য বুঝতে পেরেছি। আমার অতীত যেন আরো বহু দূরে সরে গেছে…

লিজা অপ্রতিভ। সে ফুলের কেয়ারীর দিকে চলেছে। ওখানে খেলছে লেনোচকা আর স্যুরোচ্কা।

তার পিছনে যেতে যেতে লাভ্রেৎস্কী বললেন, তোমাকে খবরের কাগজখানা দেখিয়ে আমি খুসি হয়েছি। তোমার কাছে আমার লুকোবার কিছুই নেই। আমিও চাই, তোমারও আমার উপর যেন এমনি বিশ্বাস থাকে।

লিজা অস্ফুট স্বরে বললে, আপনি কি তাই ভাবেন ?·· তাহলে—না, না,—সে তো অসম্ভব !…

কি অসম্ভব লিজা ! বল, বল !

বলা হয়তো উচিত নয়…কিন্তু…লাভ্রেৎস্কীর দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু অর্ধেক বিশ্বাসের মূল্য কি ? জানেন, আজ একখানা চিঠি পেয়েছি।

পানসীনের কাছ থেকে বুঝি ?

হাঁ…আপনি জানলেন কি করে ?

সে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে ?

হাঁ, লিজার নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি, কিন্তু তাতে আছে গাম্ভীর্য।

লাভ্রেৎস্কীও তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

কি উত্তর তুমি তাকে দিলে ?

কি যে উত্তর দেব জানি না।

কেন ? তুমি কি তাকে ভালবাস না।

তাকে ভাল লাগে—চমৎকার লোক।

তিনদিন আগে এই কথাই বলেছিলে বটে ! আমি জানতে চাই লিজা, তুমি কি তাকে বুকের সবখানি কামনা দিয়ে ভালবাস—আমরা তো তাকেই ভালবাসা বলি।

আপনি যা বলছেন—তাতো নয়।

তুমি তাকে ভালবাস না ?

না, কিন্তু তার কি দরকার আছে ?

কি ?

মার ওকে ভাল লাগে, লিজা বললে। মনটা ওঁর ভাল। আপত্তির তো কোন কারণ নেই।

কিন্তু তবু মত দিতে ইতস্তত: করছ ?

হাঁ…হয়তো আপনার জন্যে—আপনি যা বলছেন তার জন্যে মত দিতে গিয়ে ভাবছি। কাল কি বলেছিলেন, মনে আছে ? কিন্তু এতো দুর্বলতা…

তুমি বড় ছেলেমানুষ লিজা, লাভ্রেৎস্কী চেঁচিয়ে উঠলেন, দু'মনা হয়ে তো লাভ নেই—তোমার বুকে যে কথা চীৎকার করে উঠছে, তাকে দুর্বলতা বোলো না। তোমার হৃদয় তো ভালবাসা না পেলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় না। যাকে ভালবাস না, তার প্রতি দায়িত্ব আছে বলে কেন ভাবছ, তার কাছে কেন নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইছ ? এর চেয়ে ভয়ানক কথা তো আর নেই…

আমার নিজের তো কিছু বলবার নেই, আমাকে যা বলা হচ্ছে তাই-ই করছি—লিজা বলতে লাগলো।

কার কথা তুমি শুনছো ! তোমার হৃদয় যা বলে তাই-ই তো তুমি শুনবে, এখানে হৃদয়ই বলতে পারে সত্য কথা, লাভ্রেৎস্কী বলে উঠলেন। অভিজ্ঞতা বিচার বুদ্ধি—সবতো মিছে এখানে। পৃথিবীর একমাত্র সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরো না।

আপনি—আপনি একথা বলছেন ফিওদর ইভানিচ? আপনি না ভালবেসে, ভালবাসার জন্যেই বিয়ে করেছিলেন? সুখী হতে কি পারলেন?

লাভ্রেৎস্কী হাত দুখানা উপরে তুললেন। নিরাশার ভঙ্গী সেখানে।

আমার কথা বোলো না লিজা! তুমি তো বুঝবে না—এক তরুণ, ছলা কলা সে জানত না, কড়া শাসনে সে মানুষ হয়ে ছিল—সে কি ভুল করতে পারে! সে তো ছলনাকেই ভালবাসা বলে আঁকড়ে ধরেছিল···আর নিজের উপর অবিচার করবো কেন? আমি সুখ পাইনি, একথা তো বলব না। সুখ আমি পেয়েছিলাম!

লিজার স্বর মৃদু হয়ে এল (যখন কারো যুক্তি সে মেনে না নেয়, তখন স্বর তার মৃদু হয়ে আসে; সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে), ফিওদর ইভানিচ, পৃথিবীর সুখ কি আমাদের উপর নির্ভর করে? আমার তো তা মনে হয় না।

করে—নির্ভর করে। আমাকে বিশ্বাস করো লিজা (তিনি লিজার হাত চেপে ধরলেন, লিজার মুখ বিবর্ণ, ভীত চোখেই বুঝি তাকাচ্ছে, কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি তো স্থির) যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রেমকে কবর না দিই, ততক্ষণ পর্যন্ত তো সুখ আমাদেরই—আমরাই তাকে রচনা করি। কারো কাছে ভালবাসা আসে দুর্ভাগ্য নিয়ে; কিন্তু তুমি তো ধীর-স্থির নিষ্পাপ—তোমার জীবনে তার আঁচ তো লাগবে না। শুধু আবার অনুরোধ, ভাল না বেসে শুধু কর্তব্য হিসেবে বিয়ে কোরো না, নিজেকে বলি দিও না···সুবিধে হবে একথা ভেবে বিয়ে কোরো না, সে তো সর্বনাশা ব্যাপার! আমার বলবার অধিকার আছে বলেই বলছি। আমি এই অধিকার পাবার জন্য যথেষ্ট ক্ষতি-স্বীকার করেছি, আর তোমার ঈশ্বর যদি—

হঠাৎ তিনি টের পেলেন লেনোচকা আর সুরোচকা এসে দাঁড়িয়েছে লিজার পাশে। তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। তিনি লিজার

হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমাকে মাপ করো! এবার বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

আবার ফিরে এসে বললেন, শুধু আমার একটা অনুরোধ, চট করে কিছু করে বোসো না, আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখ! যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, যদি সুবিধের দিক থেকেই বিয়ে করতে হয়—পানসীনকে বিয়ে কোরো না। সে তোমার স্বামী হবার যোগ্য নয়··· তুমি তো কথা দিয়েছ, চট করে কিছু করে বসবে না—তাই না?

লিজা কি বলতে গেল—কিন্তু কথা বেরুলো না। সে যে চট করে কিছু করে বসবে সেজন্যে নয়, তার বুক কাঁপছে, কি এক অনুভূতিতে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এ অনুভূতি ভয়ের মতোই শ্বাসরোধী—কিন্তু ভয় তো নয়।

ত্রিশ

কালিতিনদের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পথে পানসীনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। দুজনেরই কেমন ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ ভাব। লাভ্রেৎস্কী বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন, উচ্ছ্বাস তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—এমন অনুভূতি বুঝি জীবনে আসে নি। সে কি বেশি দিনের কথা, যখন জীবন ছিল শান্ত সমাহিত? তখন তিনি পেয়েছিলেন জীবনের কূল, ভিড়েছিল তরী। কিন্তু আজ এ পরিবর্তন কেন? আজ আবার দুস্তর সমুদ্র। কিছু না, অতি মামুলি এক ব্যাপার—হঠাৎ এলেও—এ তো মামুলি—মৃত্যুর মামুলি খবর। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর কথা তো তিনি ভাবছেন না, নিজের মুক্তির কথাও না, ভাবছেন লিজা কি উত্তর দেবে পানসীনকে। ওকে যেন আলাদা

চোখে দেখছেন এই কদিন ধরে, রাতের নীরবতায় ওর কথাই হানা দেয়। ভাবছেন, শুধু যদি···যদি ···সেই অসম্ভবই আজ সম্ভব হয়ে গেল, কিন্তু যে ভাবে ভেবেছিলেন, সে-ভাবে তো নয়। তার মুক্তি তো এখন আর আসল কথা নয়। তিনি ভাবছেন, ও হয়তো মার কথা শুনবে, পানসীনকে বিয়ে করে বসবে! আয়নার কাছে এসে নিজের মুখ দেখে মাথা নাড়লেন লাভ্রেৎস্কী।

দিন কেটে গেল রোমন্থনে। আবার কালিতিনদের ওখানে চললেন। দ্রুত চলছিলেন, বাড়ির কাছে এসে গতি মন্থর হয়ে এল। পানসীনের গাড়ি থেমে আছে বারান্দায়। লাভ্রেৎস্কী মনকে বোঝালেন, এমন আত্মসর্বস্ব মানুষ কেন তুমি; এস, দেখ! ভিতরে কেউ নেই, বসবার ঘরে কথার গুঞ্জন উঠছে না। দরজা তবু খুলে ফেললেন। মারিয়া পিকেট খেলছেন পানসীনের সঙ্গে। তাঁকে দেখে ভ্রূ তার কুঁচকে গেল।

হঠাৎ এলে যে?

লাভ্রেৎস্কী কাছে বসে ওঁর হাতের তাস দেখতে লাগলেন।

তুমি খেলতে পার নাকি? বিরক্তি গোপন করে বললেন মারিয়া। তারপরেই বলে উঠলেন, ভুল তাস তিনি খেলে বসেছেন!

পানসীন নীরবে খেলছে, এমনি খেলা পাকা খেলোয়াড়রাই খেলেন। বোধহয় এমনি খেলা দেখিয়েই সেন্টপিটার্সবুর্গে সে অভিজাত সমাজে নাম কিনেছে। একশো, একশো দুই হরতন, একশো তিন—ডাক উঠছে, মাপা স্বরে ডেকে যাচ্ছে। লাভ্রেৎস্কী বুঝলেন না, একি ভর্ৎসনা না আত্মতুষ্টির স্বর। যাই হোক, এ এক পাকা চাল।

পানসীন গম্ভীর হয়ে তাস ভাঁজছে আবার। লাভ্রেৎস্কী বললেন, মারফা দিমো'ফয়েভ্‌নার সঙ্গে দেখা হবে?

মারিয়া উত্তর দিলেন, দেখ না বোধ হয় উপরে আছেন।

লাভ্রেৎস্কী চলে গেলেন উপরে। মারফাও তাস খেলছেন, বুড়ী ঝি আর নাস্তাশিয়া কার্পোভ্‌না তার খেলার জুড়ি। রোস্কা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। বৃদ্ধারা খুশি।

চেঁচিয়ে মারফা বলে উঠলেন, আরে এস, এস ফিদিয়া, আমার পাশে বোসো। এখুনি খেলা শেষ করে দিচ্ছি। মোরব্বা একটু এনে দেবে! সুরোচকা, জামের মোরব্বা নিয়ে আয় তো। খাবে না? বেশ, তাহলে খেলা দেখ, আবার পাইপ টানতে বোসো না। তোমার ও তামাকের গন্ধ আমার সয় না, ওতে হাঁচি পায়, কাশি পায়।

লাভ্রেৎস্কী জানালেন, তামাক খাবার তার একটুও ইচ্ছে নেই।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, নীচে কাকে দেখলে? এখনো পানসীন আছে নাকি? লিজাকে দেখলে? না? ও তো এখানে আসবে বলেছিল। আরে এই তো বলতে বলতেই এসেছে। এস গো মণি আমার!

লিজা এসে ঘরে ঢুকলো। লাভ্রেৎস্কীকে দেখে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

আমি এক মিনিটের জন্যে এলাম।

এক মিনিটের জন্যে কেন? আরে মেয়েদের আজকাল এমন উড়ে উড়ে বেড়ান স্বভাব কেন? দেখছ—আমার ঘরে অতিথি আছে—বোসো, ওর সঙ্গে দুটো কথা কও।

লিজা চেয়ারের এক কোণে বসে পড়লো, লাভ্রেৎস্কীর দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে, তাকে সে পানসীনের সঙ্গে কি কথা হোল তা বলবে। কিন্তু কী করে বলবে? লজ্জা করছে, কেমন বিব্রত সে। ওঁর সঙ্গে তো বেশি দিনের জানা নয়। তাছাড়া উনি গীর্জায় যান না, স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখ করেন না—তবু ওঁকেই সে বলবে গোপন কথা! কেন বলবে না, ওঁকে সে বিশ্বাস করেছে, ভাল লেগেছে তার। যেন তার নিষ্পাপ

কৌমার্যের নিকুঞ্জে এল এক পর-পুরুষ। মারফা আবার কথা বললেন। লিজাকে যেন বাঁচিয়ে দিলেন।

ওর সঙ্গে তুমি কথা না কইলে, কে কইবে বল! আহা বেচারী! আমি তো বুড়ো মানুষ, আমার সঙ্গে কথা কয়ে তো সুখ পাবে না। নাস্তাশিয়ার আবার ছোকরার বাই—তা ওতো সে হিসেবে বুড়ো।

লিজা বললে, আমি কি আলাপ করব? উনি যদি চান তো, আমি পিয়ানোয় কিছু বাজিয়ে শোনাতে পারি।

মারফা বলে উঠলেন, তাহলে তো বেশ হয়। যাও, নীচে গিয়ে তাই-ই শোনাও।

লিজা উঠে পড়লো, লাভ্রেৎস্কী তার পিছনে। সিঁড়িতে নামতে নামতে সে বললে, মানুষ যে বলে, মানুষের মন বড় এলোমেলো, কথাটা বুঝি খুবই সত্যি! আপনার জীবনের কাহিনী শুনে আমার তো দমে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমি···

তুমি কি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছ?

না, তবে মতও দিই নি। আমার মনের কথা তাকে বলেছি। বলেছি, অপেক্ষা কর। আপনি খুশি তো? মুখে হাসি খেলে গেল। তারপর সে রেলিঙের উপর হাত রেখে তর্‌তর্ করে নীচে নেমে এল।

পিয়ানোর ঢাকনাটা খুলে বললে, কি বাজাব বলুন?

যা ইচ্ছে।

লিজা বাজাচ্ছে, চোখ তার আঙুলের উপর। এবার সে বাজনা থামিয়ে তাকালো লাভ্রেৎস্কীর দিকে। এ মুখ যেন লাভ্রেৎস্কীর নয়, অপরিচিত মুখ, তবু মনে দাগ কেটে বসে যায়।

কি হোল আপনার? লিজা জিজ্ঞেস করলো।

কিছু না। আমি খুশি হয়েছি। আবার বাজাও।

লিজা একটু থেমে বললে, আমার কি মনে হয় জানেন, ও যদি

আমাকে ভালবাসতো, অমন করে চিঠি লিখত না। ওর তো তাহলে মনে হোত, এখনো চিঠি লেখার সময় আসে নি, ওর প্রস্তাবের উত্তর দেওয়ার এখনো সময় হয় নি।

ওটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তুমি তাকে ভালবাস না।

ওকথা বলবেন না! আমি ভাবছি আপনার মৃতা স্ত্রীর কথা! আপনি কিন্তু আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।

ওল্ডেমার, আমার লিজা কিন্তু চমৎকার বাজায়, মারিয়া বাজনা শুনে বলে উঠলেন।

পানসীন জবাব দিলে, হাঁ, চমৎকার!

মারিয়া তাকালেন তার তরুণ জুড়ির দিকে। সস্নেহ তার দৃষ্টি। পানসীন গম্ভীর, সে যেন তাসে মগ্ন। সে ডেকে উঠলো: চোদ্দ…

একত্রিশ

লাভ্রেৎস্কী তরুণ নন। মোহঘোরে তিনি চলেন না। লিজার প্রতি তার অনুভূতির অর্থ তিনি বুঝে ফেললেন। তিনি তাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন। কিন্তু মন তাতে খুশি হয়ে উঠলো না। তিনি ভাবলেন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আর কিছু করবার পেলাম না! আবার কিনা আর-এক নারীর কাছে আত্মাকে গচ্ছিত রাখতে যাচ্ছি? তবে লিজা তো তার মতো নয়। সে দাবী কিছু করবেন না, পড়াশুনোয় বিঘ্ন ঘটাবে না—বরং উৎসাহ যোগাবে। আমরা এগিয়ে যাব হাত ধরাধরি করে জীবনের পথে। হাঁ, যাবই তো, কিন্তু ওর তো আমার সঙ্গে সে পথে চলতে ইচ্ছে নেই। ও বলেনি, আমাকে দেখে ওর ভয় হয়? কিন্তু পানসীনকেও ও ভালবাসে না। এই কি সান্ত্বনা!

লাভ্রেৎস্কী ভাসিলভ্স্কোয়ে ফিরে গেলেন, কিন্তু সেখানে চারটি দিনও কাটাতে পারলেন না। কেমন একঘেয়ে লাগলো। তাছাড়া আছে উদ্বেগ। জুলের লেখার প্রমাণ চাই। চিঠিপত্র কিছু আসে নি। তিনি আবার ফিরে গেলেন শহরে। কালিতিনদের ওখানে সন্ধ্যাটাও কাটলো। মারিয়া সন্তুষ্ট নন। তার মন পেলেন তাস খেলায় হেরে। লিজার সঙ্গে দেখাও হোল। পরিবর্তন এসেছে তার। কি যেন ভাবছে। রবিবারে প্রার্থনায় যাবেন নাকি সে জিজ্ঞেস করলে। সে বললে, চলুন, দুজনে তার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করব। তারপরে কথায় কথায় বললে, পানসীনকে অপেক্ষায় করিয়ে সে ভাল কি মন্দ করলো জানে না।

কেন? লাভ্রেৎস্কী শুধালেন।

আমি তো জানি, কি আমি করব।

লিজা মাথা ধরেছে বলে বিদায় নিয়ে উপরে চলে গেল।

পরদিন লাভ্রেৎস্কী গীর্জায় গেলেন।

লিজা আগেই এসে পৌঁছেছে। তাকে সে দেখলো কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকালো না। প্রার্থনার সময় তার চোখে জ্বলে উঠলো আলো, সে নত হয়ে বেদীর উপর প্রণাম করলে। লাভ্রেৎস্কীর মনে হোল লিজা তার জন্যেও প্রার্থনা করছে। চারদিকে নিস্তব্ধ মানুষের সার—পরিচিত মুখ, মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি, ধূপের গন্ধ, জানালা দিয়ে আলোর তীর্যক রেখা এসে পড়েছে—দেয়ালে আর ছাদে জমে আছে অন্ধকার। সবই যেন মন ছুঁয়ে যায়। বহুদিন পরে গীর্জায় এলেন তিনি—ঈশ্বরকে তিনি জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন! এখন পর্যন্ত প্রার্থনার সুরে সুর মেলাতে পারেন নি—মনেও সে ভাষার রেশ বাজছে না—কিন্তু মুহূর্তের জন্য মন যেন নিজেকে লুটিয়ে দিল ঐ উপাসনা বেদীর তলায়। লিজার দিকে তিনি তাকালেন···আমাকে এখানে এনেছ তুমি, আমার আত্মাকে স্পর্শ কর লিজা, ছুঁয়ে দাও···

গীর্জার বারান্দায় আবার দুজনে দেখা। লিজা ছুটে এল তাঁর কাছে। মুখে তার প্রশান্ত গাম্ভীর্য, চোখে ঝলমল করছে আলো। উঠোনের কচি ঘাসের উপর পড়েছে রোদ। নরনারীর পোষাকের নানা রঙ; ঘণ্টা বাজছে, স্প্যারো পাখী ডাকছে ঝোপে; লাভ্রেৎস্কী দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় তাঁর টুপী নেই। হাওয়ায় উড়ছে তাঁর চুল, আর লিজার টুপীর ফিতে। লিজা আর লেনোচ্‌কাকে হাত ধরে গাড়িতে তিনি তুলে দিলেন। যা টাকাকড়ি কাছে ছিল গরীবদের দান করে তিনি বাড়ির পথে চললেন।

বত্রিশ

জ্বরের ঘোরে কাটছে তাঁর দিন। রোজ সকালে ছোটেন ডাকঘরে, চিঠিপত্র খুলে খুলে দেখেন। সংবাদ সত্য কি অসত্য তার প্রমাণ নেই। মনে মনে ভাবেন; দেখ, দেখ! শকুন যেমন রক্তপিপাসায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করে, তেমনি ওর মৃত্যুসংবাদের জন্য আমি অপেক্ষা করছি! রোজ কালিতিনদের ওখানেও হাজ্‌রে দেন। কিন্তু ওখানেও সহজ হয়ে উঠতে পারেন না। গৃহ-কর্ত্রীর ভ্রূকুটি; অনিচ্ছায় দু-একটা কথা বলেন। পানসীন যেন অতিরিক্ত ভদ্র। লেমও একটু মাথা নুইয়ে চলে যান। লিজা তো এড়িয়েই বুঝি চলে। যখন তাঁরা একা থাকেন, সে যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। আগে তো অসীম নির্ভরতা ছিল, সব কথা বলে যেত; এখন সে কি বলবে খুঁজে পায় না। তিনিও বিব্রত হয়ে পড়েন। ক'দিনের ভিতরেই লিজা যেন বদলে গেছে। কি এক উদ্বেগ যেন ওকে কুঁড়ে খাচ্ছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে—তারই প্রকাশ ওর স্বরে, ওর হাসিতে। মারিয়া কিছু টের পান নি। মারফা যেন চোখে চোখে রাখছেন তাকে। লাভ্রেৎস্কীর আফশোস, কেন তিনি লিজাকে দেখালেন

সেই কাগজখানা? তাই তো লিজার অন্তরের শত দ্বন্দ্ব—পানসীনকে সে কি উত্তর দেবে। একদিন সে নিয়ে এল স্কটের একখানা উপন্যাস। এই বইখানা তিনি তাকে দিয়েছিলেন।

পড়লে বইখানা?

না, এখন পড়ায় মন বসাতে পাচ্ছিনা, সে উত্তর দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

একটু দাঁড়াও, বহুদিন তোমাকে একা পাইনি। লোকে মনে করবে, তুমি আমাকে ভয় কর।

হাঁ, করি।

সেকি! কেন?

জানি না।

লাভ্রেৎস্কী চুপ করে রইলেন।

বল, তিনি আবার বললেন, তুমি কি মনস্থির করেছ?

কি বলছেন? লিজা চোখ নামিয়ে নিল।

আমি যা বলছি তা তো তুমি জান···

লিজা লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি জানি না···নিজেকে পর্যন্ত আমি চিনতে পাচ্ছি না···

সে চলে গেল।

পরদিন আবার এলেন লাভ্রেৎস্কী। এসে দেখলেন সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন চলছে, পরিচারক সামাদানে সাজিয়ে দিচ্ছে মোমবাতি। বসবার ঘর অন্ধকার। পরিচারকের কাছে শুনলেন, এলিজাবেথা আর মারফার আগ্রহে এই আয়োজন। তিরিশ ভের্স্ট দূর থেকে এসেছেন ধর্মযাজক। প্রৌঢ়, মাথায় তাঁর বিরাট টাক; হলঘরে বসে জোরে কাসছেন। মহিলারা হলঘরে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করছেন। ধর্মযাজক এবার বললেন, শুরু করব?

মারিয়া বললেন, হাঁ।

ধর্মযাজক পোষাক পরে নিলেন। ধূপধূনার গন্ধ উঠছে, পরিচারক পরিচারিকারা এসে ভিড় করেছে দরজার সুমুখে। রোস্কা এমনি নীচে নামে না, সেও হঠাৎ ছুটে এল বসবার ঘরে। ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আবার ছুটে আসছে। শেষে একটি চাকর তাকে কোলে করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। উপাসনা শুরু হোল এবার। এ অনুভূতি যেন অদ্ভুত, যেন বিষণ্ণ। কি যেন তিনি অনুভব করছেন, বুঝতে পারলেন না। মারিয়া দাঁড়িয়ে আছেন ; তাঁর যেন বিরক্তি ধরে গেছে। মারফা দিমোফিয়েভ্না উদ্বিগ্ন। নাস্তাশিয়া নুয়ে প্রণাম করছে। লিজা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন শিকড় গজিয়েছে। সে-ই বুঝি একমাত্র উপাসনা করছে। উপাসনা শেষ হয়ে গেল। মারিয়া পাদ্রিকে চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। আবার বসবার ঘরে মৃদু আলাপের গুঞ্জন। পাদ্রি চার পেয়ালা চা খেলেন, রুমাল দিয়ে বারবার মুছতে লাগলেন টাক-মাথা।

লাভ্রেৎস্কী বসেছিলেন লিজার কাছে, লিজা তার দিকে ফিরেও তাকালে না। যেন তাকে সে উপেক্ষা করছে। লিজার দিকে তাকিয়ে তার মনে হোল সে রহস্যময়ী। তার রহস্য দুর্ভেদ্য।

আর একদিন গিদিয়োনোভ্স্কীর গল্প শুনছিলেন লাভ্রেৎস্কী। কেন যেন তিনি পিছনে একবার ফিরে তাকাতেই লিজার মুখখানা দেখতে পেলেন। এক তীক্ষ্ম প্রশ্ন যেন তার চোখেমুখে। রহস্যময় সে দৃষ্টি। সারারাত ধরে ভেসে ভেসে এল সে দৃষ্টি। কিশোরের প্রেম তো তার নয়, দীর্ঘনিশ্বাস আর শুকিয়ে যাওয়াও তার পোষায় না। আর লিজা সে অনুভূতিও আনে না। কিন্তু তবু তো এ প্রেম। এর থেকে তো অব্যাহতি নেই।

তেত্রিশ

লাভ্রেৎস্কী কালিতিনদের ওখানে রোজই যান। এ তাঁর এক অভ্যেস। গুমোট দিনের পরে সেদিন নেমেছে সুন্দর সন্ধ্যা। মারিয়া হাওয়া সইতে পারেন না, তবু দরজা-জানালা আজ খুলে দেওয়া হয়েছে। তাসখেলা বসে নি। পানসীন আজ একমাত্র অতিথি। সে বলে বসলো, আজ সে কবিতা পড়বে। আবৃত্তি সে ভালই করে, কিন্তু মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ভাবালুতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। লারমান্তভের কবিতা সে আবৃত্তি করলে (পুশকিন তখনো অভিজাত সমাজে চল হন নি)। হঠাৎ নিজের উচ্ছ্বাসে লজ্জিত হয়ে সে তরুণদলকে আক্রমণ করে বসলো। সে জাহির করলে, তার যদি ক্ষমতা থাকতো, সবকিছু সে বদলে দিত। সে বললে, রাশিয়া তো য়ুরোপের পিছনে পড়ে আছে, ওর নাগাল আমাদের পেতে হবে। একথা বলা হয় যে, আমরা স্বাধীন জাতি—এ তো বাজে কথা! আমাদের আবিষ্কারের শক্তি নেই, আমরা একটা ইঁদুরের কলও তৈরী করি নি। তাই আমাদের অন্যের কাছ থেকে ধার করতে হবে। লারমান্তভ বলেন, আমরা অসুস্থ—ওঁর সঙ্গে আমি একমত। আমরা অসুস্থ শুধু এই জন্যে যে আমরা আধখানা য়ুরোপীয় হয়ে আছি।…

মারিয়া শুনছিলেন তার কথা, মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন; কি চমৎকার বলছে! মারফা সঙ্গী নিয়ে বসেছেন তাস খেলায়, তিনি বিড় বিড় করে কি বললেন। পানসীন ঘরের ভিতরে ঘুরছে আর বলছে; স্রোতের মতো কথা ঝরছে, কিন্তু বিরক্তির রেশ তার স্বরে। তার আক্রোশ যেন জাতি উপর নয়, ক'টা বিশেষ মানুষের উপর।…রাতের প্রথম প্রহরে ডেকে উঠলো নাইটিঙ্গেল। বাগানের লিলাক ঝোপে তার বাসা। ঘরের ভিতরের এই বিরতিকে ভরে দিয়ে গেল। রক্তিম আকাশে

প্রথম তারার দীপ্তি। সে উঠেছে লাইম গাছের শিয়রে। লাভ্রেৎস্কী হঠাৎ উঠে পড়ে পানসীনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলেন। রাশিয়ার তরুণদের পক্ষ তিনি নিলেন। নিজের যুগকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, নতুন যুগের নতুন মানুষের কথা। তাদের আছে বিশ্বাস, আছে আশা। পানসীন বিদ্রূপ করে উঠলো। লাভ্রেৎস্কী সংযম হারালেন না, তাঁর স্বর একবারও মাত্রা ছাড়িয়ে গেল না। তিনি পানসীনের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করলেন, তাকে হারিয়ে দিলেন।

পানসীন বলে উঠলো, বেশ তো, এই যে আপনি রাশিয়ায় ফিরে এলেন—কি করবেন এখন ?

লাভ্রেৎস্কী উত্তর দিলেন, জমি চাষ করব, যতটা ভাল করে সম্ভব চাষ করব!

তারিফ্ করবার মতো কথা সন্দেহ নেই! আপনি যে এ ব্যাপারে দক্ষ তা আমি শুনেছি। কিন্তু সবাই তো আর ও কাজ পারে না…

যার কবি মন, মারিয়া বললেন, সে তো আর চাষ-বাস করতে পারে না! ভ্লাদিমির নিকোলাই, তোমার পেশা তো বড় কিছু করা।

কথায় আবার ছেদ পড়লো। পানসীন এবার তারা-ভরা আকাশের সৌন্দর্য নিয়ে মেতে উঠলো, এলো সুবার্টের সঙ্গীতের কথা কিন্তু আলাপ আর জমলো না। মারিয়া এবার তাস খেলার কথা পাড়লেন।

নতুন প্যাক খোলা হোল, বসে গেলেন সবাই। এদিকে লিজা আর লাভ্রেৎস্কী উঠে গেলেন মারফার কাছে। ওরা দুজনেই খুশি—তব্ একা থাকতে যেন ভয় করছে। মারফা লাভ্রেৎস্কীর গালে চাপড় মেরে আদর করে বললেন, বেশ করেছ বাছা, ওর ঐ পণ্ডিতি ফলানো বার করে দিয়েছ!

ঘরে নীরবতা। শুধু মোমবাতির পুড়ে যাওয়ার শব্দ, টেবিলের উপর হাতের মৃদু চাপড়—তাস খেলার ডাক চড়ছে—আর ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের গান।

সে স্বর, তেমনি মিষ্টি—যেন পাত্র থেকে সে মধু ঢেলে দিচ্ছে। ঘরে তারই স্রোত—সঙ্গে আছে শিশির-ভেজা রাতের শীতলতা।

চৌত্রিশ

লাভ্রেৎস্কী আর পানসীন যখন তর্ক করছিল, লিজা একটাও কথা বলে নি। রাজনীতি সে বোঝে না, কিন্তু এই উদ্ধত রাজপুরুষের ব্যঙ্গে তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। রাশিয়াকে ও ঘৃণা করে! দেশপ্রেমিকা বলে সে নিজেকে মনে করে না, কিন্তু তবু দেশকে ভাল লাগে—ভালবাসে, তাই লাভ্রোৎস্কীর দিকেই ছিল তার টান। চোখে চোখও মিলেছে, মনে হয়েছে কেমন যেন একই বন্ধনে তারা আবদ্ধ। মারফার কাছে এসে তারা খেলা দেখতে লাগল—কিন্তু তবু তো স্পন্দন জাগছে বুকে, তারা যেন সচেতন হয়ে উঠেছে। ঐ যে নাইটিঙ্গেল গান গেয়ে গেল, তারা উঠলো বাগানের শিয়রে, গাছের ফিসফিসানি—সবই যেন শুনলো ওরা। লাভ্রেৎস্কীর হৃদয় কানায় কানায় ভরা, কিন্তু ঐ নিষ্পাপ কুমারীর মনে কি আছে কে জানে! সে তো এক রহস্য—তার কাছে, আর-সবার কাছেই সে রহস্য। কেউ জানে না, জানবে না, কি করে প্রথম বীজ পড়ে, অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, ফুল ফোটে মানুষের বুকে।

দশটা বাজলো। মারফা আর নাস্তাশিয়া উপরে চলে গেলেন। লিজা আর লাভ্রেৎস্কী এসে দাঁড়ালেন দরজায়। সামনে অন্ধকার বাগান। হঠাৎ হেসে উঠলো তারা; হাতে হাত নিতে চায়, কথা বলে যেতে চায় অনর্গল।

এবার মারিয়াদের খেলা ভাঙলো। মারিয়ার হাতে চুমু খেয়ে, লিজাকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল পানসীন। লাভ্রেৎস্কীও চলে এলেন। বাড়ি যেতে মন চায় না। পথে চলেছেন, শহর ছাড়িয়ে গ্রামে এসে গেছেন। চলেছেন তো চলেছেনই। রাত শান্ত, নির্মল—চাঁদ নেই তবু নির্মল, শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে চললেন, একটা সরু পথ ধরলেন

এবার। একটা বাগানের সুমুখের বেড়া। ফটকের দরজা খুলে ফেললেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন—এ যে কালিতিনদের বাগান!

গাছের নিবিড় ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বহুক্ষণ কেটে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কি ভাবছেন আর মাথা নাড়ছেন।

না, না, এত আকস্মিক ব্যাপার নয়!

চারদিক নীরব, বাড়িখানা থেকে শব্দ আসছে না। সন্তর্পণে তিনি হাঁটতে লাগলেন, বাঁকের মোড় ফিরতেই ভেসে উঠলো বাড়িখানা। আঁধারে ডুবে আছে। শুধু দুটি জানালা দিয়ে আসছে আলো। লিজার ঘরে সাদা পর্দার পিছনে জ্বলছে মোমের শিখা। মারফার ঘরে জ্বলছে ছোট্ট বাতিটা। নীচে বারান্দায় যাবার দরজাটা হাঁ করে খোলা। লাভ্রেৎস্কী বাগানের বেঞ্চিখানায় বসে পড়লেন, চোখ তাঁর দরজার দিকে, লিজার জানালার দিকে। শহরে কোথায় যেন ঘড়ি বেজে উঠলো। দুপুর রাত। বাড়ির ভিতরে কোথায় ছোট্ট একটা ঘড়ির গম্ভীর আওয়াজ। বারোটা। পাহারাদারের টোকা পড়লো কাঠের ফলকে। লাভ্রেৎস্কী কিছু ভাবতে পারছেন না, আশাও তাঁর নেই, তবু লিজার কাছে এসেছেন, তার বাগানে বসে আছেন—এই তাঁর আনন্দ। এই বেঞ্চিতে লিজা তো এসে বসে··· লিজার ঘরে বাতি নিবে গেল। লাভ্রেৎস্কী ফিসফিসিয়ে বললেন, শুভরাত্রি আমার প্রিয়া! বেঞ্চিতে ঠায় বসে আছেন, আঁধার জানালায় দুই চোখ।

আবার নীচের তলায় আলো। এক জানালা থেকে আর এক জানালায় সরে গেল—আবার আর এক জানালায়। মোমবাতি হাতে করে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে! লিজা নাকি! অসম্ভব! লাভ্রেৎস্কী উঠে পড়লেন···চেনা মুখ ঝলসে উঠল—এক লহমার দেখা। লিজা এসেছে বসবার ঘরে। সাদা গাউন তার পরণে, কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে বেণী। এবার বাগানের দিকে তার মুখ, সে খোলা দরজা দিয়ে

বেরিয়ে এল, বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, তন্বী, শুভ্রবসনা কুমারী! লাভ্রেৎস্কী কেঁপে উঠলেন।

লিজা! ঠোঁট চিরে বেরিয়ে এল ফিসফিসানি, অস্ফুট ফিসফিসানি।

চমকে উঠলো মেয়ে, আঁধারে কি দেখছে।

লিজা! জোরে বলে উঠলেন, এগিয়ে এলেন ছায়াময় অন্ধকার থেকে।

লিজা ভয় পেল, কেমন যেন সঙ্কুচিত। তাঁকে চিনেছে। আবার ডাকলেন, হাত বাড়িয়ে দিলেন। বারান্দা থেকে সে এল বাগানে।

আপনি, বিড় বিড় করে সে বললে, আপনি এখানে?

আমি···আমি···শোন, কথা আছে, তার হাত চেপে ধরে বেঞ্চিতে এনে বসালেন।

অবাক হয়ে গেছে লিজা, লাভ্রেৎস্কী তাকে বসিয়ে দিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

আমি যে আসব ভাবিনি। টেনে নিয়ে এল···আমি···আমি···আমি তোমাকে ভালবাসি। স্বরে তাঁর হতাশা।

লিজা ধীরে ধীরে তাকালো তার মুখের দিকে; সে বুঝতে চাইছে— এ সে কোথায় এল, কি ঘটে গেল। উঠতে সে চাইল, কিন্তু পারল না, মুখে হাত ঢেকে বসে রইলো।

লিজা, লিজা······তিনি এবার তার পায়ের কাছে বসে পড়লেন···

কাঁপছে লিজা, তার হাতের আঙুল আড়াল করে আছে মুখখানা।

কি হোল তোমার? অস্ফুটে বললেন তিনি।

ফোঁপানির শব্দ, বুকে স্পন্দন উঠছে···হাঁ, কাঁদছে লিজা। ও কান্নার মানে তিনি জানেন। তিনি তার হাঁটু ছুঁয়ে বললেন, তাহলে কি তুমি আমাকে ভালবাস লিজা?

তিনি শুনলেন লিজা বলছে, ফিওদর ইভানিচ, উঠুন! এ আমরা কি করছি?

তিনি উঠে ওর পাশে বসে পড়লেন। এখন আর কাঁদছে না লিজা, চোখ দুটি মেলে দেখছে তাকে।

আমার ভয় করছে, এ কি করছি আমরা?

আমি তোমাকে ভালবাসি লিজা, তোমার জন্যে আমি জীবন দেব।

আবার থরোথরো কেঁপে উঠলো লিজা। চোখ তার আকাশের দিকে।

সবই ভগবানের ইচ্ছা, সে আস্তে আস্তে বললে।

লিজা, আমাকে কি তুমি ভালবাস? আমরা কি সুখী হব? চোখ নামিয়ে নিল লিজা। তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন, লিজা মাথা এলিয়ে দিলে তার কাঁধে। তিনিও ঝুঁকে পড়ে ওর ম্লান ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে লাভ্রেৎস্কী এসে দাঁড়ালেন বাগানের ফটকে। ফটক তালা বন্ধ, তিনি লাফিয়ে পার হলেন। শহরের পথে চলেছেন। এখনো ঘুম ভাঙেনি সেখানে। এক আশাতীত সুখে তার মন ভরে গেছে, সংশয় আর নেই। তিনি ভাবলেন, দূর হয়ে যা অতীতের ছায়া! ও আমাকে ভালবাসে, ও আমার হবে। হঠাৎ যেন শূন্য থেকে ঝরে পড়লো সঙ্গীত। সুরের পাখায় ভর করে এল এক মহা সঙ্গীত—আর তারই ভিতরে যেন তার আনন্দ ভাষা পেল। তিনি তাকালেন। লেমের বাড়ির নীচে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

লেম! ওস্তাদজী! লাভ্রেৎস্কী ডাকতে ডাকতে ছুটে চললেন।

সঙ্গীত থেমে গেছে, বুড়ো এসে দাঁড়িয়েছেন জানালায়।

ওঃ আপনি!

কি মহান সঙ্গীত আপনি রচনা করছেন ওস্তাদজী! দরজা খুলুন, আমি ভিতরে আসব।

কথা না বলে লেম জানালা দিয়ে দরজার চাবী ফেলে দিলেন।

লাভ্রেৎস্কী দরজা খুলে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। লেম তাকে নিঃশব্দে বসতে বললেন। তারপর বসলেন পিয়ানোর কাছে; মুখপানেই উন্মাদনা জেগে উঠছে—সুর তো নয় এক অনুপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ; আনন্দ আর সৌন্দর্যের মহিমা সেখানে। লাভ্রেৎস্কীর হৃদয়ের তন্ত্রীতে যেন জড়িয়ে গেল সুর—নূতন প্রেমের এখনো সেখানে শিহরণ লেগে আছে—যেন প্রেমের স্পন্দন উঠলো সেখানে। বৃদ্ধ তার বুকে টোকা দিয়ে বলে উঠলেন, হাঁ, এ সঙ্গীত আমার রচনা—আমি এক মহান সুরকার! আবার বাজাতে লাগলেন। ঘরে আলো নেই, জানালা দিয়ে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। মৃদুমন্দ হাওয়া ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে। তাঁর রূপালি মাথা দুলে দুলে উঠছে, সে যেন প্রদোষের মায়া সৃষ্টি করছে। লাভ্রেৎস্কী লেমকে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। লেম তবু নীরব, ম্লান হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে, চোখে জল; শুধু বললেন,

এমন মুহূর্তে এলেন আপনি, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! আমি জানি, সব জানি।

অবাক হয়ে লাভ্রেৎস্কী বললেন, সব জানেন?

হাঁ, শুনলেন তো। আপনি কি বোঝেন নি?

সে রাত্রে লাভ্রেৎস্কীর ঘুম এল না। বিছানায় বসে রইলেন। লিজারও ঘুম নেই। সে করলো প্রার্থনা।

পঁয়ত্রিশ

পরদিন লাভ্রেৎস্কী কালিতিনদের ওখানে যখন এলেন, তখন এগারোটা বেজে গেছে। পথে পানসীনের সঙ্গে দেখা হোল, সে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। কালিতিনদের ওখানে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করলে না। চাকর বললে, কর্ত্রীর মাথা ধরেছে, শুয়ে আছেন। মারফা আর এলিজাবেথা

বাড়ি নেই। লাভ্রেৎস্কী বাগানে পায়চারী করতে লাগলেন। তার ক্ষীণ আশা লিজার সঙ্গে দেখা হবে।

দু ঘণ্টা পরে ফিরে এসে একই জবাব পেলেন। তিনবার কোথাও যাওয়া চলে না। তাই ঠিক করলেন, ভ্যাসিলিয়েভ্স্কোয়ে ফিরে যাবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে মনটা যেন বিষিয়ে উঠলো। আবার ফিরে এলেন শহরে। তখন তার মন ভরে আছে, লিজাময় হয়ে আছে। আর আছে সেই মহান সুরের স্পর্শ।

হলঘরে আসতেই তার নাকে এল এসেন্সের গন্ধ। এ গন্ধ তাঁর চেনা; তিনি সইতে পারেন না। দুটো বড় বড় বাক্স আর কয়েকটা সুটকেশও দেখলেন।

সর্দার-খানসামা ছুটে এল। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। তিনি আর দাঁড়িয়ে না থেকে বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন।...সোফায় গা এলিয়ে কে এক মহিলা! তাকে দেখেই মহিলা উঠে বসলেন। সিল্কের পোষাক ঝলমল করে উঠলো, ক্যাম্ব্রিকের রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এলেন। সযত্নে ঢেউ-খেলানো মাথাটা তার পায়ের উপর রাখলেন। এবার চিনলেন তিনি। মহিলা তাঁরই স্ত্রী।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল...তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

থিয়োডোর, আমাকে তাড়িয়ে দিও না। ফরাসী ভাষায় তার স্ত্রী বলে উঠলো। তার কথা তো নয় যেন ছুরির আঘাত।

শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লাভ্রেৎস্কী। তবুও তার মনে হোল, আরো যেন ফরসা হয়েছে তার রঙ, একটু মোটাও হয়েছে।

থিয়োডোর! আবার ডাকছে, চোখ ঘন ঘন উপরে তুলে তাকাচ্ছে, হাত মোচড়াচ্ছে। ওর আঙ্গুলের নখে গোলাপী রঙ ঝলসে উঠছে।

থিয়োডোর, আমি তোমার কাছে অন্যায় করেছি, ভয়ানক অন্যায় করেছি—আমি ভ্রষ্টা—কিন্তু আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

অনুতাপে আমি পুড়ে মরছি, নিজের এ জীবন দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে নিজের কাছে। আর তো সহ্য হয় না! কতবার চেষ্টা করেছি, তোমার কাছে জানাব আমার ভিক্ষা, কিন্তু সাহস হয়নি। অতীতকে আমি ভুলে যেতে চাই···আমি খুবই অসুখে ভুগে উঠলাম। অতীতকে মুছে ফেলবার জন্যেই তো আমার মৃত্যুর গুজবটা রটিয়ে দিলাম। তারপর একটুও দেরী না করে এখানে ছুটে এসেছি। আমার বিচারক তুমি, তোমার কাছে আসবার জন্যে আমি কম ইতস্তত: করিনি, অনেক করে শেষে সাহস হোল। ভীরুতা জয় করলাম, ভাবলাম তুমি তো কত দয়ালু। তোমার মস্কোয়ের ঠিকানা জেনে নিলাম। বিশ্বাস কর, সে আস্তে আস্তে মেঝে থেকে উঠে পড়ে চেয়ারে বসে বললে, মৃত্যুর কথা বহুবার ভেবেছি, মৃত্যু বরণ করতে ভয় পাই নি—এখন তো জীবন আমার কাছে এক দুর্বহ বোঝা! কিন্তু এডার, আমার খুদে এডার কথা তো ভাবতে হবে! সেই তো আমায় বাধা দিলে। সেও তো এসেছে। পাশের ঘরে শুয়ে আছে। আহা বেচারী! ওকে দেখবে না, ওতো নিষ্পাপ। আমি কি অভাগী—কি অভাগী! ঝরঝর করে সে কেঁদে ফেললো।

লাভ্রেৎস্কী বহুক্ষণ পরে আত্মস্থ হলেন। দরজার দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। তার স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলো, একটা গালাগালও দিলে না! না—এ ঘৃণা তো সহ্য হয় না—এ যে ভয়ানক!

লাভ্রেৎস্কী থামলেন।

আমাকে কি করতে বল? স্বর তাঁর নিস্পৃহ।

কিছু না, কিছু না, সে বলে উঠলো। জানি, আমার কোন দাবী নেই। কাণ্ডজ্ঞান আমি হারাই নি। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, এ আশা আমার নেই। শুধু আমাকে বল, আমি কোথায় যাব, কি করব? তোমার হুকুম আমি মেনে নেব—দাসীর মতো মেনে নেব।

তোমাকে হুকুম দেবার অধিকার আমার নেই; লাভ্রেৎস্কী নীরস স্বরে

বললেন, তুমি তো জান, আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে…এখন তো আরো নেই। তুমি যেখানে খুশি থাক, যদি তোমার মাসোহারায় না চলে তাহলে—

ওকথা থেকে রেহাই দাও! ঐ বাচ্চাটার জন্যে অন্ততঃ রেহাই দাও! সে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে নিয়ে এল একটি খুদে মেয়েকে। চমৎকার তার পোষাক, গোলাপের মতো সুন্দর মুখের উপর এসে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল। ঘুমন্ত কালো দুটি চোখ। সে হাসলো, আলোর দিকে চোখ মিটমিট করে তাকালো। মার গলার উপর তার নরম হাত।

এডা, এই তোমার বাবা, বারবারা তার চুলের গোছা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে বললে, বাবাকে কিছু বলবে না?

বাবা, কেমন আছ? মেয়েটি বললে।

আহা বাছা আমার, বাপকে দেখেনি!

লাভ্রেৎস্কী সইতে পারলেন না…

কোন্ নাটকে যেন এমনি এক দৃশ্য আছে। তিনি বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বারবারা একমুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপরে মেয়েকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে পোষাক ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। এবার বই খুলে আলোর কাছে বসলো। কার যেন প্রতীক্ষা করছে। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লো।

জামা খুলতে খুলতে ফরাসী দাসীটি বললে, কি হোল মাদাম?

কি আবার হবে! ওর মন আগের মতো আছে ভেবেছিলাম। যাক কালকের জন্য আমার ধূসর রঙের গাউনটা ঠিক করে রেখো—ঐ যে যেটার উঁচু কলার। এডার জন্যে চপের কথা ভুলো না। এখানে হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না।

দাসী বাতি নিবিয়ে দিলে।

ছত্রিশ

শহরেই পথে পথে আবার ঘুরে বেড়ালেন লাভ্রেৎস্কী। দুঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেল। প্যারীর শহরতলিতে এমনি এক রাত কাটিয়েছিলেন— ফিরে ফিরে মনে এল সে-রাত। সেদিনও এমনি ব্যথায় বিক্ষত বুক, মাথায় ছিল এমনি পাষাণের ভার। 'ও ফিরে এসেছে, বেঁচে আছে,' বার বার তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন। লিজাকে তিনি তাহলে হারালেন রাগে জ্বলে উঠলেন। নাল আকাশ থেকে যেন বাজ পড়লো। ঐ প্রবন্ধটা পড়ে তিনি বিশ্বাস করলেন কেন? 'কি আর হোত? আমি জানতেও পারতাম না যে, লিজা আমাকে ভালবাসে। ও নিজেও জানতে পারত না।' স্ত্রীর মূর্তি, তার স্বর, তার চোখ হানা দিলে···তিনি নিজেকে গাল দিলেন, সারা পৃথিবীকে গাল দিলেন।

লেমের কাছে এলেন ভোরের ঠিক আগে। তখন তিনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন। বহুক্ষণ কেউ সাড়া দিলে না। তারপর বৃদ্ধের মাথা দেখা গেল জানালায়। গত রাতের সেই উদ্দীপ্ত মুখ তার নেই, কেমন যেন শুকিয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে।

কি চান? লেম বলে উঠলেন, আমি রোজ রাতে কাউকে বাজনা শোনাতে পারব না! তারপর লাভ্রেৎস্কীর মুখের দিকে তাকালেন। মুখে কি যেন ছিল তার। বৃদ্ধ আর একবার তাকিয়ে দেখে দরজা খুলে দিলেন।

লাভ্রেৎস্কী ঘরে এসে চেয়ারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। বৃদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার স্ত্রী এসেছে! লাভ্রেৎস্কী মাথাটা তুলে হেসে উঠলেন। সে হাসিতে আনন্দ নেই।

লেম হতবাক, হাসি নেই তার মুখে। শুধু ড্রেসিং গাউনটা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

আপনি জানেন না, আমি খবরের কাগজে পড়েছিলাম সে মারা গেছে আমি সত্যি বলেই ভেবেছিলাম।

লেম জিজ্ঞেস করলেন, বেশিদিন আগে নিশ্চয়ই পড়েন নি?

না, কিছুদিন আগে মাত্র।

বৃদ্ধ ভ্রূ কোঁচকালেন, তিনি এখন এখানে?

হাঁ, আমার বাড়িতে; আমি—আমি অভাগা!

মুখে তার তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো।

হাঁ, আপনি সত্যিই হতভাগ্য, ধীরে ধীরে লেম বললেন।

ক্রিস্টোফার ফিওদরীচ, আপনি আমার একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারবেন?

কাকে?

এলিজাবে—

হাঁ, হাঁ, বুঝেছি। বেশ তো, কখন পাঠাতে হবে?

কাল। যত তাড়াতাড়ি পারেন।

আমার রাঁধুনিকে পাঠাতে পারি। না, আমি নিজেই দিয়ে আসব।

উত্তর নিয়ে আসতে পারবেন তো?

হাঁ, পারব।

লেমের বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

হাঁ বন্ধু, আমি আবার বলি, আপনি হতভাগ্য।

লাভ্রেৎস্কী লিজাকে ক'টা কথা লিখলেন। তার স্ত্রী এসেছে সে খবর দিলেন, আর দেখা করতে বললেন। তারপর সংকীর্ণ সোফায় শুয়ে পড়লেন। দেয়ালের দিকে ফেরানো তার মুখ। বৃদ্ধ বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও-পাশ করছেন আর কাসছেন। অধৈর্য তাকেও পেয়ে বসেছে।

ভোর হোলো। দুজনেই উঠে পড়লেন। অপরিচিতের মতো তাদের দৃষ্টি। লাভ্রেৎস্কী ভাবছিলেন, আত্মহত্যা করলে কেমন হয়। রাঁধুনি ক্যাথেরিণ কফি দিয়ে গেল। বিস্বাদ কফি। ঘড়িতে বাজলো আটটা। লেম টুপী পরে বললেন, কালিতিনদের ওখানে বেলা দশটায় বাজনা শেখাতে যান। আজ না হয় একটা অজুহাত দেখাবেন। তিনি রওনা হয়ে গেলেন। লাভ্রেৎস্কী আবার সোফায় শুয়ে পড়লেন। আত্মার গভীরে আবার ব্যঙের ধুম পড়ে গেছে। স্ত্রী তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে! লিজার কথা মনে পড়লো আবার। চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন। লেম এবার ফিরে এলেন। এসে একটুকরো কাগজ দিলেন তার হাতে। তাতে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে লিজা···আজ দেখা হবে না। হয়তো কাল সন্ধ্যায় হতে পারে। বিদায়! লাভ্রেৎস্কী লেমকে আনমনা হয়ে ধন্যবাদ দিলেন। তার স্বর নীরস। এবার বাড়ি ফিরে গেলেন।

প্রাতরাশের টেবিলে স্ত্রীর সঙ্গে আবার দেখা। এডা চুলের বিনুনী জড়িয়েছে মাথায়, পরেছে সাদা ফ্রক, তাতে ঝুলছে নীল ফিতে। চপ খাচ্ছে সে। লাভ্রেৎস্কী আসতেই বারবারা উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে পড়ার ঘরে নিয়ে এসে দরজায় চাবী দিয়ে দিলেন। এবার ঘরময় পায়চারী করছেন। বারবারা বসে রইল, চেয়ে চেয়ে দেখছে। এখনো সে চোখ দুটি সুন্দর, যদিও তাতে প্রলেপ পড়েছে রঙের।

বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না লাভ্রেৎস্কী। তার মনে হোল নিজের উপরে তার আর কর্তৃত্ব নেই, তিনি এখন ভাবাবেগের আধার! বারবারা তাকে ভয় পায়নি, শুধু ভান করছে, সে যে কোনো মুহূর্তে মূর্চ্ছা যাবে।

অবশেষে দাঁতে দাঁত চেপে, তিনি বললেন, দেখ, প্রতারণা করে লাভ নেই। তোমার অনুশোচনায় আমি বিশ্বাস করি না। যদি

অনুশোচনা সত্যিই করে থাক, তাতেও আমার তোমার কাছে ফেরা হবে না—তোমার সঙ্গে থাকতে আমি পারব না।

বারবারা চুপ করে বসে রইল, তার চোখ মিটমিট করছে।

তবে কি এ ঘৃণা, সে ভাবলো, তাহলে তো সব শেষ! ওঁর চোখে আজ আমি নারীত্ব পর্যন্ত হারিয়ে বসে আছি।

লাভ্রেৎস্কী কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে আবার বললেন, অসম্ভব! তুমি কেন এখানে এসেছ জানি না; হয়তো টাকার অভাব হয়েছে।

তুমি আমাকে অপমান করছ? বারবারা ফিসফিসিয়ে বললো।

যাহোক, এখনো তুমি আমার স্ত্রী বলে পরিচিত—আমার স্ত্রী তুমি! তোমাকে দূর করে দিতে পারছি না···তোমার কাছে এক প্রস্তাব আছে। তুমি আজই লাভ্রিকীতে যেতে পার; সেখানে থাকতেও পার। ভাল বাড়ি আছে, আমার মাসোহারা তো পাবেই, আরো যা দরকার হবে দেব···কি রাজি?

বারবারা কারুকাজ-করা রুমালখানা মুখে চেপে ধরলো। ঠোঁট কেঁপে উঠলো বার বার। বলেছি তো তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজি। আমার শুধু একটি ভিক্ষা—তুমি কি আমাকে একবার তোমার এই মহানুভবতার জন্যে ধন্যবাদ দিতে দেবে?

ধন্যবাদে দরকার নেই। তাহলে কথা রইল তো···তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আসন·ছেড়ে উঠে বারবারা বললে, কালই আমি লাভ্রিকীতে যাব··· কিন্তু ফিওদর ইভানিচ···(আর সে থিয়োডোর বলে ডাকলে না)

কি—বল?

জানি, ক্ষমা তুমি করনি, কিন্তু এ আশাও কি করবো না যে একদিন সময় হলে—

লাভ্রেৎস্কী বাধা দিলেন, বারবারা, তুমি চতুর, আমিও নির্বোধ নই ; আমি জানি, তুমি আমার জন্যে একটুও ভাব না। বহুদিন আগে আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। কিন্তু তবুও আমাদের ভিতরে আছে ব্যবধান।

বারবারা মাথা নীচু করে বললে, আমি তোমার কাছে নত হয়েই থাকব। আমি তো আমার পাপের কথা ভুলিনি। আজ যদি শুনি যে, আমার মৃত্যুর সংবাদ শুনে তুমি খুশি হয়েছিলে—তাতেও অবাক হব না। ধীরভাবে সে টেবিলের উপরে লাভ্রেৎস্কীর রাখা খবরের কাগজখানা দেখিয়ে দিলে। ফিওদর ইভানিচ চমকে গেলেন। পেন্সিলে দাগানো প্রবন্ধ। বারবারা তাকিয়ে আছে তার দিকে। দৃষ্টিতে তার নম্রতা। চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। ধূসর প্যারিসীয় গাউন তার তনুদেহকে ঘিরে আছে—যেন কুমারীর বরতনু। তার সুন্দর গ্রীবা ঘিরে আছে সাদা কলার। আস্তে আস্তে উঠছে-পড়ছে বুকখানা। নগ্ন বাহুতে নেই বালা, আঙুলে নেই আঙটি। সুঠাম তার দেহলতা—কেয়ারী-করা মাথা থেকে জুতোর ডগা অবধি বিলাসিনী, মার্জিতরুচি বিলাসিনী সে…

লাভ্রেৎস্কী ঘৃণায় শিউরে উঠলেন, চেঁচিয়ে উঠে বলতে গেলেন 'বাহবা নাগরী !' তার কপালের উপর হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে থেমে গেলেন। এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ছুটে। এক ঘণ্টা পরে চললেন ভ্যাসিলিভ্‌স্কোয়ের পথে। তার দুঘণ্টা পরে বারবারা শহরের সবচেয়ে ভাল গাড়িখানা ভাড়া করে সামান্য বেশভূষা সেরে নিয়ে চললো কালিতিনদের ওখানে। এডা রইলো দাসীর কাছে। সে চাকরদের কাছে শুনেছিল ; তার স্বামী রোজই ওখানে যান।

সাঁইত্রিশ

লাভ্রেৎস্কীর স্ত্রী যেদিন ও-শহরে এল, সে দিনটি বিষণ্ণ হয়েই দেখা দিল লাভ্রেৎস্কীর কাছে। লিজার কাছেও এল নিঃসঙ্গ দিন, দুর্বহ দিন ; নীচে

নেমে আসতেই সে শুনলে ঘোড়ার খুরের শব্দ   বুক তার কেঁপে উঠলো। সে দেখলো পানসীন ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। 'ও জবাব চাইতে এসেছে এত ভোরে', সে ভাবলে। ভুল হয়নি তার, বসবার ঘরে কিছুক্ষণ থাকবার পর পানসীন তাকে বাগানে আসতে বললে। সে তার ভাগ্যে কি আছে জানতে চায়। লিজা স্পষ্টভাবে জানালে, সে তার স্ত্রী হবে না—হতে পারবে না।

পানসীন টুপীটা চোখের উপর টেনে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। অতি ভদ্রভাবে সে জিজ্ঞেস করলে, এই কি তার শেষ কথা, তার এই মত পরিবর্তনের কারণ কি? তারপরে চোখে হাত দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; আবার হাত সরিয়ে নিলে।

ভাঙা গলায় সে বললে, আমি একজন মনের মতো সঙ্গিনী চেয়েছিলাম, কিন্তু তা হোল না। বিদায়, আমার সুখস্বপ্ন বিদায়! লিজাকে নুয়ে পড়ে সে অভিবাদন জানিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

লিজা ভেবেছিল পানসীন তখনি চলে যাবে। কিন্তু সে চলে গেল মারিয়ার ঘরে, ঘণ্টা খানেক সেখানে কাটালো। যাবার সময় লিজাকে জানালে বিদায় সম্ভাষণ। এবার ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। লিজা তাকিয়ে দেখলে, মারিয়ার চোখে জল। পানসীন তাকে নিজের ভাগ্যের কথা জানিয়ে গেছে।

এবার দুঃখিনী বিধবা তার অভিযোগ শুরু করলেন. ওঃ তুমি আমার কি করলে লিজা? কাকে তুমি বিয়ে করতে চাও বল তো? ওকি তোমার যোগ্য নয়? ওতো আর সুবিধেবাদী নয়। খাঁটি অভিজাত। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ও যে কোনো বনেদী ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। হায় ঈশ্বর, আমিও কি তা চাইনি! তোমার কি হঠাৎ মত বদলে গেল? এতো আর আকাশ থেকে পড়েনি, নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে মন্ত্রণা দিয়েছে। এ আমাদের ভাইটির কাণ্ড কিনা কে বলবে! তুমি তো এক আচ্ছা মন্ত্রী জুটিয়েছ!

আহা বাছা আমার, কত মানী লোক, এই দুর্ভাগ্যের ভিতরেও কত বুঝদার। ও বলেছে, আমার সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা নষ্ট হতে দেবে না। আমার আর বাছা, এই ধকল সইবে না। উঃ মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে! যাও, গিয়ে পালাশাকে পাঠিয়ে দাও। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হবে—শুনছ গো মেয়ে? আরো কয়েকবার তার অবাধ্যতার জন্যে ভৎর্সনা করে মারিয়া তাকে বিদায় দিলেন।

লিজা চলে গেল তার ঘরে। সে পানসীন আর তার মার ব্যাপারের ধকল তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এমনি সময় আবার নতুন করে এল ঝড়। যেদিক থেকে ঝড় বয়ে এল সে আশাও করেনি। মারফা তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বৃদ্ধার মুখখানা বিবর্ণ, চোখ চক্‌চক্ করছে, ঠোঁট কাঁপছে। লিজা অবাক হয়ে গেল। সে কখনো তার দিদাকে এমন অবস্থায় দেখেনি। তিনি তো সব সময়েই ধীর-স্থির।

মারফা ফিসফিসিয়ে বললেন, বলিহারি যাই বাছা! এসব শিখলে কোথায়!···আমাকে এক গেলাস জল দাও; আমি তো কথা কইতেই পারছি না।

তুমি শান্ত হও; কি হয়েছে বল? লিজা জল এনে দিয়ে বললে। তোমাকে তো পানসীনের ভক্ত বলে জানতুম না!

মারফা গেলাসটা রেখে দিলেন।

না, জল খেতেও পারলাম না। শেষ দাঁত ক'টাও পড়ে যাবে। পানসীনের কথা কেন? তার ব্যাপারই নয়। বলতো, কে তোমাকে রাতে দেখা করা শেখালো? কি—বল?

লিজা ম্লান হয়ে গেল।

না, অস্বীকার কোরো না, মারফা বলতে লাগলেন। সুরোচকা নিজের চোখে দেখে বলেছে। আমি তাকে কাউকে বলতে বারণ করেছি। সে মিথ্যাবাদী নয়।

আমি তো অস্বীকার করছিনে, লিজা আস্তে আস্তে বললে।

তাই বল মেয়ে, তাই বল! ওর সঙ্গে তোমার দেখা করবার কথা ছিল—ঐ যে গো আমাদের সেই ভাল মানুষটি?

না।

তাহলে?

আমি একখানা বইয়ের জন্যে বসবার ঘরে এলাম। উনি বাগানে ছিলেন—ডাকলেন।

তুমিও অমনি গেলে? নাঃ, তুমি কি ওকে ভালবাস নাকি? না অন্য ব্যাপার?

আমি ওঁকে ভালবাসি। লিজা অস্ফুটে বললো।

হা ভগবান! ও ওকে ভালবাসে! মারফা মাথা থেকে টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এক বিবাহিত পুরুষকে তুমি ভালবাস? শুনছ, সত্যিই ভালবাস?

তিনি বললেন…লিজা বলতে গেল।

কি বললেন বাছা?

তিনি বললেন তার স্ত্রী মারা গেছে।

মারফা ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন বুকে, আহা, ওর আত্মা যেন শান্তি পায়। তারপর ফিসফিসিয়ে বললেন, বাজে মেয়ে, তবু ভগবান তাকে ক্ষমা করুন! তাহলে ওর এখন বৌ নেই? ছোঁড়া চালাক আছে। একটা বৌকে শেষ করে আর একটার পিছনে ছুটেছে। আস্ত সাপ! দেখ গো, একটা কথা বলি, আমাদের দিনকালে মেয়েরা এসব ব্যাপার ঘটলে অনেক নাকাল হোত। তুমি রাগ কোরোনা বাছা, আমি ওকে এখানে আসতে বারণ করে দিয়েছি। বোকা যারা তারাই তো সত্যকে ভয় পায়—তুমি তো তা নও…আমি ওকে ভালবাসি—কিন্তু এ ব্যাপারে আমি ক্ষমা করব না! ও দোজবরে!…

দাও তো, জলের গেলাসটা দাও তো !···পানসীনের কথায় রাজি না হয়ে ভালই করেছ। তুমি চালাক মেয়ে, কিন্তু ঐ ওর সঙ্গে রাতে দেখা করাও ভাল কথা নয়। আমি শুধু আদর করতেই জানি না, আমি বিষ দাঁত দিয়ে কামড়াতেও জানি। দোজবরে না ও !

মারফা চলে গেলেন। লিজা কাঁদতে লাগলো, এমন অপমান তো সে কখনো সয় নি। ভালবাসা তার কাছে আনন্দ নিয়ে আসে নি ; কাল রাত থেকে দু-দুবার সে কেঁদেছে। সে লজ্জিত, আহত—কিন্তু ভয় তো নেই আর—লাভ্রেৎস্কী তার যেন আরো প্রিয় হয়ে উঠেছেন। নিজের মন যখন বুঝতে পারে নি, তখন ছিল সংশয়—দুলেছে তারই দোলায়। কিন্তু কালকের দেখা আর সেই চুমুর পরে আর তো সে সংশয় নেই। সে জানে সে ভালবেসেছে—সত্যই ভালবেসেছে—তার ভালবাসার শক্তি আছে। আজীবন তা থাকবে, উপেক্ষা করবে শত বাধা ; এ বন্ধন পৃথিবীর কোনো শক্তিই ছিঁড়তে পারবে না।

আটত্রিশ

বারবারার আসার খবর পেয়ে মারিয়া খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাকে অভ্যর্থনা করবেন, কি করবেন না এই তাঁর ভাবনা। ফিওদর ইভানিচকে চটাবেন সেই ভয়ও তার ছিল। অবশেষে, কৌতূহলেরই জয় হোলো। তিনি ভাবলেন, যাইহোক, আত্মীয় তো ! সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে পরিচারককে বললেন যাও, নিয়ে এস। কয়েক মুহূর্তের ছেদ। দরজা খুলে গেল। বারবারা মারিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। তিনি চেয়ার থেকে ওঠার সময় পেলেন না। সে এসে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

ধন্যবাদ, সে রুশ ভাষায় বললে, ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করবেন ভাবতে পারি নি; আপনি স্বর্গের দেবী!

বারবারা পাভলোভ্না এবার মারিয়ার হাতখানা তুলে নিলে সসম্মানে। নিজের দস্তানা মোড়া হাতে নিয়ে গোলাপরাঙা ঠোঁটের উপর তুলে ধরলো। মারিয়া হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। এই সুন্দরী, সুবেশা নারী তার পায়ের উপর নুয়ে পড়েছে! কি করবেন তিনি ভেবে পেলেন না। হাত সরিয়ে নিয়ে ওকে বসিয়ে দিতে হবে, কিছু বলতেও হবে। কিন্তু তাও পারছেন না। তিনি শেষে উঠে বারবারার মসৃণ গন্ধ-সুরভিত কপালে একটা চুমু খেলেন। বারবারাও অভিভূত হয়ে গেল।

কেমন আছ? মারিয়া জিজ্ঞেসা করলেন, তোমাকে তো এখানে আশাই করিনি। যাহোক, দেখে খুশিই হলাম। আর একটা কথা, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে আমি কেন বিচার করতে বসব···

বারবার বলে উঠলো, আমার স্বামী ঠিকই করেছেন। আমিই অপরাধী।

মারিয়া বলে উঠলেন, তোমার কথার তারিফ করি। তারপর কবে এলে? দেখা হয়েছে? বোস, বোস!

বসে পড়ে সে বললে, কাল এসেছি। ফিওদর ইভানিচের সঙ্গে দেখা আর কথাও হয়েছে।

ও কি বলে?

আমি তো ভেবেছিলাম, উনি ক্ষেপেই যাবেন, কিন্তু উনি আমাকে বঞ্চিত করেন নি।

তার মানে, দেখা করেছেন তো···হাঁ, হাঁ, বুঝেছি। ওর উপরটাই যা একটু রুক্ষ, কিন্তু মনটা ভারি ভালো।

না, উনি আমাকে ক্ষমা করেন নি। আমার কথাও উনি শুনতে চান না। তবু দয়া করে উনি আমাকে থাকবার জন্যে লাভ্রিকী দান করেছেন।

সত্যি ? কি সুন্দর জায়গাটি !

ওঁরই হুকুমে আমি কাল চলে যাচ্ছি। তাই আজ আপনার সঙ্গে দেখা করা আমি কর্তব্য বলে মনে করলাম।

ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ! নিজের আত্মীয়-স্বজনকে তো ভোলা উচিতই নয়। রুশ ভাষা এত ভাল তুমি বলতে পার ? আমি তো শুনে অবাক বনে গেছি।

বারবারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

বহুদিন বাইরে আছি, আপনার অবাক হবার কথাও বটে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা। কিন্তু আমার মন যে পড়েছিল রাশিয়ায়, আমার দেশকে তো আমি ভুলি নি।

ঠিক…ঠিক—এই তো আসল কথা ! ফিওদর ইভানিচ, কিন্তু তোমাকে আশা করে নি ? ‥ হাঁ, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পার। বাঃ কি সুন্দর ওড়নাখানা ! একবার দেখতে পারি কি !

আপনার পছন্দ হয়েছে ? বারবারা নিজের গা থেকে ওড়নাখানা খুলে তুলে ধরলো। এমন কিছু নয়, সাদাসিধে জিনিস। মাদাম বাউদ্রাঁর ওখানে পাওয়া যায়।

তা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মাদাম বাউদ্রাঁর ওখান থেকে কেনা…কি সুন্দর জিনিসটি—কি পছন্দ তোমার ! তোমার বোধ হয় এমনি বহু সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে ? আহা, একবার যদি দেখতে পেতাম !

স্বচ্ছন্দে দেখতে পারেন। আপনি যদি বলেন, আপনার দাসীকে আমি সাজগোজের ব্যাপারগুলো শিখিয়ে-দেখিয়ে দিতে পারি। প্যারী থেকে এক দাসী এসেছে আমার সঙ্গে—সে তো চমৎকার সাজাতে জানে।

বোন, তুমি এত ভাল বলেই তো ওকথা বললে। কিন্তু তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না।

বারবার মৃদুস্বরে ভৎ'সনা করলে, আমাকে বিরক্ত করছেন! যদি আমাকে খুশি করতে চান, তাহলে আমার জিনিস আপনার জিনিসের মতোই দেখবেন।

মারিয়া গলে গেলেন।

চমৎকার মেয়ে! তোমার টুপী আর দস্তানা জোড়া খুলে ফেল না।

সত্যি! বারবারা পাভ্‌লোভনা বললে।

নিশ্চয়ই···তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে। আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তিনি মনে মনে ভাবলেন, ওতো আবার আজ ক্ষেপে আছে।

সত্যি, আপনি কি ভাল! বারবারা চোখে রুমাল চেপে ধরে বলে উঠলো।

ছোকরা চাকর এসে জানালো, গিদিয়োনোভ্‌স্কী এসেছেন। গুজববাজ এসে অভিবাদন করলেন, হাতে চুমু খেলেন। মারিয়া অতিথির সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রথমে কেমন হকচকিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু বারবারার সশ্রদ্ধ ব্যবহারে অপ্রতিভতা কেটে গেল, মধুর মতো জিভ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো গুজব। বারবারা হাসিমুখে শুনতে লাগলো। এ হাসি সংযমের—সে আস্তে আস্তে আলাপেও যোগ দিলে। প্যারীর কথা সে সংযত হয়েই বলে গেল; বাডেন-বাডেন ভ্রমণের কথাও উঠলো। মারিয়া দু-দুবার তার কথায় হেসে উঠলেন। বারবারা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—নিজেকে যেন সে অশোভন আনন্দের জন্য ভৎ'সনাই করলে। সে এডাকে পরের বার নিয়ে আসার জন্যে অনুমতি চাইল। দস্তানা খুলে সুগন্ধি সাবান-স্নাত তার মসৃণ হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে পোষাকের কোথায় লেস্, কোথায় বা ফুল লাগাতে হয়, তারপরে ইংলণ্ডের তৈরী ভিক্টোরিয়া এসেন্স নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিলে। মারিয়া খুশি হয়ে উঠলেন। প্রথম রুশীয় গীর্জার ঘণ্টার শব্দ শুনে বারবারার চোখে আনন্দে জল

ঝরেছিল, কথায় কথায় তাও সে জানালে। সে বলে উঠলো,—এ শব্দ তো সোজা গিয়ে পৌঁছলো আমার মনে।

ঠিক এই মুহূর্তে লিজা এল ঘরে।

লাভ্রেৎস্কীর চিঠি পড়ে সে ভয়ে যেন পাথর হয়ে গিছলো। সকাল থেকে তার এমনি ভাবেই কেটে গেছে। তাই লিজা এড়িয়ে চলেছিল এই সাক্ষাৎ। তার মনে হয়েছিল, বারবারা দেখা করবেই। অবশেষে সে ঠিক করলো, তাকে এড়িয়ে সে চলবে না। তার এই পাপ-আশার প্রায়শ্চিত্ত করবে এমনি করে। তার ভাগ্য এই যে আকস্মিক সংকট নিয়ে এল, তাতে তার মনের মর্মমূল অবধি কেঁপে উঠেছে। দু ঘণ্টার ভিতরেই তার মুখে পড়েছে বার্ধক্যের বলি রেখা ; কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জল সে ফেলিনি। মনে মনে সে বলেছে, আমার উচিত শাস্তি হয়েছে ! নিজের উদ্দামতা সে চেপে রেখেছে, নিজের উপরে রাগ রেখেছে দমিয়ে। এতেই যেন তার ভয়। বারবারা আসার কথা শুনে সে ভাবলে, আমি যাব, দেখা করব। সে নীচে নেমে এল। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বসবার ঘরের সামনে। তারপরে সাহস করে দরজাটা খুলে ফেললে। ওর আমি ক্ষতি করেছি—হাঁ করেছি ! এই তার তখন ভাবনা, সে ঢুকলো ঘরে, তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। বারবারা তাকে দেখেই উঠে এল, সসম্মানে মাথা নোয়ালে। অতি বিনয়ে সে বললে, আমি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। তোমার মা তো চমৎকার মানুষ, আশা করি তুমিও তেমনি হবে…বারবারার মুখে শেষ কথা উচ্চারিত হোলো। মুখে কুটিল হাসি, শীতল অথচ মৃদু দৃষ্টি, তার হাত আর কাঁধের অঙ্গভঙ্গী, তার পরনের গাউন—সব কিছু মিলিয়ে লিজার মনে জাগছে বিরুদ্ধভাব। সে উত্তর দিতে পারলে না, শুধু হাত বাড়িয়ে দিলে। বারবারা লিজার ঠাণ্ডা আঙুলগুলো নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ভাবলে, এ মেয়ে আমাকে সহ্য করতে পারছে না। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার

মেয়েটি তো চমৎকার! লিজা লাল হয়ে উঠলো; প্রশংসায় বিদ্রূপ আছে, আছে অপমানের হুল। কিন্তু ও গায়ে মাখতে চায় না এসব কথা। তাই জানালার কাছে গিয়ে বসে পড়লো। গোল ফ্রেমে-আঁটা কাপড়ের উপর সে ফুল তুলতে শুরু করেছে। এখানেও তাকে শান্তিতে থাকতে দিলে না বারবারা। সে কাছে গিয়ে তার রুচি আর হাতের কাজের প্রশংসা করতে লাগলো।…লিজার বুকে উঠছে স্পন্দন, ব্যথায় ভরে যাচ্ছে; মুখ সে তবু তুলে আছে তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে। বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না বুঝি সবই জানে, তাই তাকে বিদ্ধ করছে তার দৃষ্টি দিয়ে; বুঝি বা আনন্দই পাচ্ছে। গিদিয়োনোভ্‌স্কী এবার আলাপ শুরু করলেন বারবারার সঙ্গে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো লিজা।

ঝুঁকে পড়ে আছে ফ্রেমের উপর, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। এই সেই নারী—যাকে তিনি একদিন ভালবেসেছিলেন! কিন্তু তাঁর কথা তো আর নয়, সে তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলবে। নিজের সংযম বুঝি হারিয়ে ফেলছে লিজা, মাথা ঘুরছে। মারিয়া এমন সময় সঙ্গীত নিয়ে আলাপ শুরু করলেন।

আমি শুনেছি, তুমি একজন সত্যিকারের শিল্পী।

আমি বহুদিন বাজাইনি। বারবারা পিয়ানোর কাছে বসে ঘাটের উপর আঙুলগুলি বুলিয়ে গেল। নিপুণ সঞ্চারণ আঙুলের।

বাজাব?

বাজাও!

বারবারা হার্ৎস্‌-এর গৎ বাজিয়ে গেল। চমৎকার বাজাচ্ছে। নিপুণতা তার আছে।

এ যেন বাতাসের আত্মার গান! গিদিয়োনোভ্‌স্কী চেঁচিয়ে উঠলেন।

চমৎকার! মারিয়ার স্বর। বারবারা, তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। তোমার কনসার্টে বসা উচিত। আমাদের এখানেও একজন

সঙ্গীতজ্ঞ আছে। লোকটা একটু ক্ষ্যাপাটে। কিন্তু খুব জানাশুনো আছে। লিজাকে ও শেখায়। ও তো তোমার বাজনা শুনলে পাগল হয়ে যাবে।

বারবারা মাথাটা একটু হেলিয়ে দিয়ে বললে, এলিজাবেথা মিখাইলোভনাও কি বাজান নাকি!

হাঁ, মন্দ বাজায় না, ও তো বাজনা খুবই ভালবাসে, কিন্তু তোমার তুলনায় তো কিছুই নয়। কিন্তু এখানে এক যুবক আসেন, তার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া দরকার। একেবারে মনে প্রাণে শিল্পী, নিজে রচনাও করেন। তিনিই তোমার বাজনার একমাত্র পুরোপুরি সমজদার হতে পারেন।

যুবক? বারবারা জিজ্ঞেস করলে। কে সে? গরীব কোন শিল্পী বুঝি?

না গো, না, এখানকার মেয়েদের মধ্যে তো সাড়া তুলেছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গেও তাই। অভিজাত যুবক, সেরা অভিজাত সমাজে তার চলাফেরা। হয় তো নামও শুনেছ! পানসীন, ভ্লাদিমির নিকোলাই পানসীন তার নাম। এখানে সরকারী কাজে এসেছেন···ভবিষ্যতে এ যুবক মন্ত্রী হবেন দেখে নিও!

একজন শিল্পীও বুঝি তিনি?

মনে প্রাণে শিল্পী, আর কি ভদ্র! তার সঙ্গে দেখা হলে বুঝবে। এখানে তো প্রায়ই আসেন। আজ সন্ধ্যেয়ও নিমন্ত্রণ করেছি। আশা করি, এখুনি এসে যাবেন। মারিয়া একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

লিজা হাসির মানে বুঝতে পারলো, কিন্তু ওতে আঘাত পাবার মতো মনের অবস্থা তার নেই।

তিনি যুবক? বারবারা আবার বলে উঠলো।

আটাশ বছর তার বয়েস, চমৎকার দেখতে। গুণী যুবক, সুন্দর যুবক!

আমি বলি, আদর্শ যুবক, গিদিয়োনোভ্‌স্কী মন্তব্য করেন।

হঠাৎ বারবারা পাভলোভ্‌না এক উদ্দাম ওয়ালৎস্‌ বাজাতে শুরু করলে। স্ট্রাউসের ওয়ালৎস্‌ আঙ্গুলের আঘাতে সমস্তখানি উদ্দামতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। চটুল ছন্দ বেজে বেজে উঠছে। গিদিয়োনোভস্কী শিউরে উঠলেন। হঠাৎ ওয়ালৎস্‌-এর ভিতরে সে বিষাদের এক সুর নিয়ে এল। শেষ করলো লুসিয়ার সমাপ্তি সঙ্গীত দিয়ে।...তার মনে পড়লো, এ অবস্থায় এমন উচ্ছ্বল আনন্দের গাথা তো মানায় না। তাই লুসিয়ার সমাপ্তি সঙ্গীতে সে জোর দিলে ভাবালুতাময় স্তবকগুলির উপর। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সত্যিই কি আবেগ, কি অনুভূতি নিয়ে আসে! তিনি চাপা গলায় গিদিয়োনোভ্‌স্কীকে বললেন।

বাতাসের আত্মা যেন! গিদিয়োনোভ্‌স্কী আবার বলে উঠলেন।

খাবার সময় হয়ে এল। স্যুপ পরিবেশন করা হয়ে গেছে, তখন নীচে নেমে এলেন মারফা দিমোফিয়েভ্‌না। বারবারা পাভ্‌লোভনার কুশল জিজ্ঞেস করলেন, তার কথার দু-একটা জবাবও দিলেন। নীরস তার স্বর, নীরস সংক্ষিপ্ত জবাব। কিন্তু একবার তার মুখের দিকে ফিরেও তাকালেন না। বারবারাও বুঝতে পারলে, এই বৃদ্ধার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করা বৃথা। সে তাই আর তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করলে না। মারিয়ার মন কিন্তু সহানুভূতিতে ভরে গেছে। পিসীর অভদ্রতায় তিনি বিরক্তই হলেন। চটেও গেলেন। মারফা বারবারাকেই শুধু এড়িয়ে গেলেন না, লিজার দিকেও তিনি তাকালেন না। কিন্তু চোখ তাঁর সজাগ, শাণিত হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন তিনি। বিবর্ণ, রিক্ততার প্রতিমূর্তি, হলুদের ছোঁয়া আছে তাতে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা; কথা বলছেন না, খাচ্ছেনও না। লিজা শান্ত। সত্যিই তার বুকের ঝড় শান্ত

হয়ে এসেছে। এখন যেন কেমন অদ্ভুত এক অবসাদ। এ অবসাদ অনুভব করা যায়। দণ্ডিত মানুষ বুঝি এমনি অবসাদ অনুভব করে ; বুঝি তা নেমে আসে শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়। খেতে বসে বারবারাও তেমন কথা বলছে না। আবার বোধ হয় একটু লজ্জিত হয়েছে ; মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণতা সেখানে ছেয়ে গেছে। গিদিয়োনোভ্স্কী আলাপের ধারা একা বজায় রেখেছেন। গল্প করছেন, তাঁর গুজব গল্প—আর সঙ্গে সঙ্গে তাকাচ্ছেন মারফার দিকে। অস্বস্তি সে দৃষ্টিতে। গলা সাফ করছেন—ওঁর সামনে মিছে কথা বলতে গেলে তার বাঁধ বাঁধ ঠেকে, গলার স্বর ভেঙে যায়। কিন্তু মারফা আজ তাকে বাধা দিলেন না।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। শোনা গেল, হুইস্ট খেলা বারবারার বড় প্রিয়। মারিয়া খবরটা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বুঝি বা অভিভূতই হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, সত্যি ফিওদর ইভানিচটা কি মূর্খ! এমন মেয়ের কদর বুঝলে না!

তিনি গিদিয়োনোভস্কী আর বারবারাকে নিয়ে তাস খেলায় বসে গেলেন। মারফা লিজাকে নিয়ে উপরে চলে এলেন। বলে গেলেন, লিজার মুখ দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, তার খুব মাথা ধরেছে।

মারিয়া বারবারাকে বললেন, হ্যাঁ, ভয়ংকর মাথা ধরে ওর। আমারও অমনি মাথা ধরা আছে···ভয়ংকর ধরে···

তাই নাকি! বারবারার অস্ফুট স্বর শোনা গেল।

লিজা মারফার ঘরে এসে চেয়ারে ভেঙে পড়লো। তার দিকে বহুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন মারফা। এবার হাঁটু গেড়ে তার সুমুখে বসে পড়ে তার হাতের উপর চুমু খেলেন। লিজা ঝুঁকে পড়লো—রক্তিম ছোপ তার মুখে ঘন হয়ে আসছে। সে কেঁদে উঠলো, কিন্তু মারফা উঠলেন না, লিজাও তার হাত সরিয়ে নিলে না। তার মনে হোল, হাত সরিয়ে নেবার অধিকার তার নেই। বৃদ্ধাকে সহানুভূতি আর দুঃখ জানাবার সুযোগ

দিতে হবে। কাল যা ঘটে গেছে তার জন্যে চাইতে হবে ক্ষমা। মারফা হাতের উপর ঠোট রেখে নিঃশব্দে বসে রইলেন। বিশীর্ণ-হাত দুখানি, অভাগী এক নারীর দুখানি হাত—দুর্বল হাত। বেশীক্ষণ চুমু খাওয়াও যায় না—মনে হয় ঠোঁটের চাপও সইবে না—এতই কোমল। মারফার গাল বেয়ে নামলো অঝোরে জল। লিজার চোখের জলে মিশে গেল। দুই নিঃশব্দ ধারার মিলন হোল। বিড়ালটা আরাম কেদারার পশমের উষ্ণতায় ডেকে উঠলো। আইকনের কাছে তেলের ছোট প্রদীপটির দীর্ঘশিখা উঠলো কেঁপে কেঁপে। আর পাশের ঘরে, দরজার আড়ালে নাস্তাশিয়া কার্পোভনা ডোরা-কাটা রুমালখানা তালগোল পাকিয়ে বারবার চোখ মুছলো।

উনচল্লিশ

বসবার ঘরে তখনো হুইস্ট খেলা চলছে। মারিয়া জিতছেন, মনটাও তার প্রফুল্ল। একজন পরিচারক এসে জানালে, পানসীন এসেছেন।

মারিয়া তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বারবারার মুখে রহস্যভরা হাসি। সে মারিয়ার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দরজার দিকে তাকালো। পানসীন ঢুকছে ঘরে। পরণে তার কালো ফ্রক কোট, তাতে উঁচু ইংরেজী কলার। গলায় আবার বোতামও আঁটা। সে এসেই মারিয়াকে বললে, আমার পক্ষে এ হুকুম তামিল করা সোজা নয়, কিন্তু দেখলেন তো, তবু এলাম।

তার সদ্য-কামানো মুখে হাসি নেই।

মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন, ওল্ডেমার, তুমি তো এত্তেলা না দিয়েই আস, আজ যে চাকরকে দিয়ে খবর দিলে?

পানসীন মারিয়াকে শুধু চোখের দৃষ্টিতে জবাব দিয়ে নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানালে। আজ আর হাতে সে চুমু খেল না। বারবারার সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলেন মারিয়া। পানসীন একটু পিছু হটে নুয়ে তাকে অভিবাদন জানালে। ঠিক আগেরই মতো—কিন্তু তাতে রইলো অভিজাত সমাজের একটু সংস্কৃতির ছাপ, একটু বা শ্রদ্ধার ভাব। এবার তাসের টেবিলে এসে সে বসে পড়লো।

খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। পানসীন একবার এলিজাবেথা মিথাইলোভ্‌নার কথা জিজ্ঞেস করলে। যখন শুনলে সে অসুস্থ, সে অস্ফুট স্বরে দুঃখ জানালে। এবার শুরু হোল বারবারার সঙ্গে আলাপ। কূট রাজনীতিজ্ঞের মতো প্রতিটি কথা ওজন করে বলছে, মেপে-জুপে বলছে, আবার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও বাদ পড়ছে না। এ অভিজাত সমাজের রীতি, কথা বলার ধরণ—চাল! বারবারার উত্তরের জন্য কান পেতে আছে যেন এমনি তার বিনম্রী ভাব। তার এই চাল, গলার স্বরের ওজন-করা আভিজাত্য বারবারাকে অভিভূত করতে পারে নি। এতে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঘা পড়ে নি। উৎসারিত হয়ে পড়েনি কথার স্রোত। এ তার চেনা কসরৎ, চেনা স্বর। বরং স্থূল, পারিসীয় সূক্ষ্মতা এতে নেই। সে তাই তাকে অন্য চোখে দেখছে। একটু বা তামাসাই করছে, মেকি শ্রদ্ধার আড়ালে তামাসার খোঁচা মারছে। কথা বলে চলেছে বটে, কিন্তু তাতে আড়ম্বর নেই। তার নাক বারবার কেঁপে উঠছে চাপা হাসির আবেগে। মারিয়া এবার বারবারার গুণকীর্তন করতে বসলেন। পানসীন মাথা নাড়তে লাগলো—অবশ্য তার কোটের ঐ আঁটো কলারে যতটা নাড়া যায়। সে মাথা নেড়ে জানালে, 'এ বিষয়ে সে সব সময়েই একমত।' সে একথা সে-কথা বলতে বলতে মেটারনিকের নামটাও আউড়ে ফেললে। বারবারার মখমল-কোমল চোখ বার বার কুঁচকে উঠছে। সে যেন অস্ফুট স্বরেই কথাটা ছুঁড়ে মারলো, আপনি একজন শিল্পী! তাহলে—ইঙ্গিতে সে পিয়ানো দেখিয়ে দিলে। 'শিল্পী' এই কথাটায় তখনি ফল ফললো। এ যেন এক যাদুর প্রভাব, পানসীন গলে গেল। তার গম্ভীর হাব ভাব অদৃশ্য হয়ে গেল,

মুখে দেখা দিল হাসি। হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো তার মুখ। কোটের বোতাম খুলতে খুলতে সে বললে, তেমন কিছু নই। কিন্তু আপনি তো শুনেছি খাঁটি শিল্পী।...

বারবারার পিছু পিছু সে এসে দাঁড়াল পিয়ানোর কাছে।

মারিয়া বললেন, ওর সেই ভাসমান চাঁদের গানটা গাইতে বল!

বারবারা তার দিকে হাসির ঝিলিক হেনে বললে, আপনি গাইতেও পারেন? বসে পড়ুন, আর দেরী নয়!

পানসীন অজুহাত দেখাতে লাগলো।

বসে পড়ুন তো আগে, বারবারা চেয়ারের পিছনে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে বললে।

বসেছে পানসীন, কাসছে; কলারটা একটু টেনে আলগা করে নিয়ে সে গান গাইলে।

চমৎকার! বারবারা বলে উঠলো। চমৎকার গান—চমৎকার সুর! গাইবার ভঙ্গীটিও ভাল। আবার গেয়ে যান তো!

সে পিয়ানোর ওপাশে চলে গেল। পানসীনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। আবার সে গাইলে সেই চাঁদের গান। স্বরে নিয়ে এল ভাবালুতা। কেঁপে কেঁপে উঠলো স্বর। বারবারা পিয়ানোর উপর ভর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এবার গান শেষ হয়ে গেল।

চমৎকার গান, চমৎকার ভাব! পাকা সমঝদারের মতো সে বলে উঠলো। শুনুন, মেয়েরা গাইতে পারে এমন কিছু রচনা আপনার আছে?

আমার রচনা বলে কিছুই নেই, পানসীন বললে, নিজের জন্যেই আমার এ রচনা। আপনিও তা বুঝতে পারছেন...আচ্ছা, আপনি কি গান করেন?

হাঁ, করি।

তাহলে আমাদের দু-একখানা যদি শোনাও! মারিয়া অনুরোধ করলেন। অনুরোধ নয়, পেড়াপীড়ি।

বারবারার মুখে এসে পড়েছে চুলের গোছা। সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে। দীপ্ত তার মুখ। মাথাটা সে একবার দোলালে।

পানসীনের দিকে তাকিয়ে বললে, একসঙ্গে গাইলে কেমন হয়?··· আসুন না, একটা দ্বৈত-সঙ্গীত গাই। আপনি কি চাঁদের সেই গানটা জানেন? সেই যে 'আমার চাঁদ আমার···

আগে গাইতাম, পানসীন উত্তর দিলে, কিন্তু সে তো বহুদিনের কথা। আজ আর কিছুই মনে নেই।

ভাবনা কি! আগে আমরা মহলা দিয়ে নেব আস্তে আস্তে। তাহলে শুরু করি—কি বলেন?

বারবারা পিয়ানোয় বসে পড়লো। পানসীন তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বৈত গানটি গুণগুণ করে তারা গাইলে। বারবারা কয়েকবার তার ভুল শুধরে দিলে। এবার জোরে গেয়ে উঠলো তারা। বারবারার স্বরে প্রথম যৌবনের সে মাদকতা নেই, কবে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, তবু সে নিপুণ ভাবে গেয়ে গেল। দৈন্য সে ঢেকে রাখলে নিপুণতার আড়ালে। পানসীন প্রথমে বিব্রত হয়ে পড়েছিল, লজ্জা করছিল তার—কিন্তু আবেশ এসে তার উত্তেজনা জাগিয়ে দিলে। তার গান বাহবা দেওয়ার মতো না হোক, সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে, দেহখানা দুলিয়ে তার দৈন্যকে ঢেকে রাখলে। তার হাতের কসরৎ দেখে মনে হোল, সে একজন ওস্তাদ গাইয়ে। বারবারা থালবার্গের দু-একটা গৎ বাজিয়ে শোনালে, লাস্য সহকারে সে ফরাসী এক গান আবৃত্তি করলে। মারিয়া খুশী হয়ে উঠলেন। কয়েকবার লিজাকে গিয়ে ডেকে আনবার ইচ্ছে হোল। গিদিয়োনোভ্স্কীর মুখে কথা সরছে না। শুধু ঘাড় নাড়ছেন। হঠাৎ তিনি দীর্ঘ হাই তুললেন, কোনরকমে বিরক্তি চেপে রাখছেন। বারবারা কিন্তু টের পেল। হাই তোলা তার নজর এড়ায় নি। হঠাৎ সে পিয়ানোর দিকে পিছন ফিরে বললে, এখন গান-বাজনা থাক, আসুন গল্প করি!

বেশ তো, পানসান বলে উঠলো।

ফরাসী ভাষায় হালকা কথা শুরু হোল, রসে ভরা কথা, ঝকঝকে—চকচকে কথা।

মারিয়া শুনতে শুনতে ভাবলেন, প্যারীর বিলাসী-বিলাসিনীদের মজলিশে এমনি কথাই বুঝি হয়ে থাকে।

তিনি কান পেতে রইলেন। ওরা করছে খোস গল্প। সূক্ষ্ম ঠাস বুনোনি, ঠিক প্যারীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

পানসীন উপভোগ করছে, চোখে তার দীপ্তি। মুখের রেখায় রেখায় হাসি। কুঁচকে যাচ্ছে মুখ বারবার। প্রথমে প্রথমে মারিয়ার দিকে চোখ পড়তেই সে ভ্রূ কুঁচকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল; কিন্তু এখন আর সে কথা মনে নেই। মারিয়াকে যেন সে ভুলে গেছে, সে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে মজলিশি আবহাওয়ায়। আর বারবারা পাভলোভনা যেন একজন দার্শনিক। সব কথারই জবাব তার তৈরী। একটু বিব্রত হচ্ছে না, একটু সংশয় তার নেই। দেখলেই মনে হয়, বহু রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ তার হয়েছে। নাগরিক ছলাকলা তার আয়ত্তে। সত্যিই তাই! তার চিন্তার মূলকেন্দ্র প্যারী। তারই বৃত্তে তার ভাবনার ঘোরাফেরা তাই মজলিশে ভুল তার হয় না, জবাবের পিঠে জবাব চালিয়ে যায়।

পানসীন এবার সাহিত্যের দিকে আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। দেখা গেল, পানসীনের মতোই বারবারা শুধু ফরাসী বই-ই পড়েছে। জর্জ সাঁদ পড়লে সে ক্ষেপে যায়। বালজাককে সে শ্রদ্ধা করে, একঘেয়ে হলেও শ্রদ্ধা করে। সুয়ে আর স্ক্রাইভের মানুষের মনগহন সম্বন্ধে অগাধ জানাশুনো। দ্যুমা আর ফেভালকে সে করে পূজা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে পল-দ্য কক্‌কেই তার বেশী পছন্দ, কিন্তু তাঁর নামই সে উচ্চারণ করলে না। করা যায়ও না, তিনি তো সাহিত্যের

জমাদার, পাঁক ঘাঁটেন। আর সাহিত্যের দিকে তার তেমন ঝোঁকও নেই। বারবারা সব কিছুকেই এড়িয়ে চলতে জানে। সাহিত্যকে সে এমনি করেই এড়িয়ে চলে; ভাসা ভাসা কথা, শোনা-কথা বলে। এমন কি তার নিজের বিগত জীবনের স্মৃতিকেও সে এড়িয়ে চলে। তার আলাপে প্রেমের কথা এখনো ওঠেনি। আর উঠলেও যেখানে আছে প্রেমের প্রতি কঠোরতা, জৈবীক কামনাকে সে তর্জনী তুলে শাসিয়েছে। প্রেমে সে শুধু যেন দেখেছে নিরাশা। পানসীন প্রেমের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে, আর সে তাকে বাধা দিয়েছে···কিন্তু কি অদ্ভুত! ঠোঁট শাসনের কথা বলেছে, কখনো বা ফুঁসে উঠেছে অভিশাপে···মন কিন্তু পানসীনের কথার ধ্বনিতে খুশি হয়ে উঠেছে। সে যেন সোহাগে বিহ্বল হযে উঠেছে, চোখে ঝরে পড়েছে সেই ভাষা···সত্যিই ঐ সুন্দর চোখে কি ভাষা আছে কে জানে!·· তার সংকেত তো অস্পষ্ট, মধুর—কিন্তু নিষেধের বেড়াজাল তুলে সে দেয় নি। পানসীন তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। সে ঐ চোখের ভাষা পড়তে চায়, তলিয়ে যেতে চায় চোখের সমুদ্রে। সেও বুঝি চায় তার চোখ অমনি বাঙ্‌ময় হোক। চেষ্টাও সে করছে। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা! বারবারা যেন সিংহিনী। তার গর্বোদ্ধত মাথা সে উঁচু করে আছে—পানসীনের সত্তাকে ঢেকে ফেলেছে বিদেশাগতা এই নারী। তাই স্বস্তি সে পাচ্ছে না। সহজ হতে পারছে না। বারবারার আর একটা অভ্যেস, সে কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে, তার জামার আস্তিন ধরে কখনো বা আলতো করে একটু টেনে দেয়। এতো এক লহমার ছোঁয়া—তবু সে ছোঁয়া যেন ভ্লাদিমির নিকোলাইকে অস্থির করে তুলছে।

বারবারা লোকের সঙ্গে সহজ হতে জানে। দুঘণ্টার ভিতরেই পানসীনের মনে হোল, সে যেন তার বহুকালের চেনা মানুষ। আর লিজা, যাকে সে সত্যিই ভালবাসে—কাল যার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করেছে

—তাকে সে যেন এমনি করে কখনো চিনতে পারে নি। কথার ঘূর্ণাবর্তে এখন তো লিজা তলিয়ে গেছে, কুয়াশার আড়ালে যেন মিলিয়ে গেছে।

চা দেওয়া হোল এবার। আলাপের বাঁধ এবার আরো আল্‌গা। মারিয়া বাচ্চা চাকরটাকে ঘণ্টা টিপে ডেকে বললেন, লিজাকে সে খবর দিক। যদি ভাল থাকে, সে যেন নীচে আসে। লিজার নাম শুনেই আত্মোৎসর্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করলো পানসীন। তার মূল প্রশ্ন, পুরুষ না নারী—কার আত্মোৎসর্গ বেশী। মারিয়া অমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, মেয়েরাই আত্মোৎসর্গ করে, পুরুষরা নয়। তিনি তাঁর কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন। কেমন এলোমেলো হয়ে গেল বক্তব্য, শেষে একটা যেমন-তেমন উদাহরণ দিয়ে শেষ করলেন। বারবারা একখানা স্বরলিপির বই তুলে নিয়ে নিজেকে আড়াল করে আছে। পানসীনের দিকে তাকিয়ে কেকে একটু কামড় দিয়ে সে হাসছে। এ আলোচনা যেন কিছুই নয়। পানসীন তাকিয়ে আছে তার দিকে। বারবারার চোখেমুখে হাসি। সে বুঝতে পারলে না, কাকে সে আঘাত করছে। তবু সে ক্ষেপে গেল। যে মারিয়া তাকে স্নেহ করেন, এত যত্ন করে খাওয়ান-দাওয়ান, টাকা ধার দেন, তার দিকে সেও তাকিয়ে হেসে উঠলো।

বারবারা একবার তার দিকে মিষ্টি করে তাকিয়ে উঠে পড়লো। এমন সময় লিজা এসে ঢুকলো ঘরে। মারফা তাকে বহু বারণ করেছিলেন, কিন্তু সে শোনে নি। অগ্নি-পরীক্ষা দেবে এই তার সংকল্প। বারবারা তার কাছে এগিয়ে এল। পানসীনের মুখ গম্ভীর। পাকা কূটরাজনীতিজ্ঞের মতো তার হাবভাব।

কেমন আছ? সে লিজাকে জিজ্ঞেস করলো।

ধন্যবাদ! ভাল আছি।

এখানে এইমাত্র একটু গান-বাজনা হোল। বারবারা পাভ্‌লোভনা

গাইলেন, তুমি শুনতে পেলে না। চমৎকার গান করেন উনি! যাকে বলে খাঁটি শিল্পী!

বাছা, এদিকে এস, মারিয়া ডাকলেন।

বারবারা শিশুর মতো গিয়ে বসলো মারিয়ার পায়ের কাছে একখানা টুলে। পানসানের সঙ্গে অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্য লিজার দেখা হোক এই তিনি চান। এখনো তার আশা, মেয়েটার মতিগতি ফিরবে। তাছাড়া একটা কথা তার মনে হয়েছে। তিনি সে কথা বলবার জন্যে উদগ্রীব।

তিনি বারবারা পাভ্‌লোভনাকে ফিসফিস করে বললেন, জানো, তোমার সঙ্গে যাতে আবার তোমার স্বামীর মিলন হয় তার চেষ্টা করতে চাই। পারব যে একথা বলি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখব। ওর আমার উপর অগাধ শ্রদ্ধা। বারবারা আস্তে আস্তে মারিয়ার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো। হাত দুখানি মনোরম ভঙ্গীতে সে রেখেছে।

করুণ স্বরে সে বললে, সত্যি, আপনি আমার রক্ষাকর্ত্রী হবেন? আমি যে কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না। আপনি এত ভাল! কিন্তু আমি ফিওদর ইভানিচের উপর যে অবিচার করেছি, তিনি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না!

সত্যি···সত্যি তুমি···মারিয়া আসল কথা জানবার জন্যে বলে উঠলেন।

বারবারা চোখ নিচু করে বললে, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, আমার তখন যৌবন···আমি ছিলাম অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল······কিন্তু আমি তো তার জন্যে ক্ষমা পেতে চাই না, ওজুহাত দেখাতে চাই না।

তা যাই-ই হোক, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! ঘাবড়ে যেও না! মারিয়া তার গালে সোহাগ করে চাপড়ে দিতে গেলেন। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে বাধা পেলেন। তিনি ভাবলেন, কোমলও নম্র, ঠিকই, কিন্তু ওর ভিতরে লুকিয়ে আছে এক সিংহিনী।

পানসীন এরই মধ্যে লিজার সঙ্গে আলাপ শুরু করেছে।

তোমার কি অসুখ নাকি ?

হাঁ, শরীরটা ভাল নেই।

হুঁ বুঝতে পেরেছি। দীর্ঘস্থায়ী নীরবতার পর সে বললে, হুঁ ! বুঝতে পেরেছি।

তার মানে ?

যেন ওর মন জানে, এমনি ভাবেই বললে পানসীন, আমি জানি, বুঝি। এই একটা কথাই তার মুখে এল।

লিজা হতবুদ্ধি। সে ভাবলে, বেশ তো বুঝুক না ! পানসীন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এবার সে চুপ করে গেল। তার মুখের রেখায় কঠোরতা, দৃষ্টিতে রূঢ়তা।

আমার তো মনে হয় এগারোটা বেজে গেছে, মারিয়া এক সময়ে বলে উঠলেন।

অতিথিরা বুঝতে পেরেছে কথার মানে। তারা উঠে পড়লো। বারবারার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হোল, সে পরদিন খেতে আসবে। সঙ্গে এডাকেও আনবে। গিদিয়োনোভস্কী এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছিলেন, তিনি তাকে বাড়া পৌছে দিতে চাইলেন। পানসীন সবার কাছেই বিদায় নিলে। বারবারাকে গাড়িতে হাত ধরে তুলে দিতে গিয়ে সে বলে উঠলো, আজকের মতো বিদায় ! হাত হাতে নিয়ে আস্তে চাপ দিলে। গিদিয়োনোভস্কী গাড়ীতে উঠে বসলেন। বারবারা সময়টা কাটবার জন্যে নিজের সুন্দর পা দু'খানা যেন অজান্তে তার পায়ের উপর বারবার তুলে দিলে। তিনিও উত্তেজিত হয়ে ওর প্রশংসায় মেতে উঠলেন। বারবারা মুচকি হাসছে। গাড়ির ভিতরে পথের আলো এসে পড়তেই সে ট্যারচা চোখে বারবার তাকাতে লাগলো। এ যেন এক রহস্যময় আমন্ত্রণ। ওয়ালৎস্-এর সুর এখনো রিমঝিম করছে তার

মগজে, উত্তেজনার টুংটাং ঝংকার দেহলতায়। বারবারা যেখানেই থাকুক, তার কল্পনাশক্তি প্রখর। শুধু সে কল্পনা করবে, আর ভেসে উঠবে বল নাচের আসর, আলো ঝলমল করবে, সঙ্গীতের তালে তালে ঘূর্ণি উঠবে জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষের—আর কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যাবে তার রক্তে। দৃষ্টি আসবে আবছা হয়ে, মুখে ফুটে উঠবে হাসি—সমস্ত দেহ উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্যে ভরে যাবে, শিহরণ উঠবে। আজও তাই হোল। যখন সে বাড়ী এসে পৌঁছল, বারবারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো—ওর এই ভঙ্গী—এ কি সিংহিনী ছাড়া আর কেউ পারে? সে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো গিদিয়োনোভস্কীর দিকে—তারপর খিলখিল করে হেসে উঠলো।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য বাড়ির পথে চলতে চলতে ভাবলেন, চমৎকার! মনে মনে তারিফ করলেন। বাড়িতে তাঁর প্রতীক্ষা করছে ওষুধের গেলাস হাতে নিয়ে পরিচারক।

হাঁ, আমি সম্ভ্রান্ত মানুষ বলে চুপ করে ছিলাম। ভালই হয়েছে···কিন্তু উনি অমন করে হেসে উঠলেন কেন?

আর মারফা সারা রাত লিজার মাথার শিয়রে ঠায় বসে কাটালেন।

চল্লিশ

দেড়দিন হয়ে গেল লাভ্রেৎস্কী ভ্যাসিলিয়েভস্কোয়ে এসেছেন। আশে পাশের অঞ্চলগুলিতে ঘুরে ঘুরে সময়টা কাটছে। এক জায়গায় দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারেন না। মন দুঃখে বিভ্রান্ত। নিষ্ফলা কামনার বেদনা সইছেন তিনি—এ কামনা এসেছিল প্রবল হয়ে, কিন্তু আনে নি সফলতা। গ্রামে আসবার পর কত ভেবেছিলেন, ভাবাবেগে তখন আত্মা আচ্ছন্ন। কত পরিকল্পনা ছকে নিয়েছিলেন, কিন্তু কি হোল? নিজের

উপরই রাগ হোল। যাকে তিনি কর্তব্য বলে ভাবতেন, নিজের ভবিষ্যতের একমাত্র কাজ বলে মনে করতেন—তা থেকে কি করে বিচ্যুত হলেন—কেন এমন হোল? সুখের কামনা—আবার সুখের কামনা! তাঁর মনে হোল, মিখালেভিচ ঠিকই বলেছে। আপন মনে বলে উঠলেন, আবার জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে চাও?—তুমি কি ভুলে গেছ যে, এ এক বিলাসিতা। তুমি না বলেছ, এ আনন্দ তুচ্ছ, সম্পূর্ণতা এতে নেই? এ যদি আশীর্বাদ হয়, সে তো নিষ্ফল। তবে? তুমি কি সত্যিকারের সুখ চাইছ? বেশ তো, তোমার কি যোগ্যতা আছে দেখাও! চারদিকে তাকিয়ে দেখ—সুখী কে, কার মনে আছে আনন্দ? ঐ যে চাষী কাস্তে নিয়ে চলেছে মাঠে—ও কি নিজের ভাগ্য নিয়ে সুখী?···

ওর সঙ্গে কি নিজের ভাগ্য বদল করতে চাও? তোমার মার কথা ভেবে দেখ···জীবন থেকে তিনি সামান্যই চেয়েছিলেন—কিন্তু কি তাঁকে দিলে জীবন? যখন পানসীনকে বলেছিলে, তুমি রাশিয়ায় ফিরেছ জমি চাষ করতে—বোধ হয় নিছক বড়াই করেই বলেছিলে। তাতো নয়, জমি চাষ করতে তুমি আসনি। তুমি বুড়ো বয়সে মেয়েদের হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেই এসেছ। যেমনি তোমার মুক্তির খবর পেলে, সব কিছু ভুলে গেলে, ইস্কুলের ছেলের মতো ছুটলে প্রজাপতির পিছনে···

ভাবনার ভিতরে লিজার মুখখানা ভেসে-ভেসে উঠলো। তিনি জোর করে সে মুখ ভুলে যেতে চাইলেন—তাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলেন—এমনি করে তো তিনি আর একখানা মুখও সরিয়ে দিয়েছেন। সে মুখ কমনীয়, কিন্তু তার রেখায় রেখায় আছে ছলনা, সয়তানি—সে-মুখ ঘৃণ্য।

বুড়ো আন্তন বুঝতে পারলে, তার প্রভুর মন ভাল নেই। সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দু-একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে

একটু কিছু পান করবার অনুরোধ জানালে। একটু মদ বা গরম কিছু—যাতে তিনি চাঙা হয়ে উঠতে পারেন। লাভ্রেৎস্কী মারমুখো হয়ে উঠে তাকে বেরিয়ে যেতে বললেন। নিজেই পরমুহূর্তে আবার লজ্জা পেলেন। ক্ষমাও চাইলেন। আন্তন এবারে দুঃখ পেল বেশী। লাভ্রেৎস্কী বসবার ঘরে যেন টিকতে পারলেন না। তার বৃদ্ধ প্রপিতামহ যেন তার দিকে বিদ্রূপভরে তাকিয়ে আছেন। ক্যানভাসের আঁকা ছবি থেকে বিদ্রূপ দৃষ্টি ঝরে পড়ছে তাঁর এই দুর্বল বংশধরের উপর। বাঃ রে মাছের প্রাণ মানুষ! তাঁর মুখে বিদ্রূপের রূঢ়তা।…লাভ্রেৎস্কী আপন মনে বলে উঠলেন, না, না, এতো হতে পারে না! আমি এমন করে নিজেকে ধ্বংস হতে দেব না—এই যে বুকে গভীর ক্ষত হোল—এই যে ছড়ে গেল, এতেই কি মৃত্যুকে কাছে ঘেঁসতে দেব? (যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে আহত মানুষ ক্ষতকে বলে ছড়ে যাওয়া। এ-এক আত্মতৃপ্তি) আমি কি কাঁদুনে ছেলে নাকি! বেশ তো, আমি লহমার জন্য দেখেছিলাম, জীবনের সুখ আমি প্রায় মুঠোর ভিতরে পেয়েছিলাম—তার পরে সে তো হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আশা নিরাশায় পরিণত হোল। তা সুবৃতি খেলায় তো এমনিই হয়—চাকাটা একটু ঘুরে যায়—ভিক্ষুক হয় ধনী। যদি তা না হয়, না-ই হোলো। এর বেশী আর কি করা যায়। আবার দাঁতে দাঁত চেপে কাজ শুরু করতে হবে, নিজেকে শান্ত, সংযত করে রাখতে হবে। জীবনে এতো আর প্রথম নয়। আর একবারও তো নিজের রাশ টেনে ধরেছিলাম। এবার ভয় পাচ্ছি কেন? পালিয়ে এলাম কেন? এখানেই বা ঝোপে মুখ লুকিয়ে উটপাখীর মতো পড়ে আছি কেন? মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো স্নায়ুর জোর নেই? বাজে, একেবারে বাজে আমি! তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, আন্তন, এখনি টমটম নিয়ে এস!…আবার মনে হোল, হাঁ, নিজেকে জোর করে শান্ত করতে হবে, আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে।…

এমন যুক্তিতর্কে লাভ্রেৎস্কী নিজের ব্যথা লাঘব করতে চাইলেন। কিন্তু এ ব্যথা তো তীব্র, গভীর এর ক্ষত-মুখ। সহজে কি এর লাঘব হয়? এমন যে আপ্রাক্সিয়া সেও তা বুঝতে পারলো। তার এখনো ভাবাবেগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। মন বলে জিনিস আছে। সে মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেললো, তারপর প্রভুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তিনি গাড়িতে উঠছেন, শহরে যাবেন। আপ্রাক্সিয়ার দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে। ঘোড়া জোর কদমে ছুটলো। তিনি চুপ করে বসে আছেন। সুমুখে পথ বিছিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে আছেন শূন্য দৃষ্টি মেলে।

একচল্লিশ

আগের দিন লিজা লিখে জানিয়েছিল, সন্ধ্যেয় তিনি যেন আসেন; দেখা হবে। তিনি আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হলেন না; নিজের বাড়িতে এলেন। বাড়িতে স্ত্রী বা মেয়ে কেউ নেই। চাকরের কাছে শুনলেন, স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে কালিতিনদের ওখানে গেছে। খবর পেয়ে তিনি অবাক হলেন, রাগও হোল। মনে মনে ভাবলেন, তাইত, বারবারা মনে মনে ঠিক করেছে, আমাকে সে কুকুর-বেড়ালের জীবন কাটাতে বাধ্য করবে! ঘৃণায় তার মন ভরে গেল। পায়চারী করতে লাগলেন। খেলনা, বই, মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস, যা সামনে পড়লো লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর জাস্তাঁকে ডেকে এই সব 'জঞ্জাল' সাফ করতে হুকুম দিলেন। মুখভঙ্গী করে সে ঘর গোছাতে লাগলো। নুয়ে পড়ে সে গোছাচ্ছে, সুন্দর তার অঙ্গভঙ্গী। সে যেন তার হাবভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, লাভ্রেৎস্কীকে সে এক বুনো ভাল্লুক ছাড়া কিছু মনে করে না। তিনি তাকিয়ে দেখলেন তার দিকে। ক্রুদ্ধ, উচ্ছৃঙ্খল ব্যঙ্গময়ী প্যারীর নাগরিকা। সাদা ঢিলে জামা তার পরণে, মাথায়

টুপী। তিনি তাকে এবার চলে যেতে বললেন। দীর্ঘক্ষণ ইতস্ততঃ করে কেটে গেল। বারবারা পাভ্‌লোভ্‌না এখনো ফেরে নি। তিনি ঠিক করলেন, কালিতিনদের ওখানে যাবেন। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার ওখানে নয় (বসবার ঘরে তিনি ঢুকবেন না—সেখানে তো তাঁর স্ত্রী আছে সেখানে কেউ তাকে নিয়ে যেতে পারবেনা)। তিনি যাবেন মারিয়া দিমোফিয়েভ্‌নায় কাছে। চাকরদের আস্তানা যে দিকে-সে দিক দিয়ে ঢুকেই পাবেন সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি উঠে গেছে মারফা দিমোফিয়েভ্‌নার ঘরে। হাঁ, এই-ই তিনি ঠিক করলেন।

ভাগ্য ভালো, উঠোনে স্থরোচ্‌কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তাঁকে নিয়ে গেল মারফার কাছে। তিনি কখনো একা থাকেন না ; আজ কিন্তু একাই আছেন। এক কোণে বসে আছেন, মাথায় টুপী নেই। কেমন জবুথবু ভাব, হাত দুখানা বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা। লাভ্রেৎস্কীকে দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন। যেন টুপীটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

তার দিকে না তাকিয়ে, কি যেন খোঁজার ভান করে বললেন, আরে তুমি—তুমি যে! ভাল আছ তো! তারপর কাল কোথায় ছিলে? ও এসেই পড়লো তাহলে! হাঁ, হাঁ,—আর উপায় কি!

লাভ্রেৎস্কী একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

বোসো, বোসো! বৃদ্ধা বলে চললেন, সোজা উপরে এলে? হাঁ; তা বেশ করেছ! তা আমার সঙ্গেই দেখা করতে এলে বুঝি? ধন্যবাদ! বৃদ্ধা হাসলেন; লাভ্রেৎস্কী কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু বৃদ্ধা তার মনের কথা টের পেয়েছেন।

লিজা···লিজা এই কিছুক্ষণ আগেও এখানে ছিল···তিনি হাতের পশমের ছোট্ট থলেটার ফাঁস খুলছেন আর বন্ধ করছেন। তার শরীর ভাল নেই। স্থরোচ্‌কা কোথায় গেলি রে? আয় বাছা, এখানে আয়।

একদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারিস না! আমারও মাথা ধরেছে। অতো গান আর বাজনা কি বরদাস্ত হয়•••ওতেই মাথা ধরেছে।

কিসের গান-বাজনা পিসি?

কেন—সেই যে দ্বৈত গান না কি বলে—ওরা তো তাই গাইলে। তাও আবার ইতালীর ভাষায়। একেবার পাখীর কিচির-মিচির আর কি! আরে এমন সুর যে দাঁত শুলোয়। ঐ যে ঐ পানসীন আর তোমার বৌ গো! সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো, কোনে বাঁধো বাঁধো ঠেকলো না—যেন কত আত্মীয়! ভাবতো একবার, একটা কুকুরও থিতু হতে চায়। তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে না দিলে সে তো আর যায় না। তা তুমিতো—

আমার তো প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি বিশ্বাস হতে কি চায়! অনেকখানি স্নায়ুর জোর দরকার! লাভ্রেৎস্কী মন্তব্য করলেন।

না বাছা স্নায়ুর জোর নয়, একটু বিবেচনা থাকলেই হোত। একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতে। ভগবান ওকে ক্ষমা করুন! ওকে নাকি লাভ্রিকীতে পাঠিয়ে দিচ্ছ শুনলাম?

হাঁ, বারবারাকে ঐ জমিদারীটা দিয়ে দিলাম।

ও টাকা চেয়েছিল নাকি?

না, এখনো চায় নি!

শীগ্‌গীরই চাইবে। আহা বাছা, তোমার দিকে ভাল করে এতক্ষণ তো তাকিয়ে দেখি নি। তোমার কি অসুখ করেছে নাকি?

না,

সুরোচকা! মারফা হাঁক পাড়লেন। এলিজাবেথা মিথাইলোভ্‌নাকে গিয়ে বল—ও নীচে আছে না?

হাঁ।

ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, আমার বইখানা সে কোথায় রেখেছে, ও তাহলেই বুঝবে।

আচ্ছা !

বৃদ্ধা এবার ঘরে ঘুরছেন আর টানা খুলে খুলে দেখছেন। লাভ্রেৎস্কী চুপ করে বসে আছেন। হঠাৎ হাল্কা পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল। লিজা এসে ঢুকলো ঘরে।

লাভ্রেৎস্কী চেয়ার ছেড়ে উঠে অভিবাদন করলেন; লিজা দরজার কাছে থেমে পড়লো।

মারফা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, লিজা, বাছা, আমার বইখানা কোথায় গেল? কি করেছ বইখানা?

কি বই দিদা?

হা ভগবান, এখন বলছ কি বই!···আমি তো তোমাকে ডাকিনি বাছা··· থাকগে! বল তো, নীচে কি হচ্ছে? এইত ফিওদর ইভানিচ এসেছে!···তারপর মাথা ধরা কেমন?

এখন ভাল আছি।

তুমি তো বাছা সবসময়েই বল, ভাল আছি। নীচে কি হচ্ছে—আবার গান বাজনা চলছে নাকি?

না, ওঁরা তাস খেলছেন।

ও সব বিষয়েই তাহলে ওস্তাদ! সুরোচকা, তোর তো এখন বাগানে গিয়ে খেলতে ইচ্ছে করছে, যা···ছুটে যা!

না, না।

যা বলছি! তর্ক করে না, ছুটে যা! নাস্তাশিয়া একা বাগানে আছে। যা, ওর কাছে যা! যা না বাছা, আমিও আস্ছি।

সুরোচকা চলে গেল। মারফা আবার বললেন, আমার টুপীটা আবার কোথায় গেল?

আমি খুঁজে দেব, লিজা বললে।

তুমি যেখানে বসে আছ, সেখানেই থাক বাছা। এখনো আমার পা দুখানা অচল হয় নি। বোধহয় শোবার ঘরে আছে।

লাভ্রেৎস্কীর দিকে একবার তাকিয়ে মারফা বেরিয়ে গেলেন। দরজা খোলা রেখেই গেলেন। হঠাৎ আবার ফিরে এসে ভেজিয়ে দিলেন।

লিজা চেয়ারে মুখ নীচু করে বসে আছে, মুখ তার হাতের আড়ালে ঢাকা। লাভ্রেৎস্কী ঠায় বসে আছেন, নড়ছেন চড়ছেন না।

তিনি এবার নীরবতা ভাঙলেন, আবার এমনিভাবে দেখা হয়ে গেল।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলে লিজা।

হাঁ, তার স্বর মৃদু, আমরা শাস্তি পেলাম। খুব তাড়াতাড়ি পেলাম শাস্তি।

শাস্তি, লাভ্রেৎস্কীর অস্ফুট স্বরে বললেন, তুমি কেন শাস্তি পাবে লিজা ?

লিজা চোখ তুলে তাকালে, চোখে চোখ মিললো। তার চোখে দুঃখের ছায়া মাত্র নাই, নেই উদ্বেগ। শুধু দীঘল চোখ দুটি যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। মুখে তার বিবর্ণতা—আর উন্মুক্ত ঠোঁটেও।

লাভ্রেৎস্কীর বুকখানা করুণায়-ভালবাসায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। বুকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে টংকার উঠছে। তিনি ফিসফিস করে বললেন, তুমি লিখেছিলে, সব শেষ হয়ে গেছে। সত্যিই, শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে গেল।

লিজা অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, ওকথা ভুলে যান। আমাদের ওকথা ভুলে যেতে হবে। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আমি চিঠি লিখব ভাবছিলাম। এই-ই ভাল হোল। শুধু এই দুর্লভ মুহূর্ত ক'টিকে নিষ্ফল হতে যেন না দিই। দুজনেই দুজনের কর্তব্য করে যাব। ফিওদর ইভানিচ, আপনাকে স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

লিজা !

আমার অনুরোধ—ভিক্ষা ! এমন করেই জীবনের এই অপরিমেয় ক্ষতি আমরা পূরণ করতে পারি—যা ঘটে গেল তারপরে এ ছাড়া আর উপায় কি ! ভেবে দেখুন—বলুন—আপনি—আপনি আমাকে এ ভিক্ষা দেবেন !

লিজা—ভগবানের দোহাই পেড়ে বলছি—এ যে আমার পক্ষে অসম্ভব। এ দাবী তুমি কোরো না ! তুমি যা হুকুম দেবে আমি তাই করতে রাজি। কিন্তু তার সঙ্গে এখন বোঝাপড়া ? সে যে অসম্ভব-অসম্ভব !···সবকিছু সইতে আমি রাজি। সব কিছুই আমি সইব···ওকে আমি ক্ষমা করেছি, ভুলে গেছি, কিন্তু আমার হৃদয়কে তো আমি বাধ্য করতে পারি না···। না, না, এ যে নিষ্ঠুর আদেশ লিজা !

আপনি যা বলছেন···ঠিক তা করতে আমি বলছি না—বলতে আমি পারিও না। কিন্তু তবু ওর সঙ্গে একটা মিটমাট হোক। লিজা আবার মুখখানা হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। আপনার ঐ খুদে মেয়েটির কথা ভাবুন—আমার অনুরোধ—আমার জন্যে এটুকু আপনাকে করতেই হবে।

লাভ্রেৎস্কী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, বেশ তো, তাই হবে। আমি আমার কর্তব্য করব। কিন্তু তুমি—তুমি কি করবে—তোমার কি কর্তব্য ?

আমি তো জানি আমার কি কর্তব্য।

লাভ্রেৎস্কী চমকে উঠলেন।

তুমি নিশ্চয়ই ঐ পানসীনকে বিয়ে করবার কথা ভাবছ না ? তিনি দাবী করে বসলেন যেন।

শীর্ণ ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা। লিজার বিশীর্ণ মুখে তারই স্নিগ্ধ দীপ্তি।

না, না ! সে বললে।

লিজা, লিজা, লাভ্রেৎস্কী চীৎকার করে উঠলেন, আমরা কি সুখীই না হতে পারতাম—কি সুখীই না আমরা হতে পারতাম !

লিজা আবার তার দিকে তাকালো।

এখন তো বুঝতেই পারছেন, সুখ আমাদের উপর নির্ভর করে না। সুখ ভগবানের দান।

হাঁ, তাই তো তুমি…

অন্য ঘরে যাওয়ার দরজা খুলে গেল, মারফা টুপী হাতে এসে দেখা দিলেন :

পেয়ে গেছি টুপীটা, লাভ্রেৎস্কী আর লিজার মাঝখানে তিনি এসে দাঁড়ালেন। হয়তো, আমিই ভুলে বেজায়গা-মতো রেখে ছিলাম। বুড়ো বয়সের ঐ তো দোষ। কিন্তু ভেবে দেখলাম, যৌবনও এমন কিছু ভাল নয়। ফিওদর ইভানিচের দিকে ফিরে বললেন, তুমিও কি বৌয়ের সঙ্গে লাভ্রিকীতে যাচ্ছ নাকি?

লাভ্রিকীতে—ওর সঙ্গে? আমি? জানি না। তিনি একটু থেমে বললেন।

নীচে যাচ্ছ?

না, আজ আর নয়।

সে তুমি যা ভাল বোঝ। কিন্তু লিজা, তোমাকে তো এখন নীচে যেতে হয়। আ, আমার কপাল! এখনো পাখীটাকে খাওয়ানো হয় নি, এখনি আসছি…

মারফা টুপী মাথায় না দিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

লাভ্রেৎস্কী লিজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন দ্রুত পায়ে।

লিজা, তার স্বরে অনুনয়, আমরা চির বিদায় নিচ্ছি, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে—বিদায় মুহূর্তে তোমার হাতখানা একবার আমার হাতে দাও।

লিজা মাথা তুললো। ক্লান্ত স্তিমিত চোখ তুলে দেখলে। চোখে জলের ধারা বইছে।

না, অস্ফুট স্বর তার। বাড়ানো হাতখানা টেনে নিলে, না, লাভ্রেৎস্কী

(এই প্রথম সে নাম ধরে ডাকলে) আমার হাত আমি তোমার হাতের উপর রাখব না। কি হবে? আমার অনুরোধ, তুমি চলে যাও! জানি, তোমাকে আমি ভালবাসি—হাঁ, জানি…জোর করে যেন বলছে সে কথা—কিন্তু তবু না—না—না…

সে ঠোঁটের উপর চেপে ধরলে রুমালখানা।

আর কিছু না দাও, ঐ রুমালখানা অন্তত দাও।

দরজায় শব্দ…রুমালখানা খসে পড়লো লিজার কোলে। মেঝেয় পড়ে যাবার আগেই লাভ্রেৎস্কী নিয়ে পকেটে পুরলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন মারফা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

লিজা, বাছা, তোমার মা বোধহয় তোমাকে ডাকছেন, বৃদ্ধা বললেন।

লিজা তখুনি উঠে বেরিয়ে গেল।

মারফা এসে এক কোণে বসে পড়লেন।

. হঠাৎ মারফা ডাকলেন, ফিদিয়া!

কি বলছ?

তোমার কি মান-সম্ভ্রম আছে?

কি বলছ তুমি?

জিজ্ঞেস করছি—তোমার মান-সম্ভ্রম আছে কি না?

আশা তো করি, আছে।

তোমার যে মান-সম্ভ্রম আছে, একথা হলফ করে বল!

বেশ তো! এ সব কথা হঠাৎ উঠলো কেন?

আমি সব জানি। আর তুমিও বাছা বোকা নও, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে কি বলছি। বাছা এবার যাও। আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, এ জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! আর মনে থাকে যেন তুমি কথা দিয়েছ। ফিদিয়া এস, চুমু খাও! জানি বাছা, এ আঘাত বড় সাংঘাতিক, কিন্তু সবার জীবনেই তো এমনি দুর্দিন আসে। আমি একসময় মাছিগুলোকে

হিংসে করতাম—ভাবতাম ওরাই জীবনটা উপভোগ করছে। তারপর একদিন রাতে শুনলাম একটা মাছির ভনভনানি! মাকড়সার জালে পড়েছে। তখন ভাবলাম, তাহলে ওদেরও বিপদ আছে। উপায় তো নেই ফিদিয়া! কিন্তু তোমার কথা ঠিক থাকে যেন! ভুলে যেও না! যাও, এখন বিদেয় হও!

লাভ্রেৎস্কী পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফটকের দিকে চললেন। একজন পরিচারক ছুটে এল তার কাছে।

সে লাভ্রেৎস্কীকে বললে, মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না আপনাকে ডাকছেন। তাঁকে বল গিয়ে, এখন—ফিওদর বলতে গেলেন।

পরিচারক বললে, কর্ত্রী বলছেন, খুব জরুরী কথা আছে। তিনি বলতে বলেছেন, তিনি এখন একেবারে একা আছেন।

অতিথিরা চলে গেছেন? লাভ্রেৎস্কী জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁ, হুজুর!

লাভ্রেৎস্কী ঘাড় নেড়ে তার পিছনে পিছনে চললেন।

বিয়াল্লিশ

মারিয়া একা বসে আছেন আরাম কেদারায় তার ঘরে, অ-দ্য কলোঁ শুঁকছেন। তাঁর সামনে ছোট টেবিলটায় এক গেলাস কমলা ফুলের জল। তিনি উত্তেজিত, একটু বা সশঙ্কিত।

লাভ্রেৎস্কী এসে ঢুকলেন।

তিনি অভিবাদন করে উদাস স্বরে বললেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ?

হাঁ, মারিয়া গেলাসে চুমুক দিয়ে উত্তর দিলেন, শুনলাম, তুমি এসেই মারফা দিমোফিয়েভ্‌নার ঘরে চলে গেছ। আমি তাই বলে রেখেছিলাম—

তোমাকে যেন ডেকে নিয়ে আসে। তোমার সঙ্গে কথা ছিল। বোসো! মারিয়া নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, তুমি তো জানো, তোমার স্ত্রী এসেছেন।

জানি!

বেশ, সেই কথাই বলছি। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, ওকে আমি অভ্যর্থনা করেও ঘরে এনে বসালাম। সেই কথাই বলব বলে তোমাকে ডেকেছি ফিওদর ইভানিচ। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে, পৃথিবীতে উচিত ছাড়া অনুচিত কাজ আমাকে দিয়ে কেউ কখনো করাতে পারবে না। যদিও আমার মনে হয়েছে, এতে তুমি চটেই যাবে। কিন্তু ওকে দেখে রাজি না হয়ে পারলাম না ফিওদর। হাজার হলেও আত্মীয় তো—অবশ্য তোমার সম্পর্কেই ওর সম্পর্ক। এখন ভাবতো একবার আমার অবস্থা। ওর—ওর মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেব—এ অধিকার তো আমার নেই—কি ঠিক বলি নি?

তোমার তো এ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হবার কোন কারণ ঘটেনি, লাভ্রেৎস্কী উত্তর দিলেন, তুমি ঠিকই করেছ; আমি একটুও রাগ করি নি। বারবারা তার পরিচিতদের সঙ্গে মিশবেন, তাতে আমার বাধা দেবার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই। অধিকারও নেই। আজ আমি এসেই বসবার ঘরে ঢুকিনি—তার কারণ ছিল, ওর সঙ্গে এখানে দেখা হয়, তা আমি চাই না। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ফিওদর ইভানিচ, তোমার কথায় কি যে খুশি হলাম কি বলব! তবু আমি তোমার মন তো জানি, তাই এমনি কথাই আশা করেছিলাম। তোমার মত অমন উদার মন ক'জনের আছে! আর আমার উদ্‌বেগের কথা বলছ—এতে তো অবাক হবার কিছু নেই। আমিও তো নারী, আমিও তো মা। আর তোমার স্ত্রী তো—অবশ্য আমি তোমাদের বিচারক হয়ে বসতে চাই না—আমি নিজেও তাকে একথা বলেছি;

মেয়েটা ভারি নম্র, সত্যিই মিশুক মেয়ে। ওকে কি কেউ ভাল না বেসে পারে।

লাভ্রেৎস্কী হাসলেন, হাসিতে বিদ্রূপ মেশানো। টুপীটা নিয়ে লোফালুফি করছেন।

ফিওদর ইভানিচ, মারিয়া তার কাছে এসে বলতে লাগলেন, এই কথাই আমি বলতে চাই। যদি দেখতে সে কেমন নম্র ব্যবহার করলে, কেমন নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখলে! সত্যিই বড় বুকে বাজে! যদি শুনতে সে তোমার সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বললে! ও বললে, আমারই সব দোষ; আমি ওঁকে চিনতে পারি নি, উনি তো মানুষ নন, দেবদূত! হাঁ, ঐ কথাই সে বলেছে—তুমি দেবদূত—মানুষ নও। এত কুণ্ঠিত, এত অনুতপ্ত···সত্যি, আমি জীবনে এমন দেখিনি!

আমার কৌতূহল ক্ষমা কোরো, লাভ্রেৎস্কী বলে উঠলেন, শুনলাম, বারবারা নাকি এখানে গানও গেয়েছেন—কুণ্ঠা আর অনুতাপ নিয়ে কি গান গাওয়া চলে?

ছিঃ অমন কথা বোলো না! শুধু আমাকে খুশি করবার জন্যেই ও গান গেয়েছে, পিয়ানো বাজিয়েছে। আমার অনুরোধেই করেছে, একরকম হুকুমও বলতে পার। এত দুঃখ ওর—মুখে তো তারই ছাপ। আহা কী দুঃখী মেয়ে! আমি ওর মুখ দেখেই ভাবলাম, ওকে কি করে একটু আনন্দ দেব! তারপর শুনলাম ওর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা! আমি তোমাকে হলফ করে বলতে পারি, দুঃখ ওকে দলে-পিষে দিয়ে গেছে। তারই ছাপ ওর মুখে। সার্জি পেত্রোভিচকেও তুমি ইচ্ছে করলে একথা জিজ্ঞেস করতে পার—ওর বুক ভেঙে গেছে—চুরমার হয়ে গেছে।

লাভ্রেৎস্কী কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন।

আর এডাই বা কি সুন্দর! দেবশিশু যেন। কি মিষ্টি মেয়ে, কি বুদ্ধি! চমৎকার ফরাসী বলে; রুশ ভাষা বোঝে—আমাকে পিসী বলে

ডাকলে। ওর বয়েসের মেয়েরা যেমন লাজুক হয়, ও তো তা নয়—মোটেই লাজুক নয়। আর তোমার সঙ্গে কি মিল ফিওদর! দেখে অবাক লাগে। চোখ,...ভ্রূ...ঠিক যেন তোমার ছবিটি! আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব একটা ভালবাসিনে...কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার খুদে মেয়েকে আমি আমার মন বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি।

লাভ্রেৎস্কী চেঁচিয়ে উঠলেন, মারিয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—আমাকে এসব কথা বলে লাভ কি?

লাভ!—আমার লাভ? মারিয়া অ-দ্য কঁলো শুঁকলেন, গেলাসে আবার চুমুক দিলেন। দেখ ফিওদর, তোমাকে এসব কথা বলছি তার কারণ·· আমি তোমার আত্মীয়...তোমার উপরে আমার একটু মায়াও আছে। জানি, তোমার মনটি সাদা। শোন, ভাই শোন, আর যাই হোক, মেয়ে হয়েও বহু অভিজ্ঞতা আমার আছে। যা তা বলি না। ওকে তুমি ক্ষমা কর, তোমার স্ত্রীকে তুমি ক্ষমা কর। মারিয়ার চোখ হঠাৎ জলে ভরে গেল। কানায় কানায় জল।

ওর যৌবন, ওর অনভিজ্ঞতার কথা একবার ভাব...হয়তো ও তেমন মা পায়নি যিনি ওকে ঠিক পথে চলবার নির্দেশ দিতেন। হয়তো ও পাঁচজনের চোখে খারাপ বলেই পরিচিত। কিন্তু ওকে ক্ষমা করতে হবে। ওর শাস্তি তো কম হয় নি।

মারিয়ার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল; তিনি মুছে ফেলছেন না, কাঁদতে তিনি ভালবাসেন। লাভ্রেৎস্কী অস্থির, যেন কাঁটার উপর বসে আছেন। হাঁ ঈশ্বর, তিনি ভাবছেন, একি করলে—কেন এত ব্যথা দিলে! উঃ কি দিনটাই গেল আজ!

মারিয়া আবার শুরু করলেন, উত্তর দিচ্ছ না যে? এতে আমি কি ভাববো? এত নিঠুর তুমি হতে পারবে? না, বিশ্বাস হয় না। আমার তো মনে হয়, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হয়েছে। তোমার এই দয়ার জন্যে

ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। আমার কাছ থেকে এবার তোমার স্ত্রীকে দান হিসাবে গ্রহণ কর ফিওদর!...

লাভ্রেৎস্কী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ; মারিয়াও উঠে পড়লেন। তারপর তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। সেখান থেকে হাত ধরে বারবারাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। ম্লানমুখী, নির্জীব বারবারা, চোখ নীচু করে আছে। তার নিজের বুঝি কোনো ইচ্ছা নেই, নেই সত্তা—সে যেন নিজেকে সমর্পণ করেছে মারিয়ার কাছে ।

লাভ্রেৎস্কী সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তুমি এতক্ষণ এখানে ছিলে?

ওর দোষ নেই, মারিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, ও কিছুতেই থাকতে চায় নি, আমি ওকে ধরে রেখেছি। পর্দার আড়ালে আমিই ওকে বসিয়ে রেখেছিলাম, ও বারবার বলেছে, এতে তুমি আরো চটে যাবে। আমি কিন্তু ওর কথা শুনি নি; ওর থেকে তোমাকে আমি ভাল করে চিনি। এস, আমার কাছ থেকে এ দান গ্রহণ কর, আমি হাত হাতে মিলিয়ে দিই। এস ভারিয়া, ভয় পেও না, নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বস (ওর হাত ধরে টানছেন মারিয়া) আমার আশীর্বাদ নাও তোমরা...

লাভ্রেৎস্কী বাধা দিলেন। তার স্বর মৃদু অথচ ভয়ংকর! মারিয়া, একটু অপেক্ষা কর! আমি জানি, তুমি নাটক করতে ভালবাস (লাভ্রেৎস্কী ভুল করেন নি, মারিয়া এখনো ইস্কুলের মেয়ের মতো মাঝে মাঝে নাটকীয় মুহূর্ত আমদানী করতে চান জীবনে। এ আবেগ তাঁর আছে)। নাটক দেখে তুমি আনন্দ পেতে পার, কিন্তু অন্যের পক্ষে সে হয়তো দুঃখের ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াবে। যাক, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনা, কেননা, তুমি এখানে নায়িকা নও। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যতটা সম্ভব ছিল, ততটা কি আমি তোমার জন্যে করি নি? একথা বোলো না, যে, এই যে নাটক করলে, এতে তোমার হাত নেই, এ ষড়যন্ত্রে

তুমি নেই! তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না একথা তো জান। তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। তাহলে কি চাও তুমি? তুমি চতুর—কোন অভিসন্ধি ছাড়া কিছু কর না! তোমার বোঝা উচিত, আগে যে জীবন একসঙ্গে আমরা কাটিয়েছি, আজ সে জীবনের প্রশ্নই ওঠে না। না—রাগ করিনি, আগে যে মানুষকে দেখেছ—সে মানুষ আর আমি নেই। তুমি যেদিন ফিরে এলে, সেদিনই তো সেকথা বলেছি। আর তুমিও মনে মনে তা জান। কিন্তু তুমি পৃথিবীর চোখে আবার আগের সেই মর্যাদা চাও। সমাজে তুমি আবার প্রতিষ্ঠা দাবী করতে চাইছ। শুধু আমার বাড়িতে থেকে তাই তুমি খুশি হতে পারছ না, একসঙ্গে থাকতে চাইছ—কি, আমি ঠিক বলি নি?

বারবারা চোখ না তুলে বললে, আমি চাই—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মারিয়া বললেন, ও তোমার কাছে ক্ষমা চায়। আর কিছু নয়।

আমার জন্যে নয়, এডার জন্যে, বারবারা ফিসফিসিয়ে বললে।

মারিয়া প্রতিধ্বনি করে উঠলেন, ওর জন্যে নয়, এডার জন্যে তোমার কাছে ও ক্ষমা চায়। অতি কষ্টে যেন মুখ দিয়ে কথা বেরুল।

বেশ তো! শুধু কি এই তোমার প্রার্থনা? লাভ্রেৎস্কী বলে উঠলেন, আমি ক্ষমা করলাম।

বারবরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছুঁড়ে মারলো, মারিয়া সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি! বারবারার হাত ধরে টেনে এনে বললেন, ওকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম…

লাভ্রেৎস্কী বাধা দিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও, আমি ক'টা কথা বলতে চাই। বারবারা, আমি তোমার সঙ্গে থাকতে রাজি, আমি তোমাকে লাভ্রিকীতে ও নিয়ে যাব, যতদিন থাকতে পারি থাকব। চলে গেলেও মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যাব। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই না—কিন্তু এর বেশী আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা কোরো

না। আমার বোন যা বলছেন, তাঁর কথা মেনে নিয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে তুমি নিজেই হাসবে। তোমাকে আবার ঘর বাঁধবার ভরসা দিলে মনে মনে বিদ্রূপই করবে। না, তা আর হয় না। যা ছিল, তা আর ফিরে আসবে না। কাটা গাছে ফুল আর ফোটেনা। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নিয়তির কাছে তবু মাথা নোয়াতে হয়। তাইত দেখছি। আমি যে ভাবে বলছি, যে কথা বলছি, সেভাবে তুমি তার মানে বুঝবে না। যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার সঙ্গে আমি থাকব— না, সে কথা দিতে পারছি না—তবে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেল। তোমাকে আবার স্ত্রী বলে আমি গ্রহণ করব। না, শুধু গ্রহণ করা নয়, স্ত্রী বলে তুমি সামাজিক মর্যাদা পাবে।

মারিয়ার চোখের জল এরই মধ্যে শুকিয়ে এসেছে, তিনি বললেন, ফিওদর ইভানিচ, অন্তত ওর হাতখানা হাতে তুলে নাও! আমার কথা রাখ ভাই।

লাভ্রেৎস্কী কড়া জবাব দিলেন, বারবারাকে আমি এখন পর্যন্ত ঠকাই নি। ও আমার কথার দাম দেবে। লাভ্রিকীতে ওকে আমি নিয়ে যাব। কিন্তু বারবারা মনে রেখ, যে মুহূর্তে তুমি লাভ্রিকী ছেড়ে যাবে, এ ব্যবস্থা সেই মুহূর্তেই বাতিল হয়ে যাবে। এই আমার শর্ত, এবার আমি বিদায় হই।

তিনি দুজনকে অভিবাদন জানিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন, ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না?

বারবারা মারিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। ফিসফিসিয়ে সে বললে, উনি চলে যান না…

মারিয়া উপভোগ করছেন কৃতজ্ঞতায় গলে যাওয়া সোহাগ আর কথা। তবু খুশি হতে পারছেন না। লাভ্রেৎস্কী আর বারবারার উপর তিনি কেন যেন চটে গেলেন। এমনকি নিজের এই এই পরিকল্পিত

দৃশ্যটিও তার আর ভাল লাগলো না। যেমনটি আশা করেছিলেন, তেমনটি হল নি। তিনি ভেবেছিলেন, বারবারা স্বামীর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে।

তুমি কি আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারনি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কতবার না ইসারা করলাম, লুটিয়ে পড়! পায়ের উপর লুটিয়ে পড়!

হাঁ তাহলে তো ভালই হোত! কিন্তু আপনি ভাববেন না। ব্যাপারটা তো ভালোভাবেই উতরে গেল।

মারিয়া বললেন, ঠিকই বাছা, ওর মন যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। আর তুমিও তো বাছা কাঁদলে না, আর আমি ওর কাছে কেঁদে কেঁদে সারা হলাম। ও বুঝি তোমাকে লাভ্রিকীতে আটকে রাখতে চায়। তার মানে কি এই, তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবে না? পুরুষগুলোই এমনি পাষাণ,…

তিনি মাথা নেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথাটা শেষ করলেন।

লাভ্রেৎস্কী বাড়ি ফিরে সর্দার খানসামার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় শুয়ে পড়লেন। এমনি ভাবেই ভোর অবধি সময় কেটে গেল।

তেতাল্লিশ

পরদিন রবিবার। সকালের প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে গেল, লাভ্রেৎস্কীকে সে জাগালে না। তিনি জেগেই ছিলেন। সারা রাত চোখের পাতা তিনি এক করতে পারেনি—তবু ঘণ্টার শব্দ নিয়ে এল আর এক রবিবারের স্মৃতি। লিজার অনুরোধে সেদিন তিনি গীর্জায় গিয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তার মন বললে, আজও ওখানে তার

সঙ্গে দেখা হবে। আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। বারবারা তখনো ঘুমে। তাকে বলতে বললেন, খাবার সময় তিনি ফিরবেন। ঘণ্টা একঘেয়ে সুরে বেজে চলেছে, কিন্তু সে যেন তাকে প্রলুব্ধ করছে, টেনে নিয়ে চলেছে। একটু আগেই তিনি এসে পড়লেন; গীর্জায় তেমন ভিড় এখনো হয় নি। মন্ত্র উচ্চারণ করছেন পাদ্রি—তার গুণগুণানি মাঝে মাঝে কাসির দমকে থেমে যাচ্ছে, আবার তালে তালে উঠছে পড়ছে। তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। একে একে আসছে লোক। থামছে, ক্রুশ চিহ্ন বুকে আঁকছে, চারদিকে নুয়ে নুয়ে প্রণাম করছে। তাদের পায়ের শান্ত শব্দ শূন্য গীর্জায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, উঁচু ছাদে প্রতিধ্বনি তুলছে। একটি বৃদ্ধা, ছেঁড়া জোব্বায় তার সারা দেহ ঢাকা। লাভ্রেৎস্কীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে। তার দন্তহীন শীর্ণ মুখে পবিত্র ধর্মোন্মাদনা; লাল চোখ দুটি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আইকনের দিকে। মাঝে মাঝেই জোব্বার ভিতর থেকে বিশীর্ণ হাতখানি বার করে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে। নুয়ে পড়ে প্রণাম করছে, আর মাথা নাড়ছে। দুঃখের ঘন ছায়া তার মুখে। এবার এল একজন চাষী। দাড়ির জঙ্গলে মুখখানা তার ভয়ংকর। সেও হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করছে। তার মুখেও গভীর দুঃখের ছাপ। লাভ্রেৎস্কীর তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হোল, কি তার দুঃখ? তিনি এক সময়ে জিজ্ঞেসও করে বসলেন। চাষীটি চমকে গিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল।··· আমার ছেলে মারা গেছে, এই বলে সে আবার প্রার্থনা করতে লাগলো ···লাভ্রেৎস্কী ভাবতে লাগলেন, এই যে এরা—এরা গীর্জায় যে সান্ত্বনা পায়, এর বদলে কি ওদের দেওয়া যায়? না, এর বদলি কিছু নেই। তিনি নিজেও প্রার্থনায় যোগ দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বুকে পাষাণের ভার, তিক্ততা, মন বিমুখ। লিজার জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু লিজা তো এল না। প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে, শেষ প্রার্থনার ঘণ্টা

পড়লো। তিনি অন্য জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ লিজাকে দেখতে পেলেন। সে এসেছে অনেকক্ষণ, তিনি দেখতে পাননি। সেও কোনোদিকে তাকায় নি। দেয়াল আর গায়ক-গায়িকাদের মাঝখানে সে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। লাভ্রেৎস্কী চোখ ফেরাতে পারলেন না। শেষ বিদায়ের মুহূর্তে এ যে দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টি। এবার ভিড় কমে যাচ্ছে, কিন্তু লিজা এখনো দেরী করছে। হয় তো লাভ্রেৎস্কীর চলে যাবার অপেক্ষায় আছে। শেষবারের মতো ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে বেরিয়ে এল। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না। মুখ নিচু করে চলেছে। তার সঙ্গে একজন পরিচারিকা। তিনি তার পিছনে পিছনে পথে এসে তাকে ধরলেন। মুখ তার ওড়নায় ঢাকা।

—এলিজাবেথা মিখাইলেভনা, তিনি কাছে এসে সহজভাবে বললেন, কিন্তু স্বাভাবিকতা নেই স্বরে, জোর করে আনা সহজ ভাব আছে। তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি কি ?

লিজা নিরুত্তর। তিনি ওর পাশে পাশে চললেন।

তিনি স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি খুশী হয়েছ তো ? কাল কি হয়েছে শুনেছ ?

সে ফিসফিস করে বললে, জানি। ভালই তো হয়েছে।

সে জোরে হাঁটতে লাগলো।

তুমি খুশী হয়েছ তো ?

লিজা মাথা নাড়লো,

ফিওদর ইভানিচ, লিজার স্বরে কম্পন নেই, তবু যেন কেমন ক্ষীণ, তোমাকে আমি বলছি, তুমি আর দেখা করতে এস না। চলে যাও··· পরে দেখা হবে—হয়তো একবছর পরে! কিন্তু এখন নয়—দোহাই তোমার—আর এস না—এ আমার মিনতি—প্রার্থনা।

লিজা, তোমার কথা আমি রাখব। কিন্তু এমনি করেই কি আমরা

শেষ বিদায় নেব লিজা? আমাকে কি কিছুই তোমার বলবার নেই?…

ফিওদর ইভানিচ, তুমি আছ আমার পাশে, সঙ্গে সঙ্গে পথ চলছ; অথচ দূরে—কত দূরে তুমি চলে গেছ। শুধু তুমিই নও…

বল, বল—আমার অনুরোধ—ভিক্ষা—তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, কি বলছ বল?

শুনবে, পরে শুনবে। কিন্তু যা-ই-ই হোক, আমাকে ভুলে যেও। না…না…আমাকে ভুলোনা ফিওদর, মনে রেখো…শুধু মনে রেখো।

তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি?…

এইটুকুই তো আমার যথেষ্ট। বিদায়! আমার পিছু পিছু এস না!

লিজা!…

বিদায়, বিদায়! ওড়নায় মুখখানা তার আবার ঢেকে গেছে, সে ছুটে চলেছে।

তিনি বিলীয়মানা লিজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এবার ফিরে চলেছেন। নুয়ে পড়েছে মাথা। লেমের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তিনিও চোখের উপর টুপী নামিয়ে দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলছিলেন।

দুজনে দুজনের দিকে নিঃশব্দে তাকালেন।

কি খবর আপনার? লাভ্রেৎস্কী এবার বলে উঠলেন।

কি আবার খবর? লেমের-স্বর গম্ভীর, কিছু না, সব তো মরে গেছে, আমরা তো মরা মানুষ। আপনি ডান দিকে যাবেন বুঝি?

হাঁ!

আমি বাঁ দিকে যাব। বিদায়!

পরদিন স্ত্রীকে নিয়ে লাভ্রিকী রওনা হলেন লাভ্রেৎস্কী। আগে আগে গাড়িতে চললো এডা আর জাস্তাঁকে নিয়ে বারবারা; পিছনে টমটমে তিনি। এডা জানালা দিয়ে সারাপথ তাকিয়ে রইল। সবকিছু তার

কাছে আশ্চর্য ঠেকছে···ঐ চাষী, কুড়েঘর, কূপ, ঘোড়ার কাঁধের জোয়াল, পাখীর দল—সবকিছু। জাস্তাঁও অবাক। বারবারা তাদের মন্তব্য শুনে হাসছে। মনটা তার ভাল আছে। রওনা হবার আগে স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

সে তাকে বলেছে, তোমার অবস্থা আমি বুঝি। কিন্তু আমি ঘর করবার পক্ষে সোজা লোক—আমি তোমাকে কোনো কিছুতেই বাধা দেব না। আমি চাই আমার এডার ভবিষ্যৎ জীবন যাতে নিরাপদ হয়। আর কিছু নয়!

ফিওদর ইভানিচ মন্তব্য করেছিলেন, তোমার নিজের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তো?

আমার আর কোনো সাধ নেই—আমার শুধু স্বপ্ন নিরালা নিজেকে ভাসিয়ে দেব। মুখ গুঁজে পড়ে থাকব। তোমার মহানুভবতার কথা আমার মনে থাকবে!···

ওকথা রাখ!···তিনি বাধা দিলেন।

তোমার স্বাধীন ইচ্ছা, তোমার শান্তির পথে আমি বাধা হব না—আগে থেকে কথা সে সাজিয়ে রেখেছিল, এবার সে শেষ করলে তার কথা।

লাভ্রেৎস্কী মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানালেন, বারবারা বুঝলো, স্বামী মনে মনে তার কাছে কৃতজ্ঞ।

পরদিন সন্ধ্যায় তারা-এসে পৌছলেন লাভ্রিকীতে। এক সপ্তাহ পরে লাভ্রেৎস্কী পাঁচ হাজার রুবল স্ত্রীকে হাত-খরচ দিয়ে মস্কৌ চলে গেলেন। তার যাওয়ার পরের দিনই এল পানসীন। বারবারা তাকে বলেছিল, তার নির্জনতায় সে যেন তাকে না ভুলে যায়। বারবারা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলে। দীর্ঘ রাত-ধরে বসবার ঘর আর বাগান গান-বাজনায় আর ফরাসী কথায় মুখর হয়ে উঠলো। তিনদিন রইলো পানসীন,

বিদায়ের সময় বারবারার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে আবার শীগ্গীরই আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে। আর প্রতিশ্রুতি সে রাখলোও।

চুয়াল্লিশ

লিজার ছোট্ট ঘরখানি তেতলায়। হাওয়া খেলে এমনি ঘর। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। একটি শুভ্রশয্যা, এক কোণে ফুলের টব। জানালার কাছে একটা ছোট্ট টেবিল, একটা বইয়ের তাক, দেয়ালে ঝুলছে একখানা ক্রুশ। লিজা এই ঘরেই জন্মেছে। এই ঘরেই কেটেছে তার ছোটবেলা।

গীর্জা থেকে ফিরে এসে সে বেশ ভাল করে ঘরখানা পরিষ্কার করলে, ধূলো ঝাড়লে। পুরানো বন্ধুদের চিঠি পড়ে ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখলে। এবার টানা বন্ধ করে দিলে, টবে দিলে জল। ফুলগুলোয় আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। নিঃশব্দে সব কিছু করছে; আবিষ্ট তার মন। এবার ঘরের মাঝখানে এল, চারদিকে তাকাচ্ছে। দেয়ালে ঝোলানো ক্রুশখানার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। চুপ করে বসেই রইল। হাতের উপর নুয়ে পড়েছে মাথা। স্তব্ধ লিজা।

মারফা এসে তাকে এমনিভাবে দেখলেন। লিজা তাঁকে দেখতে পায় নি। তিনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন। এবার কেসে উঠলেন জোরে। লিজা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চোখ মুছলো। ঝরে পড়েনি এমনি বিন্দু বিন্দু জল টল টল করছে চোখে।

একটা গোলাপ চারার উপর নুয়ে পড়ে মারফা বললেন, ঘর সাফ করছ দেখছি! আহা, গোলাপটির কি মিঠে গন্ধ!

লিজা তাকিয়ে আছে, বেদনার্ত তার দৃষ্টি।

কি যেন বলছিলে? সে ফিসফিস করে বললে।



কি আবার বললাম, বৃদ্ধা বললেন। কি বলছ বাছা? তিনি টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লিজার ছোট্ট বিছানায় বসে পড়লেন, এ যে ভয়ানক ব্যাপার মেয়ে! আমি যে আর সইতে পারছি না! চার চারটে দিন কত যে উদ্বেগে কেটেছে! আমি তো আর ভান করে বলতে পারিনা যে, কিছু দেখি নি। কেঁদে কেঁদে মুখে তোর কালি পড়বে, শুকিয়ে যাবে—এতো আর আমি সইতে পারি না! না, না—না বাছা!

লিজা বললে, কি হোল তোমার দিদা? আমি তো ভালই আছি।

এর নাম ভাল থাকা! মারফা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওকথা অন্যকে বলিস বাছা, আমাকে নয়। ভাল আছিস? তাহলে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলি কেন? কার চোখের পাতা এখনো ভিজে? বেশ তো, নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ্ না—কি ছিরি হয়েছে চেহারার—মুখ আর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ? ভাল আছিসই বটে! আমি কি জানি না নাকি লো?

দিদা, এ তো আর চিরদিন থাকবে না, চলে যাবে।

চলে যাবে—কিন্তু কখন লো? হা ভগবান! তুই ওকে এত ভাল বেসেছিলি! ও তো বুড়ো। হাঁ, লোক ভাল, আঁচড়-কামড় দেয় না; কিন্তু তাতে কি? আমরা সবাই-ই তো ভাল। ওরকম লোক এই পৃথিবীতে কত আছে।

বলেছি তো, এ দুঃখ চলে যাবে। এখুনি তো চলে গেছে।

লিজা বাছা, আমার কথা শোন্, মারফা তাকে পাশে এনে বসিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এখন মনে হচ্ছে, এ দুঃখে সান্ত্বনা নেই। কিন্তু আছে, আছে! বাছা, মৃত্যুরই শুধু কোন দাওয়াই নেই! শুধু বল্, আমি ভয় পাব না, ভেঙে পড়ব না! তাহলেই অবাক হয়ে দেখবি, মনের ভার নেমে গেছে। শুধু মুখটা একটু খিঁচিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে সয়ে যা!

লিজা উত্তর দিলে, দিদা, মনের ভার তো আর নেই।

নেই—নেই! চেয়ে দেখ্‌না, তোর নাকটা কেমন লাল! যেন কেউ এই মাত্র চিমটি কেটেছে। আর তুই বলছিস, মনের ভার নেমে গেছে! বেশ কথা বাছা!

হাঁ, নেমে গেছে। শুধু তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও দিদা। হঠাৎ উদ্বেল হয়ে মারফার গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরলো লিজা, শুধু তুমি আমার বন্ধু হও! কেউ তো নেই আমার। আমাকে তুমি সাহায্য কর! রাগ কোরো না, আমার মন বুঝতে চেষ্টা কর…

কি তোমার মনের কথা বাছা? আমাকে অমনি করে ভয় পাইয়ে দিও না। তাহলে চেঁচিয়ে উঠব। অমন করে তাকিয়ো না। বল, কি তোমার মনের কথা?

আমি—আমি চাই—লিজা মারফার বুকে মুখ লুকালো। আমি কোনো মঠে গিয়ে থাকতে চাই, সে ফিসফিসিয়ে বললে।

মারফা বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়েই উঠলেন।

কি বলছ বাছা! কি কথা এসব! তিনি অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না, তারপর বললেন, বাছা একটু ঘুমিয়ে নাও। ক'রাত তো ঘুম হয়নি, তাই এসব ভাবছ…

লিজা মুখ তুলে তাকালো; মুখে তার দীপ্তি।

না দিদা, অমন কথা বোলো না। আমি মনস্থির করেছি, প্রার্থনা করেছি, ভগবানকে ডেকেছি। আর তো আমার সংশয় নেই। শেষ হয়ে গেছে, তোমাদের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। এই যে শিক্ষা পেলাম, এতো শুধু শুধু পাই নি। আর এই তো প্রথম নয়, অনেকদিন থেকেই ভাবছি। সুখ এল না জীবনে। যখন সুখের কথা ভাবছিলাম, তখনো মনে আশঙ্কা ছিল। আমার নিজের পাপের কথা জানি, বাবা কি করে টাকা করেছেন তাও জানি। সব জানি। শুধু প্রার্থনাই

এসব মুছে দিতে পারে, শুধু প্রার্থনা। তোমার জন্যে আমার দুঃখ, মা আর লেনোচ্‌কার জন্যেও দুঃখ ; কিন্তু উপায় কি। জানি, এ জীবন তো আমার জন্যে নয় ; সবার কাছে বিদায় নিয়েছি, সব কিছুর কাছে আজ আমার বিদায়। ডাক এসেছে, সেই আদেশ পালন করতে ছুটেছি। বুকখানা ব্যথায় ভরে গেছে, তাই তো নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চাই। মঠের ভিতর বন্ধ হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাই। আমাকে বাধা দিয়ো না, সাহায্য কর! তা না হলে তো একাই চলে যাব। তাই যেতে হবে।

মারফা ভীত হয়ে শুনলেন তার কথা।

ভাবলেন, এখনো ভুল বকছে। ডাক্তার ডাকতে হবে। কিন্তু কাকে ডাকব? গিদিয়োনোভ্‌স্কী সেদিন একজনের প্রশংসা করছিল, কিন্তু সে তো ডাহা মিথ্যুক—হয়তো বা সত্যি কথাই বলছিল? কিন্তু যখন দেখলেন, লিজা তার প্রতি কথায় একই উত্তর দিচ্ছে, তিনি বুঝলেন, তার অসুখ হয় নি, ভুল সে বকছে না। মারফা এবার ভারি ভয় পেলেন। কিন্তু বাছা, তুমি কি বুঝতে পারছ না—এবার তর্ক জুড়ে দিলেন, মঠের জীবন সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। ওরা ভয়ানক খারাপ তেলের রান্না খাওয়াবে, পরতে দেবে মোটা অন্তর্বাস—ঠাণ্ডায় বাইরে পাঠাবে। বাছা লিজা, তুই তো বাঁচবি না! এ নিশ্চয়ই আগাফিয়ার কাজ—ওই তোকে এই বুদ্ধি দিয়েছে! আরে ওতো প্রথম জীবনের সবটুকু ভোগ করে নিয়ে তারপর গেছে। তুইও আগে জীবনটা ভোগ কর্। তা না হয়তো, আমাকে শান্তিতে মরতে দে, তারপর যা খুশি করিস। একটা ছাগুলে দাড়িওয়ালা লোকের জন্যে কে কবে মঠে চলে গেছে শুনেছিস—একটা পুরুষের জন্যে এ কাজ করবি? যদি মন খারাপ হয়ে থাকে, তীর্থে চলে যা, সন্তদের কারো কাছে প্রার্থনা কর্, পূজো দে, তাই বলে মাথায় কালো টুপী চাপাবি, কালো আঙ্‌রাখা পরবি! না, বাছা না! আমার মনি, আমার বাছা···

মারফা কেঁদে ফেললেন।

লিজা সান্ত্বনা দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলো। নিজেও কাঁদলো। কিন্তু তার মন টলায় কার সাধ্য! নিরাশ হয়ে এবার মাকে বলে দেবেন বলে শাসাতে লাগলেন মারফা। কিন্তু সবই বৃথা হোল। লিজা বৃদ্ধার অনুরোধে ছ'মাসের জন্য যাওয়া স্থগিত রাখলো। সর্ত রইল, যদি ওর মন না বদলায়, তিনি মারিয়ার সম্মতি আদায় করে দেবেন।

বারবারা নিরালায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে এলো। টাকা যোগাড় করে সেখানে সুন্দর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলে। পানসীনই তার বাড়ি খুঁজে দিলে। বারবারা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসবার আগে সে ও-শহরে ছেড়ে চলে এসেছিল। ও-শহরে শেষের দিকে মারিয়ার স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন সে লাভ্রিকীতে কায়েম হয়ে বসেছে। বারবারা তো তাকে বলতে গেলে দাস বানিয়েই রাখলে। অন্য কোনো কথায় তো পানসীনের উপর তার সেই অসীম ক্ষমতার বর্ণনা করা যায় না।

লাভ্রেৎস্কী শীত কাটালেন মস্কোতে। পরে বসন্তে খবর পেলেন, লিজা রাশিয়ার দূর প্রান্তে বি-মঠের অধিবাসিনী হয়েছে।

উপসংহার

আট বছর চলে গেছে তারপর। আবার এসেছে বসন্ত···কিন্তু তার আগে মিখালেভিচ, পানসীন আর মাদাম লাভ্রেৎস্কায়ার কথা বলে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে নিই। মিখালেভিচ ভাগ্যের বহু ওঠা-নামার পরে নিজের আসল কাজ খুঁজে পেয়েছে। সে এখন এক সরকারী ইস্কুলে সহকারী শিক্ষক। নিজের ভাগ্য নিয়ে সে সন্তুষ্ট, তার ছাত্রেরা তাকে পূজা করে; আড়ালে ঠাট্টাও করে। পানসীন সরকারী পদোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এখন একটা বিভাগের অধ্যক্ষ পদের দিকে তাগ্ করে আছে। একটু কুঁজিয়ে চলে, হয়তো গলায় যে ভ্লাদিমির সম্মান-চিহ্ন জুটেছে তারই ভারে নুয়ে পড়েছে। তার ভিতরের উপরওয়ালা কর্মচারীটি শিল্পীকে দাবিয়ে দিয়েছে। এখনো মুখখানা কচি, কিন্তু একটু কেমন ম্লান হযে গেছে; চুলও পাতলা। এখন আর সে গান গায় না, রেখাচিত্র আঁকে না, কিন্তু গোপনে সাহিত্য-চর্চা করে। একখানা হাসির নাটক লিখেছে। আজকাল লেখকরা যেমন সবাই কোনো না কোনো পরিচিত মানুষকে নাটকে আঁকেন, সেও তাই করেছে। তার নাটকে একটি ছলনাময়ী নারীর চরিত্র আছে। সে নাটকখানা তাঁর ভক্ত দু-তিনটি মহিলাকে পড়েও শুনিয়েছে। কিন্তু বিবাহের বন্ধনে সে বদ্ধ হয় নি, অথচ বহু সুযোগও তার ছিল। এর জন্যে দায়ী বারবারা। তার কথা বলি। সে এখন আগের মতোই প্যারীর স্থায়ী বাসিন্দে। ফিওদর ইভানিচ তাঁকে একখানা দানপত্র লিখে দিয়ে নিজের মুক্তি আদায় করে নিয়েছেন। আর অতর্কিত আক্রমণ হবে না। বয়স হয়েছে বারবারার, একটু মুটিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো মন টানে, এখনো বেশ-ভূষায় তার নিখুঁত রুচি। সবাই নিজের নিজের আদর্শ খুঁজে পেয়েছে। বারবারা পেয়েছে দ্যুমার (পুত্র) নাটকে। যখনই যক্ষ্মাগ্রস্তা, ক্যামেলিয়া

ফুল হাতে মহিলাদের জীবনী নিয়ে থিয়েটারে নাটক অভিনীত হয়, সে তো সে অভিনয় আসরে গিয়ে হাজির হবেই। মাদাম হ্যচ্ তাই তার কাছে তো মানুষের জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ। একথাও সে জাহির করেছে, তার মেয়ের জন্যে এর চেয়ে কাম্য জীবন আর তার নেই। আশা করি, কুমারী এড়াকে তার ভাগ্য এই জীবন থেকে নিষ্কৃতি দেবে। সেই গোলাপের মত গাল, হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটি আজ বিবর্ণ-শ্রী, ক্ষীণা কিশোরী। তার স্নায়ুর নাকি অসুখ। বারবারার ভক্তের দল সংখ্যায় কমে গেছে, কিন্তু এখনো বড় কম নেই। কেউ কেউ বোধ হয় শেষদিন অবধি টিকে থাকবে। এদের মধ্যে সব চেয়ে সেরা, কে-এক জাকারদালো স্কুবির-নিকভ—আটত্রিশ বছর তার বয়েস। অসাধারণ তার স্বাস্থ্য। ওকে মাদাম লাভ্রেৎস্কায়ার মজলিশে উক্রাইনের বর্বর বলে ডাকা হয়। বারবারা কখনো তাকে সান্ধ্য মজলিশে ডাকে না। তবু সে যে তার অনুগৃহীত তাতে সন্দেহ নেই।

আট বছর · আট বছর তাহলে কেটে গেল। আবার আকাশে বসন্তের উজ্জ্বল দীপ্তি—আনন্দের রঙ চলকে পড়ছে; আবার তার সোহাগ স্পর্শে পৃথিবীতে ফুল ফুটছে, ভালবাসা আর গানের বান ডেকেছে। এই আট বছরে ও-শহরে তেমন বদলায় নি।

মারিয়ার বাড়িখানা শুধু নতুন দেখাচ্ছে; নতুন রং-করা দেয়াল ঝকঝক করছে। খোলা জানালার শার্সির উপর এসে পড়েছে সূর্যাস্তের লাল আভা; জানালা দিয়ে ভেসে আসছে বহু হালকা স্বর, তরুণের আনন্দের হাসি—অবিরাম হর্ষধ্বনি; সমস্ত বাড়িখানা জীবন্ত, যেন আনন্দে কানায় কানায় ভরা। বাড়ির কর্ত্রী বহুদিন হোল মারা গেছেন। লিজা মঠে যাওয়ার দুবছর পরেই তিনি মারা যান। মারফা দিমোফিয়েভ্নাও তার পরে আর বেশিদিন বাঁচেন নি। শহরের কবরখানায় তাঁরা পাশাপাশি এখন শুয়ে আছেন; নাস্তাশিয়াও আর বেঁচে নেই। বিশ্বাসী এই বৃদ্ধা

প্রতি সপ্তাহে বন্ধুর আত্মার সদ্‌গতির জন্যে প্রার্থনা করতে যেত সেখানে।··· তারও সময় এল, তার হাড় ক'খানা এখন ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির নীচে···কিন্তু বাড়িখানা অন্য লোকের হাতে যায়নি, ঘর এখনো বজায় আছে। এখনো বনেদী নীড় অটুট আছে। লেনোচকা এখন তন্বী সুন্দরী, তার প্রেমিক হুসার পল্টনে একজন অফিসার। মারিয়ার ছেলে সবে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বিয়ে করেছে, সে বসন্তে এসেছে এখানে তরুণী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। তার স্ত্রীর বোনটি ষোলো বছরের স্কুলের মেয়ে, গোলাপের মতো তার গাল, আর স্বচ্ছ তার দুটি চোখ। সুবোচকারও বয়েস হয়েছে—সেও মধুর হয়ে উঠেছে। তাই এ বাড়ি থেকে উঠছে হাসি, কালিতিনের বাডির দেয়াল মুখর হয়ে উঠছে কথায়। বাড়ির ভিতরে সব কিছুই বদলে গেছে। নতুন বন্দোবস্ত। আগের দিনের বৃদ্ধ পরিচারকদের বদলে ছোকরার দল আমদানী হয়েছে। যেখানে রোস্কা গম্ভীর হয়ে মোটাসোটা শরীরটা নিয়ে বসে থাকতো, সেখানে এসেছে দুটো কুকুর। তারা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে, সোফার উপরে গিয়ে উঠছে। আস্তাবলেও এখন তাগড়া ঘোড়ার দল। ডোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে কেশর-ফোলানো ঘোড়া। প্রাতরাশ, সান্ধ্যভোজ সব যেন গুলিয়ে গেছে, নতুন রকমে চলছে সব কিছু—প্রতিবেশীরা তো তাই বলে।

সেদিন সন্ধ্যায় কালিতিনদের বাড়ির বাসিন্দেরা (তাদের মধ্যে, লেনোচ্‌কার প্রেমিকই সবচেয়ে বড়, বয়স তার চব্বিশ বছর) আনন্দে মেতে উঠেছিল। ওদের হাসি শুনে মনে হচ্ছিল, ওরা এক মজার খেলাই খেলছে। ওরা পরস্পরকে ধরবার জন্যে তখন ছুটোছুটি করছে; কুকুর দুটোও পিছনে পিছনে উত্তেজিত হয়ে ছুটছে আর ডাকছে। জানালার উপরে টাঙানো খাঁচায় ক্যানারী পাখীর চীৎকারে হাওয়া যেন যাচ্ছে ছিড়েখুঁড়ে। গোলমাল তারা বাড়িয়ে তুলছে তাদের উন্মত্ত কুজনে। যখন এই কানে তালা লাগালো চীৎকার উঠলো চরমে তখন একখানা টমটম এসে দাঁড়ালো ফটকে।

কাদায় মাখামাখি গাড়ি—তার ভিতর থেকে নামলেন বছর পঁয়তাল্লিশের এক প্রৌঢ়। তাঁর গায়ে ভ্রমণকারীর জোব্বা জড়ানো। নেমে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অচল হয়ে গেছে তার পা দুখানি, বাড়িখানার দিকে তাকাচ্ছেন কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে। এবার ফটক থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। সামনে বারান্দার সিঁড়ি। আস্তে আস্তে বেয়ে উঠতে লাগলেন। হলঘরে কেউ নেই। হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল, সুরোচকা ছুটে বেরিয়ে এল। মুখখানা তার উত্তেজনায় রক্তিম। তার পিছনে পিছনে ছুটে এল চীৎকার করতে করতে ছেলেমেয়ের দল। তারা অপরিচিত মানুষ দেখে থেমে পড়লো; কিন্তু উজ্জ্বল চোখে তাদের সহৃদয় দৃষ্টি, তরুণ মুখে এখনো ফুটে আছে হাসি। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার ছেলে অপরিচিতের কাছে এগিয়ে এসে বন্ধুভাবে জিজ্ঞেস করলে, তিনি কি চান।

অপরিচিত মানুষটি ধীরে ধীরে বললেন, আমি লাভ্রেৎস্কী।

তার উত্তরে চীৎকার উঠলো—দূর-সম্পর্কের, ভুলে যাওয়া একজন আত্মীয় এসেছেন বলে তাদের এত আনন্দ নয়, যত আনন্দ তাদের উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে বলে। লাভ্রেৎস্কীকে সবাই তখনি ঘিরে বসলো। লেনোচ্‌কা পূর্ব-পরিচিতা। সেই প্রথম এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। সে বললে, তিনি পরিচয় না দিলেও সে তাঁকে ঠিক চিনে ফেলত। সে-ই আর সবার সঙ্গে ডেকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলে। সবাইকে সে আদরের নাম ধরে ডাকলে—নিজের প্রেমিকটিও বাদ পড়লো না।

এবার খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে ওরা এল বসবার ঘরে। দুঘরেই দেয়াল-কাগজ নতুন। কিন্তু আসবাবপত্র তেমনি আছে। লাভ্রেৎস্কী পিয়ানোটা দেখেই চিনলেন। জানালার কাছে বোনবার গোল ফ্রেমখানা রয়েছে। হয়তো আট বছর আগের সেই অসমাপ্ত বোনাটাও সেখানে রয়ে

গেছে। ওরা ওঁকে নিয়ে গিয়ে আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলে। আয়েসে গা ঢেলে দেবার উপযোগী কেদারাখানা। সবাই ঘিরে বসেছে। প্রশ্ন, চীৎকার, বিবৃতি—একটার পর একটা আসছে, যাচ্ছে। লেনোচকা বোকার মতো বললে, বহুদিন আপনাকে দেখিনি—বারবারা পাভ্‌লোভ্‌নাকেও না।

সে তো স্বাভাবিক, ওর ভাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমরা তো সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গেই ছিলাম। আর ফিওদর ইভানিচ ছিলেন তাঁর গ্রামে!

হাঁ, মা মারা যাওয়ার পর তো ওখানেই আছি।

মারফা দিমোফিয়েভ্‌নাও তো মারা গেছেন, সুরোচকা বললে।

লেনোচ্‌কা বললে, নাস্তাশিয়া, মসিয়েঁ লেম—ওঁরাও মারা গেছেন?

লেমও মারা গেছেন? লাভ্রেৎস্কী জিজ্ঞেস করলেন।

যুবক কালিতিন উত্তর দিলে, হাঁ, উনি ওদেশায় চলে যান, কেউ কেউ বলে ওঁকে নাকি কে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। সেখানেই উনি মারা যান।

উনি কি ওঁর নিজের তৈরী করা কোনো সুর রেখে গেছেন?

জানি না। তবে আমার তো না-ই মনে হয়।

সবাই চুপচাপ, এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। শোকের মেঘ ছায়া ফেলেছে মুখে, ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

জানেন, ম্যাট্রস এখনো বেঁচে আছে, লেনোচ্‌কা হঠাৎ বলে উঠলো।

আর গিদিয়োনোভ্‌স্কীও, তার ভাই বললে।

গিদিয়োনোভ্‌স্কীর নাম উঠতেই হাসির বান ডেকে গেল।

হাঁ, এখনো বেঁচে আছেন, এখনো তেমনি মিথ্যেবাদী, মারিয়ার ছেলে বললে। ভাবতে পারেন (সে একটি মেয়েকে দেখিয়ে দিলে। তারই শ্যালিকা), ওই পাগলী কাল ওঁর নস্যিদানীতে লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিল! আহা, হাঁচি যদি শুনতেন! লেনোচ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো। ওর স্বর ডুবে গেল অদম্য হাসির লহরে।

যুবক কালিতিন বললে, লিজার খবর এই সেদিন পেলাম।

সবাই চুপচাপ। নীরবতা ঘনিয়ে এল চারদিকে।

সে ভাল আছে, শরীরটা একটু ফিরেছে।

এখনো সেই মঠেই আছে?

হাঁ...

চিঠিপত্র লেখে?

না, একেবারেই না। অন্য লোকের মুখে খবর পাই।

আবার গভীর নীরবতা, সবাই ভাবছে, লিজা তো নয়, দেবতার দূতী সে।

কালিতিন জিজ্ঞেস করলে, বাগানে যাবেন নাকি? এখনও তেমনি সুন্দর তবে কিছু আগাছা জন্মেছে।

লাভ্রেৎস্কী বাগানে এলেন। প্রথমেই সেই বেঞ্চিখানা চোখে পড়লো—সেই বেঞ্চি—একদিন ওখানে বসেই ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন লিজার সঙ্গে। সে স্মৃতি তো অবিস্মরণীয়। আজ বেঞ্চিখানার রঙ কালো হয়ে গেছে, নড়বড়ে হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তো চিনেছেন। হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো—এ যে এক সুন্দর আর তিক্ত অনুভূতি। যে যৌবন চলে গেছে তারই জন্যে যেন বেদনা উথলে উঠছে, অতীতের আনন্দের স্মৃতি এসে হানা দিচ্ছে। তার জন্যেও তো আছে দুঃখ আর তিক্ততা। ওদের সঙ্গে বাগানের পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। লাইম গাছগুলির যেন বয়স বাড়েনি, দৈর্ঘ্যেও তারা তেমনি আছে, কিন্তু আরো যেন ছায়া-ঘন তারা। ঝোপঝাড় গজিয়েছে, বুনো জামের ঝোপ ফনফনিয়ে উঠছে, হ্যাজেলের ঝোপও বাড়ন্ত। সবকিছু মিশিয়ে বনের স্নিগ্ধ গন্ধ আসছে, ঘাস আর লিলাক ফুলের গন্ধ উঠছে।

লাইমের গাছে ঘেরা ঘাসে ভরা জমিতে ওরা এসে দাঁড়ালো। লেনোচ্‌কা হঠাৎ বলে উঠলো, এখানেই খেলা হবে। আর আছিও তো আমরা পাঁচজন।

ওর ভাই বললে, ফিওদর ইভানিচ যে আছেন? না, তুমি নিজেকেই ধর নি?

লেনোচ্কা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে!

সে বললে, ফিওদর ইভানিচ কি এই বয়সে খেলবেন?

লাভ্রেৎস্কী বাধা দিলেন, না, না, তোমরা খেল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোমাদের যে বাধা দিচ্ছি না, এতেই আমি খুশি। আমাকে নিয়ে তোমাদের বসে থাকতে বলি না। আমাদের মতো বুড়োদের নিজেদের অনেক খেয়াল আছে—সে সব তোমরা এখনো জান না—তার চেয়ে আনন্দ আর নেই—স্মৃতির চেয়ে আর কি আনন্দ আছে বল!

তরুণ তরুণীরা শুনছে লাভ্রেৎস্কীর কথা। ভদ্রতার খাতিরেই শুনছে, একটু বা আছে কৌতূহল। শিক্ষক যেন তাদের পাঠ দিচ্ছেন—। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, এবার তারা হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো, ছুটে চললো সবুজ মাঠের দিকে। চারজন দাঁড়াল গাছের তলায়, একজন মাঝখানে। খেলা শুরু হয়ে গেল।

লাভ্রেৎস্কী বাড়ি ফিরে খাবার ঘরে এসে ঢুকলেন। পিয়ানোর কাছে এসে একটা ঘাট ছুঁয়ে দিলেন। সুর ঝরে পড়লো। ক্ষীণ, স্পষ্ট সুর হাওয়ায় স্পন্দন এনে দিল, বুকের তন্ত্রীতেও যেন তারই উত্তর বেজে উঠছে। এ সেই অনুপ্রেরণাময় সুর, তারই মুখপাত—যে সুর বাজিয়ে হতভাগ্য লেম তাকে এক আনন্দ-উজ্জ্বল রাতে বহুদিন আগে খুশি করেছিলেন। হাঁ, স্মরণীয় সেই রাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।

লাভ্রেৎস্কী এবার বসবার ঘরে এলেন। বহুক্ষণ কেটে গেল সেখানে। লিজার সঙ্গে এখানেই দেখা হোত। কতবার সে দেখা—বার বার। তার মূর্তি যেন ভেসে উঠলো শরীরী হয়ে। চারদিকে তারই উপস্থিতি অনুভব করছেন। কিন্তু তার জন্যে যে দুঃখ সে তো ব্যথা দেয়—সইতে তো পারেন

না। মৃত্যু যে নীল শান্তি নিয়ে আসে, তা তো এতে নেই। লিজা বেঁচে আছে বহুদূরে—তার নাগালের বাইরে। তিনি তার কথা ভাবেন, কিন্তু সেদিনের সেই প্রিয়তমার অবয়ব মনে আনতে পারেন না। আবছা হয়ে গেছে সে স্মৃতি। এক মঠবাসিনীর বেশের অন্তরালে মুছে গেছে। সে তো বুঝি এখন ঘুরে বেড়ায় সেই দূরান্ত কোন্ মঠে—ধূপধূনার শিখা যেখানে এঁকে বেঁকে ওঠে, তারই মাঝে। মঠবাসিনী লিজা! চেনা বুঝি তাকে যায় না—যাবে না। লাভ্রেৎস্কী নিজেকেই কি নিজে চিনতে পারেন? তিনি লিজাকে মনে মনে যে মনটি কল্পনা করেন, নিজেকে কি সেই মন নিয়ে দেখেছেন? এই আট বছরে তিনি জীবনের বাঁক ঘুরেছেন। বহু লোক সে বাঁক ঘুরে চলে না, চলতে চায় না, —এড়িয়ে যায়। কিন্তু মানী যিনি তিনি তো এড়িয়ে চলতে পারেন না নিজের সুখ, নিজের স্বার্থের কথা তিনি তো ভাবেন না। লাভ্রেৎস্কীরও ঠিক তাই হয়েছে। তবে তার সে উদ্দামতা আর নেই—সত্যি কথা বলতে গেলে—শুধু দেহে আর মুখের বলি রেখায়ই বার্দ্ধক্য আসেনি, তিনি মনেও বুড়ো হয়ে পড়েছেন। বুড়ো বয়সে তরুণের তাজা মন জীইয়ে রাখা তো শক্ত, অসম্ভব। লোকে যে বলে, মিথ্যে কথাই বলে। কাজের শক্তি আর মানুষের মঙ্গলের উপর বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলেই তো যথেষ্ট। লাভ্রেৎস্কীও সে অধিকারটুকু পেয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়ে থাকবার অধিকার। তিনি এখন চাষী, জমি চষতে তিনি শিখেছেন, কিন্তু নিজের স্বার্থে তার শ্রম নিয়োজিত নয়; তিনি তার অধীন চাষীদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য করছেন।

লাভ্রেৎস্কী আবার বাগানে চলে এলেন। পরিচিত বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। এই সেই প্রিয় স্থান যেখানে তিনি শেষ বারের মতো আনন্দের সোনালি সুরাভরা ফেনিল পাত্র হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। পানপাত্র চূরমার হয়ে গেল।…নিঃসঙ্গ গৃহহীন যাযাবর

জীবনের দিকে ফিরে তাকালেন। জীবনকে ফিরে ফিরে দেখছেন, খতিয়ে দেখছেন ; আর ওদিকে তরুণের উল্লসিত চীৎকার ভেসে ভেসে আসছে বাগানের আর এক কোণ থেকে। ওরা এখন তার জায়গা দখল করে বসেছে। মন বিষণ্ণ, কিন্তু তিক্ততা নেই, দুঃখও নেই। অনেক দুঃখই তো আছে মনে ভিড় করে, তারা এখন অনুভূতির নাগালের বাইরে। লজ্জাও নেই। নেই ভয়। ওদের স্বর কাণে আসছে। তিনি ভাবলেন, ঈর্ষিত না হয়েই ভাবলেন, খেলো, আনন্দ কর প্রজ্জ্বলন্ত যৌবন, তোমাদের জীবন তো সুমুখে—তোমাদের জন্যে জীবন হবে সহজ ; আমাদের মতো তোমাদের নিজেদের পথ খুঁজে নিতে হবে না, সংগ্রাম করতে হবে না, অন্ধকারের অতলে উঠতে পড়তে হবে না। আমরা তো বাঁচবার জন্যে লড়াই করে গেলাম—কিন্তু তবু ক'জন বাঁচলাম! তোমাদের কর্তব্য আছে, আর আছে আমাদের মতো বৃদ্ধের আশীর্বাদ। আজকের দিনের পরে, আজকের এই অভিজ্ঞতার পরে, আমার জন্যে কি আর বাকি রইল? আমি শেষ বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে—দিন আগত—আর আছেন এক ঈশ্বর তিনিও অপেক্ষা করছেন। শেষ মুহূর্তে, বিষণ্ণ বিষাদমাখা স্বরে, ঈর্ষা না করে, মনে কুটিল কালো অনুভূতির লেশমাত্র না রেখে বলি, এস, নিঃসঙ্গ জীবন এস! নিষ্ফল জীবন পুড়ে যাক—ছাই হয়ে যাক! এই কথাই তো শুধু বলবার আছে।

তিনি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। নিশব্দ তার গতি। কেউ ফিরে তাকালো না, কেউ আটকে রাখলো না ; আনন্দের ধ্বনি লাইম গাছের সবুজ দেয়ালের আড়ালে এখন আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। তিনি গাড়িতে চড়ে বসে গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন বাড়ি ফিরে যেতে। জোরে চালাতে নিষেধ করলেন।

এবার উপসংহার কি হবে? হয়তো হতাশ পাঠক জিজ্ঞেস করবেন, তারপরে কি হোল লাভ্রেৎস্কীর? কি হোল লিজার? কিন্তু যাঁরা বেঁচে

থেকেও পৃথিবী আর তার সংগ্রাম থেকে দূরে সরে গেল, তাদের সম্পর্কে কিই বা বলবার আছে, কেন আর তাদের কথায় ফিরে আসব? শোনা যায়, লাভ্রেৎস্কী নাকি দুরান্ত সেই মঠে লিজার সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন, দেখাও তাদের হয়েছিল। লিজা তার পাশ দিয়ে মঠবাসিনীর ধীর অথচ দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল, তার দিকে ফিরেও তাকালো না। শুধু তার চোখের পল্লব একটু বুঝি কেঁপে উঠলো, বিশীর্ণ মুখখানা আরো নত হয়ে এল, আর আঙুলে জড়ানো জপের মালা আরো শক্ত করে সে চেপে ধরলো। ওরা তখন কি ভাবছিল, কি ছিল ওদের অনুভূতি? কে জানে? কে বলবে? জীবনে তো এমনি মুহূর্ত আসে, আসে এমনি অনুভূতি···মানুষ তাকে চিহ্নিত করতে পারে—দেখিয়ে দিতে পারে—তারপর যে যার মতো চলে যায়।

শেষ